স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান দৃষ্টি

ডক্টর অমিয় কুমার মজুমদার

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা

জ্ঞানমার্গে পরিক্রমণশীল পথিকদের উদ্দেশ্যে

শ্রদ্ধাবনতচিত্তে

All philosophies, all sciences, all religions, are nothing but so many attempts of the human mind to realize the Truth, to know the Eternal Truth.

—*Swami Abhedananda*

সকল প্রকার দর্শন, সমস্ত বিজ্ঞান এবং সবরকমের ধর্ম আর কিছুই নয়, এসব হচ্ছে সত্যকে উপলব্ধি করা বা চিরন্তন সত্যকে জানার জন্য মানবমনের নানা পন্থা মাত্র।

—**স্বামী অভেদানন্দ**

বক্তব্য

"স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টি" গ্রন্থ রচনা করেছেন ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার তাঁর স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টি এবং বিজ্ঞান ও দর্শন-দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে। স্বামী অভেদানন্দ শুধুই ছিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও পরম-ভক্ত এবং শুধুই ছিলেন না অদ্বৈতবেদান্তী সন্ন্যাসী, তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ্, মনোবিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মজ্ঞানের পরমপথচারী। অনেকের কাছে স্বামী অভেদানন্দ পরিচিত ভৌতিক বিজ্ঞানতত্ত্বের পরিবেশক ও গ্রন্থ-রচয়িতা হিসাবে। তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন "Life Beyond Death"—যার বঙ্গানুবাদ 'মরণের পারে'। এটা অনেকটা হাতীর পরিচয় দিতে গিয়ে তার কেবলমাত্র শুঁড়েরই পরিচয় দেওয়ার মতো, কিন্তু হাতীর ব্যক্তিসত্তা শুধুই তার শুঁড়ে নিবদ্ধ নয়, তার হাত, পা, কাণ, শরীর, রক্ত, মাংস, হাড় এবং সর্বোপরি তার ধ্যান ও জ্ঞানদীপ্ত প্রাণসত্তার উপর। স্বামী অভেদানন্দের দেড়শো-দুশো গ্রন্থের মধ্যে যাঁরা মাত্র "Life Beyond Death" বা "মরণের পারে" গ্রন্থের সঙ্গেই পরিচয় রাখেন তাঁরা অভেদানন্দের জ্ঞানসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার যে শতাংশের একাংশের খবরও রাখেন না, বরং তাঁর সম্বন্ধে বিরাট অজ্ঞতারই পরিচয় দেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

স্বামী অভেদানন্দের শতবর্ষপূর্তি জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রদত্ত প্রায় সাড়ে তিনশত বিভিন্ন বিষয়ের উপর দেওয়া বক্তৃতার সংকলন করে দশটি খণ্ডে ইংরাজীতে প্রকাশিত হচ্ছে "কম্প্লিট ওয়ার্কস অব্ স্বামী অভেদানন্দ"।

স্বামী অভেদানন্দ বলতেন, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ; সুতরাং দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, ধর্ম সকল-কিছু বিষয়ের আলোচনাকেই বিজ্ঞান-সিদ্ধান্তের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত করে অনুশীলন ও পরিবেশন করতে হবে। এই যুগে 'শাখাবচ্ছেদে চন্দ্র' দর্শন-দৃষ্টান্তের অবসান হয়েছে, সুতরাং চন্দ্রকে দেখতে হলে এখন বৃক্ষশাখার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বেরই আশ্রয় নিতে হবে। তাছাড়া বর্তমান বিদগ্ধ বিজ্ঞানী ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ক্,

এডিঙ্‌টন, হোয়াইটহেড, জিন্স, ক্রোথার প্রভৃতি ও দার্শনিক সি. ই. এম জোড, এরোল ই. হ্যারিস, প্রভৃতি দার্শনিকদের মতো স্বামী অভেদানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, Science বা বিজ্ঞান ও Philosophy বা দর্শনের দৃষ্টিকোণ ও যাত্রাপথ আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বা আলাদা হলেও চরমতত্ত্ব ও পরমলক্ষ্যের বেলায় উভয়ের সিদ্ধান্ত এক ও অভিন্ন। যদিও Science বা বিজ্ঞান জাগতিক স্থূলবস্তুর পৌনপনিক পর্যবেক্ষণ বা বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে ছুটে চলেছে তার গন্তব্য পথে, তবুও অতীন্দ্রিয় বস্তুর রহস্যভেদ করেছে বিজ্ঞান সার্থকতার সংগে। দর্শনপথের মতো বিজ্ঞানের পথেও বুদ্ধি ও বোধির অনুশীলন বড় কম প্রয়োজন নয়। তাছাড়া Science বা বিজ্ঞান এই শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন স্বামী অভেদানন্দ একটু higher বা spiritual sense-এ এবং সেক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহৃত Science বা বিজ্ঞান শব্দ সংকীর্ণ পার্থিব পরিধির ক্ষেত্রকে অতিক্রম করেছে উন্নত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির প্রসারতা ও প্রসন্নতাকে নিয়ে। সাধারণ দার্শনিক—যাঁরা দার্শনশাস্ত্রের অনুশীলন বা চর্চা করেন মাত্র বুদ্ধির বিকাশকে নিয়ে এবং বোধির বিকাশ যাঁদের সত্যকারভাবে উদ্দীপিত নয় প্রত্যক্ষ আত্মানুভূতির প্রসন্ন আলোকে, তাঁদের কাছেই বিজ্ঞান বা জড়বিজ্ঞানের বিরোধ পরিলক্ষিত হয় দর্শনশাস্ত্রের সংগে। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল্‌ কান্টের দর্শন-জীবনের সংগে যাঁরা পরিচিত, তাঁরাও জানেন, বিজ্ঞান-সিদ্ধান্তের সংগে সামঞ্জস্য রেখে দর্শন-সিদ্ধান্তের বহু অংশেরই তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর Critique of Pure Reason (ক্রিটিক অব্‌ পিওর রিজন) গ্রন্থে। তাছাড়া বিদগ্ধ বিজ্ঞানী ম্যাক্‌স প্ল্যাংক তো স্পষ্ট ভাষায়ই তাঁর "Where Science is Going" গ্রন্থে বলেছেন, একদিন নিশ্চয়ই আসবে যখন বিজ্ঞানের চরম-সিদ্ধান্তের সংগে দর্শনশাস্ত্রের পরমলক্ষ্যের মিলন হবে। অধ্যাপক হোয়াইট হেড তাঁর "Process and Reality", "Science and the Modern World" প্রভৃতি গ্রন্থেও ম্যাক্‌স প্ল্যাংকের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। বৈজ্ঞানিক জে. ডব্লিউ. এন. সালিবান ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে "অব্‌জারভার' পত্রিকায় প্রকাশিত "Interview with Max Planck" নিবন্ধে "Consciousness" বা 'সম্বিৎ'-সম্পর্কে প্ল্যাংকের মন্তব্যের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্যার জেমস্‌ জিন্সের "Physics and Philosophy" গ্রন্থটিও এ' সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। "Philosophical Aspects of Modern Scicnce"

গ্রন্থে অধ্যাপক সি. ই. এম. জোড এবং "Nature, Mind and Modern Science" প্রভৃতি গ্রন্থে অধ্যাপক এরোল. ই. হ্যারিস Science বা বিজ্ঞান ও Philosophy বা দর্শনের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসার যথেষ্ট তথ্যই প্রকাশ করেছেন। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে তাই একটু উদার ও সর্ববিস্তারী দৃষ্টির প্রয়োজন আছে; কেননা বিজ্ঞান ও দর্শন এ'দুটিরই অনুশীলন ও পদক্ষেপক্ষেত্র ভিন্ন হলেও বর্তমান বিজ্ঞানতত্ত্বে বিশ্বাসী দার্শনিকেরা সংকীর্ণ দৃষ্টিকে একটু যাচাই করার উপযোগিতা স্বীকার করেন। তাই এখন কি দার্শনিক ও কি বৈজ্ঞানিক উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন হয়েছে পুঁথিগত সীমায়িত বিশ্বাস ও দৃষ্টিকে একটু প্রসারিত করা এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের চরমলক্ষ্যের পথে পরমমিলনের পথকে যুক্তি ও প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে প্রতিষ্ঠিত করা। জীবনে তাই কেবলি বুদ্ধির ঐশ্বর্যের চেয়ে পরমবোধি বা জীবনাভূতির মাধুর্যকেই গ্রহণ করতে হবে। স্বামী অভেদানন্দের জীবন ছিল শাস্ত্র ও সাধনার পরমমিলন-ক্ষেত্র এবং তিনি চরমসত্যের উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষায় ও আশীর্বাদে।

ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার সুনিপুণ হস্তে প্রজ্ঞাবান স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টির আলোচনা করেছেন তথ্য ও তত্ত্বের পারস্পরিক মিলন ঘটিয়ে। তাঁর লেখার মধ্যে ভাব ও ভাষার একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বতন্ত্র প্রাণছন্দায়িত রূপের পরিচয় মেলে এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিরও আভাস পাওয়া যায় তাঁর আলোচনার মধ্যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে। আশা করি, বিরাট ব্যক্তিত্ববান ও চক্ষুষ্মান স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টির সুষ্ঠু পরিচয় আমরা পাব শ্রীযুক্ত অমিয়বাবুর সুনিপুন লেখার মধ্য দিয়ে, এবং বিশ্বাস করি যে, সার্থক হয়েছে তাঁর লেখনী ও কামনা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকা

যাঁদের জ্ঞানের প্রতিভা, কর্মের মহিমা ও চরিত্রের মহত্ত্ব আধুনিক বাংলার শিক্ষাদীক্ষাও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও দেশবিদেশে সমাদৃত করেছে, বিজ্ঞানের সত্যান্বেষণের পন্থা, তত্ত্ব এবং তথ্য তাঁদের জীবন ও চিন্তাধারাকে কি ভাবে রূপায়িত করেছে তার সম্যক আলোচনা ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন বিজ্ঞানী ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার। 'স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টি' হোল গ্রন্থকারের এ' শ্রেণীর তৃতীয় রচনা। তাঁর প্রথম রচনা 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস' সুধীসমাজে সমুচিত সমাদর লাভ করেছে। দ্বিতীয় রচনা 'বিবেকানন্দের বিজ্ঞানচেতনা' বইখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

অভেদানন্দ ছিলেন পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রিয়শিষ্য। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন পরমভক্ত। কিন্তু অভেদানন্দ হোলেন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেদান্তের মীমাংসার সাদৃশ্য স্বামী অভেদানন্দ ব্যক্ত করেছেন তাঁর বহু বাণী এবং রচনায়। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান যে সত্যের অনুসন্ধানে রত, ধর্ম তাকেই উপলব্ধি করবার জন্য প্রয়াসী। বিজ্ঞানের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও বিচারবুদ্ধিমূলক সিদ্ধান্তের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর। সমাজ ও মানব-কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানচর্চা অপরিহার্য—এ' বাণী তিনি প্রচার ক'রে গেছেন। মানুষের বহু দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় মিলবে বিজ্ঞানের সাধনায় একথা তিনি অস্বীকার করেন নি। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় হতেই মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে স্থায়ী কল্যাণ এবং শান্তি—এটাই ছিল তাঁর বাণী। ধর্মহীন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানহীন ধর্মে মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। অভেদানন্দের বহু বাণী ও উক্তি উদ্ধৃত করে ডক্টর মজুমদার নিপুণ ও সুসংবদ্ধভাবে তাঁর মনোজ্ঞ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বামীজির ধারণা ও মতামত। অভেদানন্দের জীবনদর্শনে বিজ্ঞানের ছায়াপাতকে গ্রন্থকার সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন তাঁর বইখানিতে।

আশা করি, এই বইখানিও তাঁর প্রথম রচনার মত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমাদর লাভ করবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৫০।১ হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

প্রিয়দারঞ্জন রায়

নিবেদন

'স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টি' গ্রন্থরচনার একটি ছোট ইতিহাস আছে। আমার লেখা 'বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা' গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে। তখন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের মহড়া চলছে। ভূমিকা লেখার পর প্রজ্ঞানানন্দজী আমাকে স্বামী অভেদানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অনুরূপ একখানি গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করেন। স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই আমি তখন কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সম্ভব কি না। পরে দেখেছি এই দ্বিধা আমার মতো অনেকেরই আছে যেহেতু আমাদের নিষ্ঠা নেই মানুষের স্বরূপ জানবার।

বর্তমান কালে স্বামী অভেদানন্দের নাম বহুল প্রচারিত নয়। যাঁরা জানেন তাঁদেরও অনেকে তাঁকে মনে রেখেছেন 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে যার বৈজ্ঞানিক মূল্য কতটা আছে তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক চলছে। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে দার্শনিক মতামত আউড়ে যাঁরা তাঁদের জীবন কাটিয়ে গেছেন বিজ্ঞানের অনুসারী এই সমাজ তাঁদের দীর্ঘদিন মনে রাখে না। স্বামী অভেদানন্দ এর ব্যতিক্রম শুধু নন, তিনি আজীবন একটি 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' কে লালন পালন ক'রে গেছেন। তিনি বীরসিংহ স্বামী বিবেকানন্দের সার্থক গুরুভ্রাতা এবং উত্তর সূরী। জড়-বিজ্ঞানের লীলাস্থল আমেরিকাতে স্বামী বিবেকানন্দ যে পন্থায় বেদান্তের বাণীকে প্রচার করেছেন, যেভাবে মহান হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক পন্থায় ব্যাখ্যা ক'রে সর্বজন গ্রাহ্য ক'রে তুলেছিলেন, স্বামী অভেদানন্দ তাঁর সেই আরব্ধ কার্যকে তুলে নেন নিজের স্কন্ধে। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর বিদেশে থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সংগে বেদান্তের কোন বিরোধ নেই, বরং বেদান্তের ধর্ম লোকহিতকর, শুভকর এই সত্যকে প্রচার করেছেন। তিনি নিজের জীবনে এই 'সত্য'কে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার নেশা

তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। যাচাই ক'রে দেখেছেন সবকিছুকেই, আধুনিক বিজ্ঞানের নিকষে তাকে পরখ করেছেন, অগ্রাহ্য হলে তাকে সমূলে পরিত্যাগ করেছেন। এই আসক্তিহীনতাই বিজ্ঞানীর অন্যতম প্রধান ধর্ম।

প্রশ্ন উঠবে কেন স্বামী অভেদানন্দ বহুল প্রচারিত নন, যিনি সুদীর্ঘকাল আমেরিকার গুণী সমাজে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে আদৃত হয়েছিলেন, মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে তিনি কেন অল্পসংখ্যক মানুষের মনের মধ্যে সীমাবদ্ধ! এই প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছিল এবং এই কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রবেশ করেছি। বলা বাহুল্য বিস্মিত হয়েছি এই সন্ন্যাসীর প্রতিভা লক্ষ্য ক'রে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কেবলমাত্র বই পড়ে নয়, গবেষণাগারে গিয়ে ছাত্রের মত শিক্ষা করেছেন বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ। আমেরিকাতে বক্তৃতা দিয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে সুদক্ষ জ্যোতির্বিদের মতো। সেই সব বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি সন্ধান করে পেয়েছি। আর তা প'ড়ে আশ্চর্য হয়েছি। এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে আমি রচনা করেছি গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে একাত্মতা, অর্থাৎ নিজের বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের মতের মিল, আবার কোথাও রয়েছে নতুন ইঙ্গিত। নতুন চিন্তাধারার ঝলকানি। তবে তা পূর্ণতর হতে পারে নি, এবং তা হওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু তাঁর জীবনের পথ ভিন্ন। লক্ষ্য পৃথক। তথাপি তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা, তৎকালীন প্রচলিত কোন কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রতিবাদ ক'রে (যেমন, ক্রমবিবর্তনবাদ) সুচিন্তিত মত প্রকাশ তাঁকে সাধারণ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী থেকে পৃথক সারিতে সরিয়ে রেখেছে। হয়ত এই স্বাতন্ত্র্য তাঁকে নির্জনে রেখেছে এবং যে কোন কারণেই হোক এপর্যন্ত এই প্রতিভাদীপ্ত সন্ন্যাসীর যথার্থ মূল্যায়ন হয় নি।

স্বামী অভেদানন্দ যে বৈজ্ঞানিক মেজাজের ছিলেন তার পরিচয় মেলে তাঁর সামান্য কয়েকটি কথাতেই। তিনি বলেছেন, 'বিংশ শতকে ধর্ম এমন হওয়া উচিত যা কোন মন্দির, বা গীর্জা অথবা মসজিদ থেকে চালিত হবে না। পুরোহিতদের, যাজকদের, মৌলভীদের সঙ্গেই যে দেবতার একমাত্র আলাপ বা তারা দৈব সত্তার অধিকারী এ কথা মুছে ফেলতে হবে।···বিজ্ঞান বিশ্বের চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করতে প্রচেষ্টিত। ধর্ম সেই চিরন্তন সত্যকে

উপাসনার কাজে প্রবৃত্ত। কিন্তু সত্য আবিষ্কৃত না হ'লে তাকে পূজা করা সম্ভব নয়। যদি আমরা চিরন্তন সত্যকে না জানি, আমরা কি ক'রে তার উপাসনা করতে পারি? আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বোত্তম সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে যাদের মিল নেই, সেই সমস্তই আমাদের দূরে ঠেলে দিতে হবে।' এই মেজাজটি তাঁর আমৃত্যু ছিল। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি আমাকে আকৃষ্ট করেছে সব চেয়ে বেশি এবং গ্রন্থটি তারই ফলশ্রুতি।

স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন বৈদান্তিক। বেদান্তকে তিনি জীবনের অবশ্য গ্রহণীয় মনে করতেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় ও রচনাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন বেদান্তের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের মিল সুস্পষ্ট এবং জীবনের বহু প্রশ্নে বেদান্ত বিজ্ঞান থেকে অনেক অগ্রসর। স্বামী অভেদানন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা তাঁকে বৈদান্তিক এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ-পার্ষদ-রূপে চিহ্নিত করেছেন। একারণেই তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক মন্তব্য সর্বসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করবার কোন প্রয়াস হয়নি। স্বামী অভেদানন্দের এই দিকের সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

বিজ্ঞানী কোন সিদ্ধান্তকেই অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন না। যদিচ নিউটনের পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা অনেকটা গোঁড়া হয়ে পড়েছিলেন। তথাপি অনুকরণের প্রয়াস ছিল না। তা না হলে নিউটনের জগতে প্রবল ধাক্কা আসত না। এমনিভাবে বিজ্ঞানের জগতে বারে বারে এসেছে নতুন চিন্তাধারা। পরিবর্তিত হয়েছে মৌলধারণার ভিত্তিভূমি। বিজ্ঞানী যদি বিশেষ কোন মতবাদে আবদ্ধ হয়ে পড়েন তাহলে নতুন চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তিনি হবেন নিরাসক্ত। স্বামী অভেদানন্দের মনও ছিল এমনি নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর মন। ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব, ক্রমবিবর্তন তত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নিজস্ব বক্তব্য রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনটি পৃথক অধ্যায়ে এসব নিয়ে আলোচনা করেছি। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান-চিন্তায় আধ্যাত্মিক সত্য বা নিয়মের কোন স্থান স্বীকৃত হয় নি, তাহলেও বিংশ শতকের অনেক বিজ্ঞানী যেমন টেলহার্ড দ্য সার্ডিন, সার জুলিয়ান হাক্সলি, এডিংটন প্রমুখেরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জড়বাদকে শিথিল করতে প্রয়াস পেয়েছেন এবং বিজ্ঞান চিন্তার জগতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে। 'ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান ও স্বামী অভেদানন্দ' এই অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা কেমন ছিল এবং কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। 'অতীত স্মৃতিচারণে অভেদানন্দ' অধ্যায়ে তার আলোচনা আছে। তিনি বহু বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে এসেছেন। তার বিবরণ পেশ করা হয়েছে 'বিজ্ঞানী-সঙ্গমে স্বামী অভেদানন্দ' শীর্ষক অধ্যায়ে। স্বামী অভেদানন্দের অসংখ্য চিঠিপত্র অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। সেগুলি প্রকাশিত হলে আরো নতুন তথ্য ও তত্ত্ব জানা যাবে।

আমি বিজ্ঞানের একজন দীন সেবক ও ছাত্র। একারণেই স্বামী অভেদানন্দের এই বিশেষ দিক নিয়ে পর্যালোচনার দুঃসাহসে ব্রতী হয়েছি। ভুল-ত্রুটি হয়তো আছে—তা যেন পাঠকসাধারণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

গ্রন্থ-রচনায় শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ নানাভাবে সাহায্য করেছেন। দর্শনের নানা তত্ত্ব তিনি সরল করে বুঝিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

মহাবিজ্ঞানী ও দার্শনিক আচার্য প্রিয়দারঞ্জন রায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের রসায়ন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ) অনুগ্রহ ক'রে এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন। তিনি আমার গুরুস্থানীয়। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক',—এর লাইব্রেরীর কর্মীরা সকলেই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রথমেই শ্রীননী দাসের কথা মনে পড়ছে। এ ছাড়া শ্রীকার্তিক চক্রবর্তী, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর মজুমদার ও আরো অনেকের সাহায্যও উল্লেখযোগ্য।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই গ্রন্থখানিকে পরিচ্ছন্ন ক'রে তোলার জন্য যে প্রযত্ন নিয়েছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

অমিয়কুমার মজুমদার

সূচীপত্র

এই লেখকের অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

১।	রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস	রূপা ; ছ'টাকা
২।	বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা	রূপা ; ছ'টাকা
৩।	শ্রুতিপারের শব্দ	লিপিকা ; দু'টাকা
৪।	রোগ ও তাহার প্রতিকার	বঙ্গীয় বিজ্ঞানপরিষদ ; এক টাকা

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদকুলে স্বামী অভেদানন্দ এক অত্যুজ্জ্বল নাম। স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান। এমনই এক নাম, যে নাম স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে। প্রতিভা, যোগসমীক্ষা, বৈজ্ঞানিক মেজাজ ও অগাধ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণের অধিকারী ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (১৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১২৭৩ সাল) কলকাতার নিমুগোস্বামী লেনে তাঁর জন্ম। পিতা রসিকলাল চন্দ্র ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষক।

তাঁর বাল্যকালে কলকাতা শহরে জলের কল, গ্যাস বা বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। এমনকি দেশলাইয়েরও বহুল প্রচলন ছিল না। চকমকি পাথর ঠুকে পোড়ানো শোলায় আগুন লাগিয়ে কাঠকয়লার টিকা ধরানো হ'তো। তারপর টিকা থেকে গন্ধকের দেশলাই জ্বালিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হতো। প্রদীপের আলোতেই সুরু করেন বিদ্যাভ্যাস। এই অভ্যাস মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে ত্যাগ করে নি। মাতা নয়নতারাদেবী ছিলেন অতি ভক্তিমতী, ধর্ম-পরায়ণা এবং হিন্দুমাতার আদর্শরূপিণী। মাতৃভক্ত কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দের গার্হস্থ্য নাম) শৈশব থেকেই তীর্থস্থানে যেতে অভ্যস্ত হন।

পাঁচ বছর বয়সে তাঁর হাতেখড়ি হয় এবং সেই সময়ে তিনি লাহা পাড়ায় গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখানে দুবছর পড়েন ও প্রতিবছর উচ্চ পারিতোষিক পেতেন। এই পাঠশালা থেকে যদু পণ্ডিত মশা'য়ের বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিন বছর বিদ্যালাভ করেন। এই বিদ্যায়তনে তাঁর অন্যতম সহপাঠী ছিলেন বাবুরাম ঘোষ যিনি পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান-তালিকায় স্বামী প্রেমানন্দ নামে বিখ্যাত হন।

মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হন। লেখাপড়ায় বরাবরই খুব ভাল ছিলেন। এখানে ড্রইং ক্লাসে তিনি নৈপুণ্য প্রকাশ করায় অঙ্কনের শিক্ষক তাঁকে এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। হঠাৎ তিনি একদিন শিক্ষক মহাশয়কে বললেন যে, তিনি চিত্রকর হবেন না, দার্শনিক হবেন। অতএব আর অঙ্কনবিদ্যা শিখবেন না। শিক্ষক মহাশয়

বলেছিলেন, 'কালীপ্রসাদ, আমার মতে, ফিলোজফারের চেয়ে পেণ্টার হওয়াই ভাল, কেন না শিল্পী দার্শনিকের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ'। এই কথা শুনে তিনি দৃঢ়তার সংগে বলেছিলেন : 'না মাষ্টার মহাশয়, a painter studies the surface of things, but a philosopher goes below the surface and studies the causes of things.'

ছেলেবেলা থেকে তাঁর মানসিক একাগ্রতা যথেষ্ট ছিল। স্মরণ শক্তিও তীব্র ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার স্পৃহা উদগ্র ছিল। স্কুলে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনে পড়তেন। শুধু তাই নয়, ছুতোরের কাজ, বুক বাইণ্ডিং (বই বাঁধানো), বাগান করা প্রভৃতি নানা ধরণের শিল্প-কার্য তিনি একবার দেখলেই ঠিক করতে পারতেন। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সেই গীতা পাঠ সমাপ্ত করেন।

১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সরল বাংলায় কতগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেইসব বক্তৃতায় সাংখ্যদর্শনের ক্রমবিকাশবাদ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 'ইভোলিউশন থিয়োরী' উভয়ের সামঞ্জস্য দেখানো হয়েছিল। কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ) পরম আগ্রহ সহকারে সেই সব বক্তৃতা শুনতেন এবং যে সব পত্রিকাতে বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হতো তা কিনে পড়তেন।

কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কাছে 'পাতঞ্জলদর্শন' পাঠ করেন অশেষ কৃচ্ছ্রতার সংগে। এই সময়ে 'শিবসংহিতা' কিনে পড়তে আরম্ভ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংগে পুণ্য যোগাযোগ ঘটে। প্রথম দর্শনের পরেই কালীপ্রসাদের মনে প্রগাঢ় অনুরাগের সঞ্চার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি জীবনের দিশারী মনে ক'রে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসুখের সময় কাশীপুরের বাগানে থাকাকালে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। ঐ কাশীপুরের বাগানেই গুরুর কাছ থেকে 'গেরুয়া' পান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে বরানগর মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে তিনি কঠোর তপস্যা করতেন এবং শাস্ত্র পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। এজন্য তাঁর নাম হয় কালী-তপস্বী। এখানেই বিরজা হোমের পরে তাঁর নাম হ'লো স্বামী অভেদানন্দ।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরী যাত্রা করেন। সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পদব্রজে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। অনাহার, অর্দ্ধাহারে, কপর্দকশূন্য অবস্থা তাঁর সদানন্দচিত্তে মলিন ছায়া ফেলতে পারে নি।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে তিনি বেদান্ত প্রচারে লণ্ডন যাত্রা করেন। ঐ বছরের ২৭শে অক্টোবর লণ্ডনের ব্লুমস্ বেরী স্কোয়ারে খৃষ্টো-থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে প্রথম বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা অত্যন্ত মনোরম হয়। বিষয়টি ছিল 'Philosophy of the Panchadasi'। স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে সেদিন বলেন: 'আমি যদি এই মর জগৎ থেকে প্রস্থান করি, তাহলেও আমার এই প্রিয় গুরু ভ্রাতার মুখ দিয়ে আমার বাণী প্রচারিত হবে।' স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের মধ্যে যে প্রগাঢ় প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন ছিল তার নিদর্শন স্বদেশে ও বিদেশে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে।

লণ্ডন বেদান্ত সমিতির কর্মভার মিঃ ই. টি. স্টার্ডির উপর দিয়ে স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট শুক্রবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বন্দর নিউইয়র্কে অবতরণ করেন। এখানে পৌঁছানোর দিন সন্ধ্যাকালে তিনি যখন ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন দেখেন একজন লোক ছয় ইঞ্চি ব্যাসের একটি দূরবীণ দিয়ে শনিগ্রহ ও তার উপগ্রহমণ্ডলী দেখছে। অভেদানন্দ সেই দূরবীণে ও তার উপগ্রহ মণ্ডলী দেখে আনন্দিত হলেন এবং লোকশিক্ষার এই অভিনব উপায়ে পুলকিত হলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশের মানুষের অসহায় অবস্থা ও শিক্ষার অভাব চিন্তা ক'রে বিমর্ষ হন।

ওদেশে নবাবিস্কৃত ফনোগ্রাফ ও ইলেকট্রোস্কোপ দেখে আশ্চর্যান্বিত হন। দূরবীণে চন্দ্রকে দেখতে গিয়ে তার মধ্যেকার উপত্যকা ও পর্বতগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পান। একজন লোক চার্ট দেখে উপত্যকা ও পর্বতগুলির নাম ব'লে দিয়েছিলেন। এখানে উইলিয়ম জেমস্, রেভারেণ্ড ডক্টর হিবার নিউটন, উইলিয়ম জ্যাকসন, জোসিয়া রয়েস, অধ্যাপক ল্যানম্যান, অধ্যাপক ফে, বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসন, ডক্টর এলমার গেটস্, রালফ্ ওয়ালডো ট্রাইন, ডব্লু. ডি. হাউয়েলস্, অধ্যাপক হার্সেল পার্কার, ডাঃ লোগ্যান, রেভারেণ্ড বিশপ পটার, অধ্যাপক স্যালার, কেম্ব্রিজ্ ফিলজফিক্যাল্ কনফারেন্সের চেয়ারম্যান ডক্টর জেন্‌স প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মণ্টক্লেয়ায়রে এসে

বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এডিসন স্বামী অভেদানন্দকে নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি ও তার নির্মাণ কৌশল ও ব্যবহার প্রণালী বুঝিয়ে দেন। তিনি অভেদানন্দের সঙ্গে ভারতবর্ষ ও বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

নিউ ইয়র্কে তাঁর বেদান্ত ক্লাস অদ্ভুত সাফল্যলাভ করে। তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচার পন্থা আমেরিকাবাসীদের চিত্ত জয় করেছিল। তাঁর কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে ***Hinduism Invades America***-র লেখক ওয়েন্ডন টমাস বলেন, : 'Rather than overpower by flashing oratory, he seeks to convince by sweet reasoning and a vast array of new and pictursque facts'.

গ্রীন্‌একারে একটি পাইন গাছ 'স্বামিজীর পাইন' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ছাত্রদের রাজযোগ শিক্ষা দিতেন। এখানে সার্কাসের একটি তাবুতে স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতা দেন। বিষয় ছিল, 'ধর্ম ও বিজ্ঞান'। এটি প্রথম বক্তৃতা। দ্বিতীয় বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'বেদান্ত কি?' স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতা সম্পর্কে 'ব্রহ্মবাদিন্‌' পত্রিকার নিউ ইয়র্কস্থ সংবাদদাতা বলেন, 'স্বামী অভেদানন্দের পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে অসাধারণ দখল থাকায় তাঁর খুবই সুবিধা হয়েছিল। কারণ পাশ্চাত্য নরনারীদের যাঁরা তাঁর বক্তৃতায় আসতেন, তাঁরা পাশ্চাত্য মনীষীদের মতই গ্রহণীয় মনে করে থাকেন। বেদান্তের কোনও মতের সঙ্গে যদি হাক্সলি, টিণ্ড্যাল, স্পেন্সার, বা কাণ্টের মতের মিল দেখানো যায় তাহলে তা যেমন শ্রোতৃবৃন্দের মনে লাগবে তেমন হাজার ভাল ভারতীয় মুনি-ঋষিদের বচন উদ্ধৃত ক'রেও হবে না। আর তা-ই স্বাভাবিক। যেহেতু, আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানের মাপকাঠি দিয়েই সমস্ত বিচার ক'রে থাকি।'

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে অভেদানন্দ তাঁর বিখ্যাত 'ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যাকসন উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়।

এই বছরেই ৩০শে এপ্রিল তিনি কেম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা দেন। ১৩ই জুলাই ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ক্লাস আরম্ভ হয়। অভেদানন্দ এই বিদ্যালয়ে 'দেহতত্ত্ব' সম্বন্ধীয় ক্লাসে যোগদান করেন। এখানে তিনি

১৪ দিন ধ'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০টি বক্তৃতাতে যোগ দেন এবং মাইক্রস্কোপের সাহায্যে বিভিন্ন জীব-জন্তু ও নরদেহের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এখানে ২০শে জানুয়ারী রীড্ লোটনের (Mrs S. E. Reed Louton) গৃহে 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় কৃষ্টি ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে গণিত শাস্ত্র, বীজগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ভেষজতত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধীয় ধারণা ভারত থেকেই বিদেশীরা গ্রহণ করেছে। বক্তৃতার পর সামার স্কুলের ছাত্রগণ এই সুযোগে অভেদানন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। ডাঃ হল ও অন্যান্য অধ্যাপকদের ক্লাসে সুন্দর চেহারা ও আভিজাত্যপূর্ণ ব্যবহার তাঁদের স্বামী অভেদানন্দের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বিশেষভাবে ডাঃ মেয়ারের অধীনে জীবতত্ত্ব ও স্নায়ুতত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন এবং সেই বিভাগের গবেষণাগারে অতি যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা কার্য করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখের (সোমবার) 'উরচেষ্টার টেলিগ্রাম' পত্রিকা (Worcester Telegram) লেখেন, : 'After the lecture, students of the summer school availed themselves of the opportunity to be introduced to the swami, whose handsome feature and dignified figure have been a matter of no little curiosity at the lecture of Dr. Hall and other courses ; particularly he is following the scientific biological work of Dr. A. Adolf Meyer in Neurology and his lecture course, and is interested in the laboratory work of that department'.

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্কিন্লীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। উল্লেখযোগ্য এই যে, স্বামী অভেদানন্দ হ'লেন প্রথম ভারতীয় যাঁর সঙ্গে আমেরিকার কোন প্রেসিডেণ্ট সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎও বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়েছিল।

স্বামী অভেদানন্দ আলাস্কা, মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি উত্তর আমেরিকার বহু দেশে পর্যটন করেন এবং নানা প্রতিষ্ঠানে বেদান্ত প্রচার করেন। ইয়োরোপে লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি মহানগরীর বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় দর্শন, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও

সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯০৫-১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ব্রুকলীন ইনষ্টিটিউটে ভারতীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতি সম্বন্ধে 'India and Her People' নামে বক্তৃতাবলী প্রদান করেন। এ' বক্তৃতার আর একটি বিষয় ছিল—প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার পারস্পরিক বিনিময় কি ধরণের ছিল। তাছাড়া বৌদ্ধযুগকে আমরা স্বর্ণযুগ বলি ও সে যুগে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারকরা কিভাবে আলেকজান্দ্রিয়া, ইজিপ্ট, গ্রীস, সাইবেরিয়ায় প্রভৃতি সুদূর দেশে কিভাবে ভারতের ধর্ম প্রচার করেছিলেন। প্রায় দশবছর কাল আমেরিকায় ভারতের ধর্ম, শিক্ষা ও সভ্যতার বাণী সগৌরবে প্রচার ক'রে লণ্ডন থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন স্বামী অভেদানন্দ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন উপস্থিত হ'লেন কলম্বো বন্দরে। সেখানে তাঁকে সম্বর্ধিত করার বিশেষ আয়োজন হয়েছিল। এসে দেখলেন স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর সন্ন্যাসী ভ্রাতারা হতাশাপীড়িত ও নিষ্ক্রিয়। অনুভব করলেন, এঁদের সক্রিয় ক'রে তোলবার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেন।

কলকাতা এসে দীর্ঘ কয়েক বছর পরে বেলুড় মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হন। কলকাতা ত্যাগ ক'রে তিনি পাটনা, কাশী, আগ্রা এবং আলোয়ারে যান। আলোয়ার থেকে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। এখানে বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তার সুদীর্ঘ আলোচনা হয় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও তার পরিবর্তন সম্বন্ধে। এমনিভাবে কেটে গেল ছ'টি মাস। দক্ষিণ থেকে সুরু ক'রে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দিলেন শক্তিমন্ত্র। নৈরাশ্যের নিশার অবসান হ'লো। উদিত হলো কর্মময় জীবনের সূর্য। উজ্জীবিত হয়ে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ। আবার ফিরে চললেন আমেরিকায়। সেখানে অবিশ্রান্ত কর্মপ্রবাহ। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সমিতির শ্রেষ্ঠ কাজ হ'লো 'ইন্দো-আমেরিকান ক্লাব' গঠন। লণ্ডনে, আমেরিকায় এবং তার কাছাকাছি জায়গাগুলিতে বেদান্ত আন্দোলন এবং বিশাল হিন্দুধর্মের প্রচার করতে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর কাল পেরিয়ে গেল। সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিলেন তরুণ সন্ন্যাসীদের হাতে। নবীনকে স্থান করে দিতে হবে। তাকে বাড়তে দিতে হবে। তাছাড়া জন্মভূমি ডাকছে দীর্ঘ প্রবাসী সন্তানকে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই যাত্রা করলেন ভারতের দিকে। সাতদিন পরে

নিউইয়র্কে পৌঁছালেন। ১১ই আগস্ট সেখানে 'প্যান-প্যাসিফিক এডুকেশন কনফারেন্স হয়'। তিনি আমন্ত্রিত হয়ে হাওয়াই-দ্বীপে নামলেন। অবশেষে ১০ই নভেম্বর কলকাতায় উপস্থিত হলেন। তার আগে জাপান, চীন, ফিলিপাইন, সিংগাপুর, কোয়ালালামপুর, রেংগুন প্রভৃতি ঘুরে আসেন আমন্ত্রিত হয়ে। কলকাতায় তাঁর উপস্থিতি তরুণ বাঙালী সমাজকে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল এবং কলকাতার নগরবাসীরা মিলিত ভাবে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই অভ্যর্থনা উৎসবের স্থান ছিল কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট এবং ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। পরের বছর জানুয়ারীতে জামসেদপুরে তিনি একটি মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ বছরেই (১৯২২) তিনি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিং প্রভৃতি পূর্ববংগের নানা স্থান ঘুরে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা জাগিয়ে বেলুড় ফিরে আসেন। জুলাই মাসে লাদাকে 'হিমিস্ মঠে' যান। সেখানে তিব্বতী ভাষায় লিখিত পুঁথির কিছু কিছু অনুবাদ ক'রে নিয়ে আসেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত করেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি' কলিকাতায়। স্বামী অভেদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সহঃসভাপতি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিদেশ থেকে ফেরার পরই অভেদানন্দ অনুভব করেছিলেন কলকাতার চেয়ে দার্জ্জিলিং এর জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। তাই তিনি দার্জ্জিলিঙে একটি আশ্রম স্থাপন করবার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে থাকেন। অবশেষে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় দু'বিঘে নিষ্কর জমি কেনেন এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে ঐ স্থানেই 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমের সংগে সংগে এখানে অবৈতনিক বিদ্যালয়, মিস্ত্রীর কাজ শেখার ক্লাস ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি যখন দার্জ্জিলিং আশ্রম থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন তখন 'ঘুম' ষ্টেশনের আগে বাতাসিয়া লুপের কাছে দার্জ্জিলিং মেলের প্রথম শ্রেণীর যে কামরায় তিনি ছিলেন ঠিক সেটিই লাইনচ্যুত হয়। তিনি কামরা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েন এবং তাতেই তিনি হার্টে আঘাত পান। এই দুর্ঘটনাই তাঁকে অসুস্থ করে ফেলে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার টাউনহলে বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে

এই বিদগ্ধ পণ্ডিত তপস্বী যেভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে ছিলেন তা মনে হবে—এ-ই হচ্ছে খাঁটি সন্ন্যাসীর বিনয়। তিনি বলেছিলেন, 'আজ মহাসভায় আমি কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষের প্রতিনিধিরূপে, অথবা কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির সভাপতিরূপে এখানে আসি নাই, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একজন দীন সন্তান ও সাক্ষাৎ শিষ্যরূপে এবং সেই বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের সর্বশেষ একমাত্র জীবিত গুরুভ্রাতারূপেই উপস্থিত হইয়াছি…।' এই বক্তৃতাই তাঁর শেষ বক্তৃতা। এর পরে আর কোন সভায় তাঁর উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ১৯, বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে (কলকাতা-৬) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতিকে তিনি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের নামে উৎসর্গ করেন, যেমনটি করেছেন দার্জিলিং-এর আশ্রমটিকে। সেই থেকে প্রতিষ্ঠিত হ'লো 'শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ' কলকাতায়। অবশ্য কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ শেষ করে তিনি যখন বেলুড় মঠে ফেরেন তখন কলকাতায় মঠ স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কেননা কলকাতা চিরদিনই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। তিনি প্রথমে কিছুদিন মেছুয়াবাজারে ও পরে ১১নং ইডেন হস্পিটাল রোডে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। তখন তিনি প্রতি সপ্তাহে গীতা, পাতঞ্জলদর্শন ও কঠোপনিষৎ সম্বন্ধে বাংলায় তিনটি করে ক্লাস নিতেন এবং তাতে ক'রে তদানীন্তন কলকাতার ছাত্রসমাজ, শিক্ষাবিদ্ ও জনসাধারণের সঙ্গে যথেষ্টভাবে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তারপর তিনি বেদান্ত সমিতিকে ৪০নং বিডন ষ্ট্রীটে অধুনা অভেদানন্দ রোডে স্থানান্তরিত করেন এবং সেখানেও ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে নিয়মিতভাবে ক্লাস নিতেন। পরে বর্তমান ১৯, বি নং রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের স্থানটি বেদান্ত সমিতির জন্য ক্রয় করেন এবং স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করেন। রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ নাম গ্রহণ করে।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা ১৬ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন স্বামী অভেদানন্দ। কালীপ্রসাদ কালীমাতা চরণে ফিরে গেলেন। স্বামী অভেদানন্দের মরদেহ নেই, কিন্তু তিনি বিরাজ করছেন তাঁর অসংখ্য বক্তৃতা, রচনাবলীর মধ্যে অসংখ্য গুণমুগ্ধ ভক্ত হৃদয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন এই সন্ন্যাসীর মৃত্যু নেই।

এক

॥ স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা ॥

উনবিংশ শতাব্দী ভারতীয় মনীষার সুবর্ণ যুগ। এই যুগে ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন কত মহাপ্রাণ—তাঁদের জ্ঞান, কর্ম ও ত্যাগের পবিত্র ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। এই যুগ নবজাগরণের, স্বাজাত্যবোধের। আবার এ-যুগেই ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা। পরানুকরণের নপুংসক ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে কত বঙ্গবাসী, ভারতবাসী। উচ্ছৃঙ্খলতার মদিরাপানে আরক্ত নয়ন এযুগের 'নিমচাঁদ', 'ভোলাচাঁদে'র শীৎকারে, বিজৃম্ভণে কলুষিত প্রশ্বাসের বাতাস। অন্ধকারের বুক চিরে চিরে উঁকি দেয় নতুন প্রভাতের আলো। আকাশ আলো-আঁধারিতে ভরা। স্পষ্ট-অস্পষ্টের মায়াভরা আলিঙ্গন। রামমোহন যে সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনিয়েছিলেন তা আলো-আঁধারির কেয়ারি অতিক্রম করে সাবলীল তরঙ্গ তুলে জনচিত্তে স্থায়ী আসন গ্রহণ করতে তখনো পারেনি। দেবেন্দ্রনাথ পূর্বসূরী রামমোহনের অসমাপ্ত কাজকে নিয়ে চললেন পরিপূর্ণতার দিকে। অনিবার্য ধর্মান্তরীকরণের কাজ শ্লথ হলো। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী থেকে উঠলো নতুন আহ্বানমন্ত্র। শিক্ষিত তরুণ সমাজ, দ্বিধাগ্রস্ত বঙ্গসন্তান, জটিলতার আবর্তে নিমজ্জিত যুবসমাজ মুক্তির মন্ত্র পেল এক তথাকথিত 'অশিক্ষিত' ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃতে ফুটে উঠলো স্বাদেশিকতার, মানবপ্রীতির, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের এক প্রাণমাতানো রক্তশতদল।

না, ধর্ম মানেই পূজা অর্চনা নয়, বিজ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে নয়, প্রচলিত রীতি আঁকড়ে ধরা নয়, তার কাজ সমন্বয়-সাধন। পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে হলে, জীবনকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে হ'লে যে পথের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক, শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন তারই মন্ত্র। এ কথামৃত কর্মে উদ্বুদ্ধ করে স্তিমিতকে, ভোগীকে ইঙ্গিত দেয় নিবৃত্তির, নির্বীর্যকে উপদেশ দেয় বীর্যশালী হবার, শত্রুকে মিত্রে রূপান্তরণের প্রতিশ্রুতির বাণী শোনায়। 'ছোট আমি'কে 'বড় আমি'র মহিমময় সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার সার্থক প্রেরণা যোগায়। অর্ধনগ্ন,

আপাত নিরক্ষর, কাম-কাঞ্চনত্যাগী, সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, উদারপ্রাণ এই মহামানবের পদতলে লুটিয়ে পড়লো কত শিক্ষিত নবীন প্রাণ। কত যুক্তি, কত তর্ক, কত নিভৃত পরীক্ষা। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত দর্শনশাস্ত্র-তর্কশাস্ত্র মথিত ক'রে উত্থিত ক্ষণজন্মা পুরুষ নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) চিত্ত সংশয়িত, দোলায়িত, মন পরীক্ষারত। অবশেষে রামকৃষ্ণ-সিন্ধুতে অবগাহন। একে একে সম্মিলিত হ'লো নক্ষত্রের দল। এমনি একটি কিশোর নক্ষত্র কালীপ্রসাদ—রামকৃষ্ণ-সৌরমণ্ডলের মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল গ্রহ। বলা যেতে পারে রামকৃষ্ণ-নীহারিকামণ্ডলের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। জ্ঞানোজ্জ্বল, কর্মোজ্জ্বল। যেন যোগভ্রষ্ট তাপস। শৈশবে গণিতে যেমন বিশেষ পারদর্শিতার জন্যে রৌপ্যপদক-প্রাপ্তি, তেমনি হিতোপদেশ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, ভট্টিকাব্য, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ছন্দমঞ্জরী কণ্ঠস্থ। তেমনি গীতা, ভাগবত, পাতঞ্জল ও শিবসংহিতা ওষ্ঠাগ্রে ; যোগশাস্ত্র অধ্যয়নের আকণ্ঠ তৃষ্ণা। তাই ব'লে যুক্তি-তর্ক বিসর্জন দিয়ে নয়, বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ ক'রে অজ্ঞানতার রাজ্যের অধিবাসী হ'য়ে নয়, বিজ্ঞানের ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে ধর্ম শাস্ত্রকে। একথা সত্য যে বিজ্ঞান সর্বত্র ভ্রমণশীল নয়, তার গতির সীমা আছে, গণ্ডি আছে। মানুষের বুদ্ধি, ধীশক্তি আরো দূরে গতিমান। স্মৃতি, বুদ্ধি ও বিজ্ঞান এই তিন হাতিয়ারে শক্তিশালী হ'য়ে ধ্রুবলক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চললেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ কালীপ্রসাদ, যিনি পরবর্তী অধ্যায়ে 'অভেদানন্দ' নামে ভুবন মাতিয়েছিলেন। জ্ঞানমার্গের সাধক এবং যোদ্ধা, অক্লান্ত, রণজয়ী। তথাপি হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে ভক্তির হিমানীপ্রবাহ—প্রশান্ত, নিরুদ্বেলিত।

কৈশোরের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি যৌবনে মহাজিজ্ঞাসায় পরিণত। স্বামী অভেদানন্দ রামকৃষ্ণ-মহামণ্ডলের অন্যতম দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পাশ্চাত্ত্যে রামকৃষ্ণ-ভাবনা, বেদান্ত-চিন্তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মহাকর্মে সন্নিবিষ্ট। তাঁর ভাষণ, তাঁর বাণী পাশ্চাত্ত্যের হৃদয়কে নাড়া দিতে পেরেছিল যেহেতু তিনি ছিলেন এক বৈজ্ঞানিক মনের অধিকারী, ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। বিজ্ঞানীর কর্তব্যও ঐ একই। যুক্তি-তর্ক দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান করা বিজ্ঞানীর একান্ত কর্তব্য। তার জন্যে প্রয়োজন পরিশীলিত মনের। অভেদানন্দের কৈশোরের, প্রথম যৌবনের অনুশীলন-স্পৃহা, অধ্যয়ন ও

অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি উত্তরজীবনের প্রগাঢ় মননশীলতায় পরিপূর্ণ এক মহৎ জীবনের সুনিপুণ প্রস্তুতি।

ব্রাহ্মসমাজের নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আমেরিকা থেকে ফিরে মেডিকেল কলেজের হলে 'Tour round the World' সম্বন্ধে ইংরেজি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিশোর কালীপ্রসাদ ঐ বক্তৃতা শুনে বুঝেছিলেন, (তৎকালীন) মার্কিন দেশবাসীরা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি থেকে সব বিষয়ে উন্নত। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'মজুমদার মহাশয় আমেরিকার নানা বিষয় বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন দুই তিন তালা বড় বড় বাড়ী এক স্থান হইতে টানিয়া সদর রাস্তার উপর দিয়া দূরে অপর এক স্থানে স্থাপন করা হয়। স্থানান্তরিত করিবার সময় গৃহবাসীরা ঐ বাড়ীতে বাস করিতে থাকে, তাহাদের কোন গৃহকর্ম বন্ধ থাকে না। ইহা শ্রবণ করিয়া আমার মনে আমেরিকা দেখিবার কৌতূহল সৃষ্টি হয়'। প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবার জন্য তিনি তাঁর পিতৃদেবকে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতেন। তাঁর প্রশ্নাবলী শুনে পিতা রসিকলাল বলতেন, 'এত অল্পবয়সে এত অনুসন্ধিৎসু সন্তান কখনও দেখি নাই'। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পশু-পক্ষী পালন, রন্ধনকার্য, ছুতোরের কাজ, বই বাঁধানো, বাগান করা এবং নানা শিল্পকার্য তিনি শিখেছিলেন। কেন? তার মূলে ঐ অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি।

স্বামী অভেদানন্দের বাল্যজীবন অজানাকে জানবার তীব্র এষণায় পরিপূর্ণ। তিনি সত্যের অনুসন্ধান করেছেন, যাচাই করেছেন যুক্তির কষ্টিপাথরে, অবশেষে তাকে গ্রহণ করেছেন, অথবা পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রকৃতি যেন সত্যানুসন্ধানের জন্যই উন্মুখ। এ' প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস বেকনের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃতির যোগ্য[১]—

> For myself I found that I was fitted for nothing so well as for the study of Truth ; as having a mind nimble and versatile enough to catch the resemblance of things (which is the chief point), and at the same time steady enough to fix and distinguish their subtler differences ; as being gifted by nature with desire to seek, patience to doubt, fondness to

১ **Francis Bacon :** ***Novum Organum*** **(1620)**

meditate, slowness to assert, readiness to reconsider, carefulness to dispose and set in order; and as being a man that neither affects what is new nor admires what is old, and that hates every kind of imposture. So I thought my nature had a kind of familiarity and relationship with Truth.

অভেদানন্দ প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানী নন, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পাঠ ক'রে ডিগ্রী লাভ করেন নি, তথাপি তিনি বিজ্ঞানীর ধর্মযুক্ত। কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্ত, যুক্তিতে আস্থাশীল অভেদানন্দ বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী। আর, বিজ্ঞানীদের কাছে এই 'মেজাজ' হ'লো প্রাথমিক কথা।

বিগত ১৮৯৯ সালে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতির ভাষণে সার মাইকেল ফস্টার প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিজ্ঞানীর কি কি গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। এই মৌল প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বহু তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হয় বৈজ্ঞানিক মেজাজের প্রকৃতি প্রধানতঃ তিন প্রকারের। সেগুলি সংক্ষেপে হ'লো[২]—

এক: বিজ্ঞানীর প্রকৃতি এমন হবে যেন যে বিষয় নিয়ে তিনি অনুসন্ধান করছেন সেই বিষয় সম্পর্কে তিনি হবেন অনন্যমনা। যিনি সত্যের সন্ধানী,

২ In the first place, above all other things, his nature must be one which vib.ates in unison with that of which he is in search; the seeker after truth must himself be truthful, truthful with the truthfulness of nature; which is far more imperious, far more exacting than that which man sometimes calls truthfulness.

In the second place, he must be alert of mind. Nature is ever whispering to us the beginning of her secrets; the scientific man must be ever on the watch, ready at once to lay hold of nature's hint, however small, to listen to her whisper, however low..

In the third place, scientific inquiry, though it be pre-eminently an intellectual effort, has need of the moral quality of courage not so much the courage which helps a man to face a sudden difficulty as the courage of steadfast endurance.'

—*Report, Brit. Association for the Advancement of Science, 1899.*

তিনি নিজে সত্যবাদী হবেন, প্রকৃতির সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে একাত্ম হবেন। এ কাজ খুব বেশি জরুরী, তথাকথিত সত্যনিষ্ঠার চেয়ে এ কাজ বেশি যথাযথ।

দুই : বিজ্ঞানীর মন হবে অতি সচেতন। প্রকৃতি সর্বদাই আমাদের নানা ইঙ্গিত দিচ্ছে। সে নিয়ত প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বলে চলেছে তার রহস্যের গোড়াকার কথা। বিজ্ঞানীকে এই বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। প্রকৃতির ইঙ্গিত বিজ্ঞানীকে মুহূর্তের মধ্যে ধরতে হবে, তা সে ইঙ্গিত যত সামান্য হোক না কেন ; তার ফিসফিসানি যত মৃদু পর্যায়ের হোক না কেন তাকে শুনতে হবে।

তিন : বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও সাহস।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সত্যনিষ্ঠ হওয়া, সচেতন হওয়া অথবা সাহসী বা দৃঢ় চিত্তের অধিকারী হওয়া এমন-কিছু দুর্লভ গুণাবলী নয় যা কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেই বর্তমান। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি মানুষের এই গুণত্রয় তাকে পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যায়, এবং তা অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞানী হাক্সলি বলেছেন, 'বিজ্ঞান হ'লো সংগঠিত বা সুপরিচালিত কিংবা পূর্ণাঙ্গ সাধারণ জ্ঞান মাত্র, এবং বিজ্ঞানীরা ঐ 'সাধারণ জ্ঞানের' অনুশীলনকারী সাধারণ মানুষ। এ কারণেই সার মাইকেল ফস্টার বলেছিলেন, 'আমি একথাই জোর দিয়ে বলতে চাই যে বিজ্ঞানীদের অদ্ভুত কোন শক্তি নেই বা কোন বিশেষ ক্ষমতা নেই। তাঁরা সাধারণ মানুষ, তাঁদের ব্যবহারও সাধারণ, এমন কি গতানুগতিক'। বলা বাহুল্য, এঁদের এই মত গ্রহণযোগ্য, কিন্তু কিঞ্চিৎ বক্তব্যও বর্তমান। বিজ্ঞানীরা বুদ্ধি নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা নীতিবাদী নন। নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে তাঁরা সচেতন, কিন্তু তার উপরেই তাঁরা নির্ভরশীল নন।

কথাটা প্রাঞ্জল করা যাক। বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারীদের সত্যকে জানবার উদগ্র বাসনা থাকে। এই প্রবৃত্তিকে সার মাইকেল ফস্টারের নির্দেশিত সত্যবাদিতার (truthfulness) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই বাসনা বা প্রবৃত্তি হ'লো পর্যবেক্ষণের নিপুণতা এবং বাহুল্যবর্জিত মূল বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করবার অধিকার অর্জন করা। সাধারণ মানুষ বা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরহিত মানুষ যে কোন বিষয় সম্পর্কে 'প্রায়' বা 'কাছাকাছি' সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন। কিন্তু প্রকৃতির স্বভাব তা নয়। আপাতসিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া প্রকৃতির ধর্মবিরুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক মেজাজের মানুষদের কাছেও এইটেই

সত্য। যিনি বিজ্ঞানী তিনি 'আপাত' ও 'প্রকৃত'—এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা বের করবেন। বিজ্ঞানীপ্রবর ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের জীবনী পড়লে দেখা যায় শৈশবে তিনি এই ধরনের প্রশ্ন তুলে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতেন অভিভাবকদের—'এ জিনিসটা কি ? এ দিয়ে কি হয় ?' অস্পষ্ট জবাবে খুশি হতেন না। আবার নাছোড়বান্দার মত জিজ্ঞাসা করতেন, 'এ জিনিসের বা এ বস্তুর অথবা এ ঘটনার বিশেষত্ব কি ?' স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে যেমন এই জাতীয় ঘটনার বহু উল্লেখ আছে, তেমনি আছে স্বামী অভেদানন্দের জীবনে। আত্মজীবনীতে অভেদানন্দ শৈশবের স্মৃতিচারণ ক'রে বলেছেন, 'বাল্যকাল হইতে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমি আমার পিতাকে সর্বদা নানাবিধ প্রশ্ন করিতাম'।

বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারীদের মধ্যে যেমন থাকে সত্য অনুসন্ধানের প্রবল স্পৃহা, তেমনি থাকে সতর্কতা। যা যুক্তি বা প্রমাণ দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়, যে সিদ্ধান্তে দ্বিধা উপস্থিত হতে পারে, সন্দেহ হতে পারে, তাকে পরিত্যাগ করতে হবে অথবা আরো যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মন সম্পর্কে অধ্যাপক কার্ল পিয়ারসনের বক্তব্য এ-স্থলে প্রসংগত ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন[৩]—

> 'The scientific man has above all things to strive at self-elimination in his judgements, to prove an argument which is as true for each individual mind as for his own. The classification of facts, the recognition of their own sequence and relative significance, is the function of science, and the habit of forming a judgement upon these facts, unbiassed by personal feeling, is characteristic of what may be termed the scientific frame of mind.'

এই আলোকে স্বামী অভেদানন্দকে বিচার করে দেখতে হবে। তিনি প্রতিটি বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, স্বীয় প্রজ্ঞার আলোয় তা বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। এ কাজ বিজ্ঞানীর। অভেদানন্দ দার্শনিক ব'লে বিশ্বে পরিচিত ছিলেন। আজও তাঁর সেই একই পরিচয়। তিনি এক ধর্ম-

৩ Pearson, Karl : *The Grammer of Science*, 2nd Ed. (1900), p. 6.

সংঘের বলিষ্ঠ মুখপাত্র, প্রখর বেদান্তবাদী দার্শনিক। প্রশ্ন ওঠে, তবে কি তিনি মায়ার খেলা মনে ক'রে পরিত্যাগ করেছেন পৃথিবীর বস্তুনিচয়কে? তিনি কি সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকামণ্ডলীকে অলীক বলে অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছেন? না। তথাকথিত দার্শনিকদের মতো তিনি মানসিক দাসত্বে বদ্ধ ছিলেন না। কোন অতিপ্রচলিত প্রকল্পকেও তিনি মোহগ্রস্ত হ'য়ে স্বীকার করেন নি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানেই। তিনি যে শ্রেণীর দার্শনিক তার সংগে বৈজ্ঞানিক-মন-সমৃদ্ধ পর্যবেক্ষকের পার্থক্য নেই বললেই চলে। মহাবিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে দার্শনিকের ধর্ম-সম্বন্ধে যা বলেছেন তা স্বামী অভেদানন্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর ভাষায়[৪]—

> 'The philosopher should be a man willing to listen to every suggestion, but determined to judge for himself. He should not be biased by appearances ; have no favourite hypothesis ; be of no school, and in the doctrine have no master. 'He should not be a respecter of persons, but of things. Truth should be his primary object. If to these qualities be added industry, he may indeed hope to walk within the veil of the temple of Nature.'

বিজ্ঞানের রাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন কৈশোরেই। তার ফলে বৈজ্ঞানিক মেজাজ গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথও একথা বলেছেন তাঁর 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র ভূমিকাতে। তিনি বলেছেন,

> 'ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃংখলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে'।

এই বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী ছিলেন বলেই স্বামী অভেদানন্দ দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন[৫],

> 'যে শাস্ত্র মানুষের অদৃষ্ট নিয়ে খেলা করে, আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতার ওপর একাধিপত্য বিস্তার করে, কিংবা বিবেক-বুদ্ধিজীবী মানুষকে দৈবের

---

৪ **J. A. Thompson : *Introduction to Science* (1928), p. 26.**

৫ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : মন ও মানুষ (প্রথম সং), পৃ ৮১

হাতের যন্ত্র-পুত্তলিকা ক'রে তোলে, তার সকল সত্যতা মেনে নিতে আমি রাজী নই—অন্ততঃ যুক্তির দিক থেকে'।

এবং আশ্চর্য বোধ হয় যখন এক ধর্মপ্রবক্তার কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় 'ব্রত, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-উৎসব—এ'সব ধর্মের আনুষঙ্গিক, এরা আসলে ধর্ম নয়'। এক প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যিনি এ আঘাত দিতে পারেন, তিনি আকস্মিকভাবে এই মেজাজের অধিকারী হননি। কঠোর অনুশীলনের হিমগিরি অতিক্রম ক'রে সফলতার প্রদীপ্ত বেদিকায় আরোহণ করতে পেরেছিলেন। স্মৃতিচারণে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন[৬]—

'১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সরল বাংলাভাষায় অ্যালবার্ট হলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়া হিন্দু সভ্যদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বর্তমানে কলেজ স্ট্রীটে যে স্থানে অ্যালবার্ট হল অবস্থিত সেই স্থানে তখন একটা ক্ষুদ্র অ্যালবার্ট হল ছিল এবং তথায় কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম-সমাজের স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই হলে আমি নিয়মিতভাবে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যাইতাম। সেইসকল বক্তৃতায় সাংখ্যদর্শনের ক্রমবিকাশবাদ ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের 'ইভোলিউসন থিয়োরী' উভয়ের সামঞ্জস্য দেখানো হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ 'বঙ্গবাসী' নামক দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইত। আমি বঙ্গবাসী পাঠ করিয়া সেইসকল বক্তৃতার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিতাম'।

তাঁর এই আগ্রহ ক্রমে তীব্র হয়। কেবলমাত্র সংস্কারবিমুক্ত মননের অধিকারী হ'লেই চলবে না, সেই সঙ্গে একান্তভাবে প্রয়োজন জ্ঞানের নানা শাখায় সাবলীল বিচরণ, বিজ্ঞানের সমুদ্রে স্বচ্ছন্দ অবগাহন। তারই ফলশ্রুতিতে মন হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক মেজাজে পুষ্ট—যা সত্যদিদৃক্ষায় অপরিহার্য। স্বামী অভেদানন্দের জীবন-কাহিনীতে[৭] এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য ন্যায় ও দর্শন পড়িবার বাসনা আমার অত্যন্ত বলবতী হয়। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন-এ ডাঃ মহেন্দ্রলাল

৬ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা (১৯৬৪), পৃ ১৬

৭ ঐ, পৃষ্ঠা ৯২

সরকারের বক্তৃতা শুনিতে যান জানিতে পারিয়া আমিও কাশীপুর হইতে পদব্রজে বৌবাজারে তথায় কয়েকবার গিয়াছিলাম। অবশ্য বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পড়িবার ইচ্ছা আমার পূর্ণ হইয়াছিল। আমি পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। ক্রমে ক্রমে গ্যানোর পদার্থবিদ্যা, হার্সেলের জ্যোতির্বিজ্ঞান, জন স্টুয়ার্ট মিলের তর্কশাস্ত্র, ধর্মের বক্তৃতাবলী, লুইসের দর্শনের ইতিহাস, হ্যামিল্টনের দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ সম্যক্ আয়ত্ত করিলাম'।

স্বামী অভেদানন্দের অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর গুরুকে নানাভাবে দেখেছেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর স্মৃতিকথায়[৮] আছে,

'ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেকটি শাখা, গ্রীক ও য়ুরোপীয় দর্শনের খুঁটিনাটি, তুলনামূলক মনোবিজ্ঞান, ধর্ম ও বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, কাব্য, নাটক ও ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্প, উভয় দেশের তুলনামূলক সাংগীতিক বিজ্ঞান, উদ্ভিজ্জ-বিজ্ঞান, প্রাণিতত্ত্ব, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি ছাড়াও জানতেন তিনি কৃষিবিজ্ঞান ও হাতে-নাতে কৃষিকাজ, দর্জির ও কাঠের কাজ, বাড়ীঘর তৈরী করার নিয়মনীতি ও কাজ, রান্নার কাজ প্রভৃতি……'

গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দের মতো তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন, চাই বিজ্ঞানের প্রসার। এদেশে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, বিশেষতঃ যন্ত্রবিজ্ঞানের বহুল চর্চা না হ'লে উন্নতির দ্বার রুদ্ধ। তাই আমেরিকার 'ব্রুক্লিন ইনস্টিটিউট অব আর্টস্ অ্যাণ্ড সায়েন্সেস্'-এ 'এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ভাষণ দেবার সময় তিনি বলেছিলেন[৯],

৮ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : মন ও মানুষ, পৃ ২১

৯ 'India needs to-day free education, and free industrial and technical schools and colleges for the masses,...India needs. A national university where boys and girls will receive secular education free of charge, and where all technical and manual training can be obtained freely.'

—Swami Abhedananda ; '*India and Her People*', (The Vedanta Society, N.Y. 1906), p. 213-214

> 'ভারতবর্ষের জনসাধারণকে উন্নত করতে হ'লে প্রয়োজন বিনা বেতনে শিক্ষাব্যবস্থা। চাই অবৈতনিক শ্রমশিল্প ও কারিগরি বিদ্যালয় ও কলেজ।
> ...ভারতের প্রয়োজন একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিনা ব্যয়ে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সব রকমের শ্রমশিল্প, কারিগরি বিদ্যা লাভের সুযোগ পাবে'।

ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ বর্তমান একথা দীর্ঘকাল ধ'রে প্রচারিত। অথচ সত্যিই তেমন বিরোধ বর্তমান নয় এবং ভবিষ্যতে উভয়ের সম্মিলন হবার সম্ভাবনা প্রোজ্জ্বল এ ভবিষ্যদ্বাণী যেমন স্বামী বিবেকানন্দ করেছেন, তেমনি করেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা অভেদানন্দ। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধ'রে তিনি প্রতীচ্যে যে দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন তার মূলে ছিল অভেদানন্দের বৈজ্ঞানিক মেজাজ, যেহেতু বিজ্ঞানাশ্রয়ী পাশ্চাত্ত্যে অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি উপেক্ষিত ও উপহসিত।

ধর্মের নানা কুসংস্কার তিনি ছিন্ন করেছেন যুক্তি-তর্কের সাহায্যে, যোগ-সাধনার প্রতিটি স্তরকে তিনি বিজ্ঞানের শুভ্র আলোকে বিশ্লেষণ ক'রে তাকে গ্রহণযোগ্য ক'রে তুলেছেন শিক্ষিত মানুষের কাছে।

বিজ্ঞানীর মন নিরাসক্ত। যিনি যোগসাধক তাঁকেও নিরাসক্ত চিত্তে এগোতে হয় পথ বেয়ে। বিজ্ঞানী কোন কিছুতেই 'আশ্চর্য' হন না। অভেদানন্দের সমগ্র জীবন নিরাসক্তিতে পূর্ণ। বহু সময়ে নানা প্রসঙ্গে তাঁর এই বিশেষ ধর্ম প্রকাশিত। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার দেখে যেখানে অধিকাংশ মানুষ বিস্মিত, বিমূঢ়, সেখানে অভেদানন্দের কণ্ঠে বিজ্ঞানীসুলভ নিরাসক্তি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন,[১০]

> 'কতশত আবিষ্কার বার হয়েছে, ভবিষ্যতেও বার হবে, সবই বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু আসলে আশ্চর্যের বিষয় কোনটাই নয়। আমরা জানি না বলেই সেটাকে অলৌকিক ও বিস্ময়কর বলি। আধুনিক বিজ্ঞান 'অলৌকিক'-কে লৌকিক ব'লে প্রমাণ করেছে। আজ যা জানি না, বা আজ যাকে অলৌকিক বলে মনে করি, কাল বা ভবিষ্যতে সেটাই আবার আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে এসে পৌঁছবে। বিরাট প্রকৃতির বুকে এ'রকম কত শত রহস্য আছে, যে'গুলো আজ প্রকাশিত নয়, কাল হয়তো সর্বসাধারণের

---

১০ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : মন ও মানুষ, পৃ ১৮১—১৮২

সামনে প্রকাশ পাবে। সুদূর ভবিষ্যৎকে করবে বর্তমান, অসীমকে করবে সসীম, নূতন ও অজানাকে করবে পুরাতন ও জ্ঞানের বিষয়'।

বিজ্ঞানী সত্যের অনুসন্ধানী। দর্শন ও প্রকৃত ধর্মের বক্তব্য একই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ধর্মের উদ্দেশ্য যেমন 'একক' উপস্থিত হওয়া, তাকে উপলব্ধি করা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও তাই। বিজ্ঞানীপ্রবর আর্নস্ট হেকেল বলেছেন, 'খাঁটি (বিশুদ্ধ) বিজ্ঞানের প্রতিটি কার্যকলাপ হচ্ছে সত্যকে জানবার প্রচেষ্টা' (Every effort of genuine science makes for a knowledge of Truth)।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর জীবনে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের সার্থক সমন্বয়সাধন করতে পেরেছিলেন বলেই বলতে পেরেছেন, 'সকল প্রকার দর্শন, সমস্ত বিজ্ঞান এবং সর্বরকমের ধর্ম আর কিছুই নয়, এ'সব হচ্ছে সত্যকে উপলব্ধি করা বা চিরন্তন সত্যকে জানার জন্য মানবমনের নানা পন্থা মাত্র'।
[All philosophies, all sciences, all religions, are nothing but so many attempts of the human mind to realize the Truth, to know the Eternal Truth.]

বিজ্ঞান কুসংস্কারের তমিস্রা বিদীর্ণ ক'রে সত্যসুন্দরকে প্রকাশিত করে। অধ্যাপক হাক্সলি বলেছেন, 'প্রকৃত বিজ্ঞান' মানুষকে ধর্মের ছদ্মবেশে আবৃত ভেজাল বিজ্ঞানের বোঝা থেকে বিমুক্ত করে।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বেদান্ত এবং আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মে, মেজাজে ও উদ্দেশ্যগতভাবে এক। উভয়ই আধ্যাত্মিক অনুশাসন। এমন কি পার্থিব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে উভয় মতবাদের সাদৃশ্য বর্তমান।

তেমনি অভেদানন্দ। স্বীয় প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত অভেদানন্দ এক ধর্মসংঘের নায়ক হয়েও বিজ্ঞানকে জারিত করেছেন আপন রসে। বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগে প্রোজ্জ্বল অভেদানন্দ বিজ্ঞান-সম্পর্কে এক মহতী বাণী উচ্চারণ করেছেন। এই বক্তব্য সনাতন সত্যরূপে বিরাজ করবে। তিনি বলেছেন,[১১]

---

১১ 'Science is trying to discover the eternal truth of the universe and religion is trying to worship that eternal truth, but that worship of the eternal truth must depend upon its discovery. If we do not know the eternal truth,

'বিজ্ঞান বিশ্বের চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করতে প্রচেষ্টিত। ধর্ম সেই চিরন্তন সত্যকে উপাসনার কাজে প্রবৃত্ত। কিন্তু সত্য আবিষ্কৃত না হ'লে তাকে পূজা করা সম্ভব নয়। যদি আমরা চিরন্তন সত্যকে না জানি, আমরা কি ক'রে তার উপাসনা করতে পারি? আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বোত্তম সিদ্ধান্তসমূহের সংগে যাদের মিল নেই, সেই সমস্তই আমাদের দূরে ঠেলে দিতে হবে'।

একথা তিনিই বলতে পারেন যিনি বিজ্ঞানের মহাজলধিতে অবগাহন ক'রে পরিতৃপ্ত এবং নিজের অনুভূতির জারকে সেই 'ধ্যান-ধারণাকে' সিক্ত ক'রে রচনা করেছেন অভিনব আচমন-মন্ত্র, যেখানে ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর মৈত্রীতে আবদ্ধ। দর্শন রচনা করেছে সংযোগ-সেতু, সেতুবন্ধ। এই অবিরোধের, এই সহাবস্থানের ফলশ্রুতিতে দৃষ্টির অগ্রাহ্য সুদূর পথরেখা আলোকিত। এ আলোকের রশ্মি দেখিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নতুন পথ বেয়ে অগ্রসর হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ। তাঁরা সৃজন করেছেন দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের নতুন ঋক্-মন্ত্র।

how can we worship it? We must put everything aside which is not in harmony with the highest conclusions of modern science."—*Religion of the Twentieth Country* (3rd ed.), p. 28

দুই

॥ ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

একটি বহুবিতর্কিত প্রশ্ন—দর্শন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? এই ত্রয়ীর মধ্যে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের সংগে অপর দুটির অহি-নকুল সম্বন্ধের কথা সুপ্রচলিত। প্রকৃত সম্পর্ক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় অতীত কাল থেকেই মনীষীরা যত্নবান্। অনেক দার্শনিক বা ধর্মপ্রবক্তা আছেন যাঁরা বিজ্ঞান থেকে যোজন দূরে থাকতে অভিলাষী। তেমনি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁদের কাছে ধর্ম বা দর্শন অবাস্তব বলেই পরিত্যাজ্য। এক সময়ে এমন অবস্থা ছিল যখন ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের সংগে বিজ্ঞান, অংগাংগিভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু এই প্রীতির সম্পর্ক থাকে নি। অনুদারতার মলিন পরিবেশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তিনটি শাখা। একথা নিঃসন্দেহ যে তিনটিই এক নয়, যেহেতু তিনেরই স্বতন্ত্র বক্তব্য থাকা যুক্তিসংগত এবং তা আছেও। কিন্তু যে বিদ্বেষের অশুভ প্রচ্ছায়াতে এ বিরোধ স্নিগ্ধতার সীমা অতিক্রম ক'রে কলরব তুলেছে, তার মূলে আমাদের অনুভূতির সীমায়িত রেশ, আমাদের জ্ঞানের পরিসীমিত বিস্তৃতি ও 'সত্যবোধ'-সম্পর্কিত ন্যূনতম শিথিল ধারণা। তথাপি কি এদেশের, কি পাশ্চাত্ত্যের, অনেক স্থিতপ্রজ্ঞ মনীষী এই বিরোধকে মনে করেছেন 'আপাত'। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন তিনের মধ্যেকার সন্দেহের ঊর্ণনাভ অজ্ঞানতাপ্রসূত। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী অভেদানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই তিনের মূল্যবোধ।

প্রশ্ন উঠবে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কি? এ নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর সমগ্র জীবনে বহু চিন্তা করেছেন, বিশ্লিষ্ট ক'রে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মকে। তাঁর সুগভীর চিন্তার প্রতিফলন তাঁর রচনার সর্বত্র। এ বিষয়ে কখনো বা তিনি পূর্বসূরীদের সংগে সামঞ্জস্যবিশিষ্ট, কখনো বা একক বিহারী।

বিজ্ঞানের চরম কর্তব্য সত্যের অনুসন্ধান। দর্শনের সার কথাও তাই। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে প্রভেদের কথা 'এলিমেণ্টস্ অব মেটাফিজিকস্' গ্রন্থে উল্লেখ ক'রে অধ্যাপক এ ই. টেলর (Prof. A. E. Taylor) বলেছেন, যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞান আর অনুসন্ধান চালাতে অপারগ তখনই মন ও দর্শন কাজ আরম্ভ করে। দর্শনের 'ডেটা' কতগুলি নির্দিষ্ট ঘটনা নয়, যা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সংগ্রহ করা যায়।

দর্শন কি করে ? বিজ্ঞান যে'সব প্রকল্পকে ব্যবহার করে, দর্শন সেই সব প্রকল্পকে পরীক্ষা করে, কিন্তু এই প্রকল্পসমূহ থেকে নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনের আশায় নয় বা সুপ্রাচীন কোন ধারণাকে আধুনিকীকরণের জন্য নয়। তার কাজ হ'লো সেই সব প্রকল্পের চরম বাস্তব অস্তিত্বের মূল্যায়ন করা। বিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে 'বুদ্ধিমান অনুসন্ধিৎসা'। তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে —তা হ'লো ঘটনাসমূহের মধ্যে ঐক্যের ছন্দ আবিষ্কার করা। কিন্তু তারও সীমা নির্দিষ্ট। ঘটনাসমূহের ফলাফলের বৃহত্তর ইঙ্গিত সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসা বিজ্ঞানের নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—প্রাণিতত্ত্ববিদ বিভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তুর বিবর্তনের প্রকৃত ইতিহাস সন্ধান করেন। তিনি স্তন্যপায়ীদের পেডিগ্রী (বংশতালিকা) আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু তাঁর কাজ এখানেই সমাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর অনুসন্ধান করা কর্তব্য কোন্ কোন্ উপাদান বা হেতু বিবর্তনক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল হয়েছে।

যাঁরা জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করেন, তাঁরা তাঁদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সহজ-বোধ্য ঘটনাসমূহকে আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান এই জগতের উপাদানসমূহের কথা জেনেছে এবং জ্ঞাত করেছে মানুষকে। বিজ্ঞান বলেছে, এই বিশাল পৃথিবী গঠিত হয়েছে পদার্থের সাহায্যে। অণু দিয়ে তৈরী হয়েছে পদার্থ। আবার, পরমাণুর সমষ্টিতে জন্ম নিয়েছে অণু। এই পরমাণু আবার ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন ইত্যাদি অধিকতর ক্ষুদ্রাকৃতি কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। বিজ্ঞান এ'সবের হদিস পেয়েছে। সে বলে, সমগ্র পৃথিবীতে এক শক্তির অধিষ্ঠান। বিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম 'এনার্জি'। এর পরিমাপক হচ্ছে 'বল' (force)। বিজ্ঞান বলে পদার্থ ও শক্তির সহযোগিতায় বিশ্ব সৃষ্টি সম্ভব।

দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হব্স্ বলেছেন : 'a knowledge of effects from their causes and causes from their effects'। দার্শনিকরা চা

সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীর প্যাটার্ন আবিষ্কৃত হোক, আর বিজ্ঞানীরা চান অচেতন প্রকৃতির ঘটনাবলীর রহস্য উন্মোচিত হোক। হেগেল স্বতন্ত্র কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : 'die denkende Betrachtung der Gegenstande', অর্থাৎ চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে ঘটনার অনুসন্ধান করা দর্শনের কাজ। এ প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্য উচ্চার্য, বিজ্ঞান অধুনা কেবলমাত্র অচেতন পৃথিবীর প্রকৃতির রহস্য জানতেই প্রয়াসী নয়, তার দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধানে সে ব্রতী।

যদিও একথা বলা হয়েছে যে, দর্শন কার্য ও কারণের মধ্যে সেতু রচনা করে, তথাপি তা বিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র পর্যায়ের। পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বিজ্ঞান নির্ণয় করে কার্য ও কারণের সম্বন্ধ। J. G. Crowther বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলেছেন[১],

> Science is the system of behaviour by which man acquires mastery of his environment. His evolution from an animal into a man was accomplished by a new attitude towards nature, in which he began to study the contents of his environment in order to use them to his advantage. His initiation of his activity brought science into existence...

যদি একথা স্বীকার ক'রে নেওয়াও যায় যে প্রতিবেশের উপরে আধিপত্য স্থাপনের জন্যেই বিজ্ঞানের উদ্ভব, তাহলে, সমাজও বিজ্ঞানের বিবর্তনে পরস্পরের অনিবার্য প্রভাব অনস্বীকার্য। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিজ্ঞান এবং এই প্রয়োজন মেটাতে পারলেই সার্থকতা। সমাজের প্রয়োজনে বিজ্ঞান একথা এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী স্বীকার করেন না। এডিংটন, হোয়াইটহেড্, বিশপ অব্ বার্মিংহাম প্রভৃতি মনীষী মনে করেন, বিজ্ঞান বিশুদ্ধ মননশীলতার প্রকাশমাত্র। ফলিত বিজ্ঞানকে তাঁরা বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল (J. D. Bernal) তাঁর এক গ্রন্থে এই মতের সমালোচনা ক'রে বলেছেন : ব্রহ্মাণ্ড, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-রহস্য, প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণা যদি বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য হ'তো, তাহলে আজ যাকে বিজ্ঞান বলি তার অস্তিত্ব থাকত না। তা হয়তো কোনদিনই উদ্ভূত হতো না। মানুষের পার্থিব

১ J. G. Crowther : *The Social Relations of Science* (Macmillan, 1941).

প্রয়োজনের প্রেরণাতেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ হয়েছে। কিন্তু একথাও সর্বাংশে সত্য নয়।

তাই আমরা বুঝতে পারছি যে, মানুষের অন্তরাত্মার দু'টি স্বাভাবিক প্রেরণার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান। এ'কারণেই বিজ্ঞানের ধারা দু'টি—ব্যবহারিক ও দার্শনিক। প্রথমটির লক্ষ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুখ, সুবিধা, সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ ক'রে তোলা। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য এই বিশাল বহির্জগতের বৈচিত্র্য ও নানা জটিলতার মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সরল নিয়মের আবিষ্কার করা এবং তার ফলে সৃষ্টিরহস্যের সমাধানে প্রবৃত্ত হওয়া। এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী বলেন এইটেই হলো বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হচ্ছে, তার ব্যবহারিক ধারাও তত প্রসারিত হচ্ছে। যেহেতু মানুষের যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় নিহিত রয়েছে সত্যের পথে ও প্রতিষ্ঠায়।

বিজ্ঞান, দর্শন এবং ধর্ম সকলেই সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত। সত্যের সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিতর্ক চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও এতে যোগ দিয়েছেন। 'সৎ' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে 'সত্য'। সৎ + স্ত্য অর্থাৎ সৎ-এর প্রকাশ হ'লো সত্য। দার্শনিকেরা বলেন শুধু যা আছে তা-ই কেবলমাত্র সৎ এবং সত্য একথা বলা অনুচিত। এখন যা আছে, তা পরে থাকবে কি না এবং অতীতে ছিল কিনা, তার নির্ভুল উত্তরের উপরেই নির্ভর করে সত্যাসত্যের নির্ধারণ। দার্শনিকেরা সত্যকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক।

এর থেকে স্বতই প্রশ্ন উঠবে, এমন কি কোন সত্য বস্তু থাকতে পারে যা শাশ্বত, যা সনাতন, যা সার্বভৌমিক। বিজ্ঞানের সত্য তা হতে পারে না। বিজ্ঞানের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রত্যক্ষ বা যন্ত্রযোগে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর। এবং একথা অনস্বীকার্য যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি দেশ ও কালের সীমানায় নির্দিষ্ট। যুগে যুগে বিজ্ঞানের সত্যের রূপ পরিবর্তিত হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নতুন পরীক্ষার ফলে পরিত্যক্ত হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে এমন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। একারণেই বিজ্ঞানের জগতে 'চরম বা পরম সত্য' বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য আপেক্ষিক। আজ বিজ্ঞানীরা সামগ্রিক বা সনাতন চরম সত্যকে

সন্ধান করতে তৎপর হচ্ছেন সত্য, তথাপি তাঁরা একথা স্বীকারে অকুণ্ঠিত যে, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির সাহায্যে বা বিচার-প্রণালীতে পারমার্থিক সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের সত্য পরিবর্তনশীল। তাই বিনা প্রমাণে কেন, কোন কারণেই বিজ্ঞান কোন সত্যকে ধ্রুব সত্য বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানে 'পরম-সত্যের' স্থান নেই।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন,[২] 'বিজ্ঞান আমাদের সত্যোপলব্ধির প্রায় দোর-গোড়ায় এনে দিয়েছে। প্রবেশ কর ; দেশ ও কালের ওপারে যে সত্য আছে তাকে দেখতে পাবে'। এই সত্য কোন সম্প্রদায়ের উপলব্ধিজাত মাত্র নয় ; অর্থাৎ সম্প্রদায়গত সত্যকে আমরা চাই না। আমরা প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানী।

অভেদানন্দ বলেছেন, 'বিজ্ঞানের চিন্তাবিদেরা মনে করেন জীবনের আদর্শ বা পরমার্থ হওয়া উচিত 'সত্য' সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তাঁরা শ্রেণীগত সত্যের কথা মনে করেন না। তাঁরা অন্ত্যকে জানতে চান, সব-কিছুর উৎস জানতে চান। একারণেই বিজ্ঞান-চিন্তাবিদেরা মনে করেন সত্যানুসন্ধান সীমাবদ্ধ বিষয় নয়, সত্যকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে পাওয়া যায় না। উপরন্তু বিজ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-সম্পর্কে যাবতীয় ধর্মীয় মতবাদকে এবং গোষ্ঠীগত ধারণার মূলে আঘাত হেনেছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির রাজ্যে অবলীলাক্রমে অনুপ্রবেশ ক'রে অনেক সত্য আবিষ্কার করেছে, যে সত্যসমূহ প্রাচীনকালের ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বিজ্ঞানের বক্তব্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইহেতু যাবতীয় অন্ধবিশ্বাসকে সে খারিজ ক'রে দিয়েছে'। অভেদানন্দের নিজের ভাষায়[৩]—

'Scientific thinkers say the knowledge of Truth is the ideal of life, but by Truth they do not mean sectarian truth ; they want to know the ultimate cause, the reality of the source. The search after Truth, according to the scientific thinkers, cannot be limited...Science has made free invasion

২ 'Science has brought it almost to the gate of the Reality or Truth ; go through, and you will find the Truth that is beyond time and space.'—'*Path of Realization*' (2nd Edn). p. 15

৩ 'Search After Truth',—*Path of Realization* by (Swami Abhedananda) (2nd Edn.) p. 5

into the domain of nature and has discovered many truths, which were truths unknown to the writers of the socalled revealed scriptures of the world. It has taken its stand upon reason, and has rejected all that is blind faith'.

বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ, যুক্তি ও ঘটনার সাহায্যে কোন কিছু আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। অনেকে মনে করেন, ধর্ম বিজ্ঞান থেকে জটিলতর, যেহেতু বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্মকে বিচার করা যায় না। একারণেই আবার বিজ্ঞানীরা ধর্মকে অবাস্তব বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিচার পক্ষপাতমূলক। এ' বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ সুন্দর কথা বলেছেন।

'পদার্থবিজ্ঞানীদের খুশি করবার ইচ্ছা যেমনি অবাস্তব তেমনি অযৌক্তিক। পদার্থবিজ্ঞানীদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্ব জগৎ আছে। তাঁদের জগতে যেসব পরীক্ষা কার্যকর, সেইসব পরীক্ষাকার্য পৃথক পর্যায়ের ঘটনাবলীর অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োগ করা যেমনি ভ্রান্তিজনক, ঠিক তেমনি এই পরীক্ষাকার্য আধ্যাত্মিক সত্য নিরূপণের জন্য প্রয়োগ করাও একই ধরণের ভ্রমাত্মক। কেউ ঈশ্বরকে ব্যবচ্ছেদ করতে পারে না, অথবা আত্মাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে পারে না'।[৪]

বৈজ্ঞানিক মন কোন ঘটনাকেই শ্রেণীবদ্ধ না ক'রে পারে না। বিজ্ঞানীরা পার্থিব বস্তুর সঙ্গে এত সম্পর্কযুক্ত এবং যেসব বস্তুর সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠ যেগুলি যন্ত্রপাতি দিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে এমন একটি মেজাজের অধিকারী হয়েছেন, যার ফলে তাঁদের ধ্যান-ধারণার সাহায্যে অন্য প্রদেশের সত্যকে উপলব্ধি করা শক্ত হয়ে ওঠে। এই ধারণা শ্রীঅরবিন্দের ভাষণে পরিস্ফুট। ভারত-প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনা ক'রে আমরা অভেদানন্দের বক্তব্যের দ্বারদেশে আবার হাজির হবো। ভারত কেবলমাত্র বিভিন্ন ভাষাভাষী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলনভূমি নয়, এখানে এক অতি মহান আত্মার বাসস্থান। ভারতের আত্মার বাণী কেবল-

৪ 'The desire to satisfy the physical scientists is absurd and illogical. The physical scientists have their own field with its own instruments and standards. To apply the same tests to phenomena of a different kind is as foolish as to apply physical tests to spiritual truth. One can't, dissect God or see the soul under a microscope'—Sri Aurobindo : *On Yoga*, II, Tome one p. 219.

মাত্র শব্দের আড়ম্বর নয়, এর মূল অতি গভীরে প্রোথিত, দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ কর্মে, জীবনযাপনের বিচিত্র পন্থায় এই মর্মবাণী প্রকাশিত। ভারতের সামাজিক নীতি, তার ধর্ম, অনুশাসন সমস্তই জীবনের আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই কোন্ প্রাচীন কাল থেকে ভারত-আত্মার এই বাণী বহন করে নিয়ে আসছেন সন্ন্যাসী, দূরদ্রষ্টা, কবি ও দার্শনিকের দল। জড় দর্শন সম্পর্কে তাঁদের অসীম কৌতূহল এনে দিয়েছে জীবন সম্বন্ধে নতুন বোধ। শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে বলেছেন,

> 'Her (India's) religion is an aspiration to the spiritual consciousness and its fruits ; her art and literature have the same upward look ; her whole 'dharma' or law of being is founded upon it. Progress she admits, but this spiritual progress, not the externally self-unfolding process of an always more and more prosperous and efficient-material civilisation. It is her founding of life upon this exalted conception and her urge towards the spiritual and the eternal that constitute the distinct value of her civilisation.' (Sri Aurobindo : *Is India Civilised ?*)

সাংস্কৃতিক প্রগতি-তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবাহ ভারতবর্ষে কখনো থেমে থাকে নি। জীবন বয়ে চলেছে এবং সেই প্রাণপঙ্ক বা 'e'lan vital' যা বিবর্তনের স্তর বেয়ে আরো অনেক উন্নতির পথে যেতে পারে, যার আরো অনেক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে, তার গতি স্তব্ধ হয় নি। ভারত কখনো তার নাড়ীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত অধ্যাত্মজীবনকে অস্বীকার করতে পারে নি। স্বামী অভেদানন্দের অধ্যাত্মজীবন প্রতিটি মানুষের কাছে উন্মুক্ত ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, যে ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে তার 'ধর্ম' জড়ানো রয়েছে হাজার-বাঁধনে। স্বামী অভেদানন্দের রচিত 'হিন্দু ফিলজফি ইন ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধের সমালোচনা করতে গিয়ে মনীষী C. E. M. Joad উল্লেখ করেছিলেন,

> 'What strikes me most forcibly about these modern exponents of the secular tradition of Indian Philosophy is their unanimity. It is not merely that they all accept the same

tradition : broadly speaking, they all subscribe to the same philosophical truth. What is this truth ? The clearest exposition of it is perhaps that contained in the contribution of Swami Abhedananda, the President of the Ramakrishna Vedanta Society in Calcutta.'

প্রকৃত সত্যকে জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। কেমন ক'রে বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়, কোন নীতি বা ধারা অনুসরণ ক'রে পার্থিব বিষয়ের অনুভূতি লাভ করা যায় তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, 'জ্ঞান বা জানা বলতে বোঝায় প্রত্যাভিজ্ঞান বা পুনরায় জানা'। 'মানুষ কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে' জ্ঞানলাভ করে, কারণ—তার আন্তর চেতনা ঐ বিষয়-চৈতন্যের সংগে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে। তথাপি বক্তব্য বর্তমান।

এই বিংশ শতাব্দীকে বিজ্ঞান এবং যুক্তির যুগ বলা যেতে পারে। এই যুগে সব কিছুই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তির সাহায্যে বিচার করে যখন কোন বিষয় আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি তখন তাকে 'সত্য' বলেই ভাবি। আধুনিককালে বিজ্ঞান আমাদের যাবতীয় চিন্তা, যুক্তির উপরে খবরদারি করছে। তার ফলে আমাদের মধ্যে এক বিশেষ প্রবণতা জেগেছে যে কোন প্রাকৃতিক বা মানসিক ঘটনাবলীকে বিজ্ঞানের প্রচলিত সূত্র বা তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহকেও বিজ্ঞানের সত্য দিয়ে বিচার করতে চেষ্টা করি। এর ফলে এমনটি হয়েছে যা বিজ্ঞান অনুমোদন করে না, আমরা সেগুলি হয়তো বিনা দ্বিধায় বর্জন করতে পারি। প্রতিদিনই বিজ্ঞান আমাদের পুরোনো চিন্তাধারার পরিবর্তন এনে নতুন অভ্যাসে রত হতে নির্দেশনামা জারি করছে। পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের বাসভবনের নক্সা, পাল্টে যাচ্ছে আমাদের সমাজ।

অভেদানন্দ বিশ্বাস করেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা আমাদের চোখের সামনে বিশ্বের অজ্ঞাত জগতে প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে আমরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্ব, সুষমা ও পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারি। অভেদানন্দ বলেন, বিজ্ঞান আমাদের কাছে প্রকৃতির গভীর রহস্য উদ্ঘাটিত করেছে, অনুসন্ধিৎসুকে সত্যের দিকে নিয়ে

গেছে একটু একটু ক'রে। ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অণু-পরমাণুর জগত পরিচালিত হয় যে শক্তির সাহায্যে সেই শক্তির জগতে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বর্তমান যুগে আমাদের মনের দিগন্তে এনে দিয়েছে নতুন জ্ঞানের আলো। তার সাহায্যে আমরা অতীত যুগের চিন্তাবিদ্‌দের অনধিগম্য জগতে প্রবেশ করতে পারি। বিজ্ঞান প্রকৃতির নানা শক্তির কথা বলেছে—যেমন তড়িৎ শক্তি, তাপশক্তি, আলোকশক্তি, গতিশক্তি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি। অভেদানন্দের মতে এ সবগুলিই হচ্ছে শাশ্বত মহাজাগতিক শক্তির নানা রূপ মাত্র (...so many manifestations of one eternal cosmic Energy)

একথা সত্যি আধুনিক বিজ্ঞান 'বিশেষ সৃষ্টির তত্ত্ব' (theory of a special creation) ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছে, এবং প্রমাণ করেছে যে সৃষ্টি একদিনের ঘটনামাত্র নয়। আজকের অবস্থায় আসতে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রশংসায় মুখর স্বামী অভেদানন্দ ভূতত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন, ভূতাত্ত্বিক গবেষণা আমাদের বাইবেলীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেছে। অর্থাৎ যেখানেই কুসংস্কার, সেখানেই মন দ্বিধাগ্রস্ত, জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অভেদানন্দ তারই বিরুদ্ধে। তাঁর কথায়—[৫]

> 'The geological researches of this century have shown that the first appearance of man on earth was not six thousand years ago, as the Christian Bible teaches, but in the Tertiary period which goes way back beyond 50,000 or 100,000 years from today.'

ধর্মের কুসংস্কার বা সৃষ্টি সম্পর্কিত নানা অন্ধ ধারণা মানুষকে ক'রে ফেলে বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তি মুক্ত না হ'লে সত্যদর্শন অসম্ভব। তাই বিজ্ঞানে চির-আস্থাশীল স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন সানন্দে,[৬]

> 'Biology has disproved the old theory that God breathed life into the nostrils of the first man before he became a

৫ Swami Abhedananda : *Religion of the Twentieth Century.*

৬ ঐ

living animal, as if the lower animals had no breath of life at all ; on the contrary, it has proved that the minutest protoplasm or bioplasm or amoeba possesses life.'

শুধু তাই নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শাশ্বত জীবন প্রবাহে আন্দোলিত। বলা যেতে পারে যাবতীয় দর্শনীয়, অদর্শনীয় স্থান-বস্তু সমেত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রাণশক্তিতে (vital energy) পরিপূর্ণ। তিনি বলেন, এমন কোন বস্তু নেই যা মৃত, জীবনহীন। মানুষের জীবন কোন অতিপ্রাকৃতি বা দৈবিক অনুশাসনের ফলে উদ্‌জাত নয়, বরং উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্রতর জীবজন্তুরা যেমনি ভাবে জন্মগ্রহণ করেছে, মানুষও তেমনি ভাবেই জন্ম নিয়েছে।

মনের ভাব জানতে পারার বিদ্যা বা টেলিপ্যাথী প্রমাণ করেছে—প্রতিটি মন প্রতিটি মনের সংগে জড়িত। তারা যেন সেই 'মহাজাগতিক মনের' ভাব-তরংগের নানা ঢেউ মাত্র। অভেদানন্দ টেলিপ্যাথীকে বিজ্ঞান বলেছেন। এ' সম্বন্ধে বিজ্ঞানীপ্রবর সার জুলিয়ান হাক্সলি বলেছেন[৭],

'There are certain other domains of Reality which have not yet been properly investigated by science. Telepathy, for instance, and the whole mass of phenomenon included broadly under the term spiritualism, are in about the same position with regard to organized scientific thought today as was astronomy before astrology's collapse.'...

অভেদানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, আমরা বর্তমানে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ে বাস করছি। এই যুগে নানা যুগান্তকারী আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানের প্রতিটি ভাণ্ডারকে ক'রে তুলেছে স্ফীত। প্রতিদিনই আমরা নতুন নতুন চিন্তাধারার সংগে পরিচিত হচ্ছি। অজ্ঞানতার অন্ধকার ক্রমেই অপনোদিত হচ্ছে এবং বহু যুগের কুসংস্কার যে চিরন্তন সত্যের জ্ঞানসূর্যকে আবৃত ক'রে রেখেছিল তার মুক্তি হ'লো। সত্য প্রকাশিত হলো। মহাকাশে যেখানে আমাদের দৃষ্টি হয়ে যায় অতি সীমিত, অথবা আমাদের দৃষ্টির খুব সামনে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে সবকিছুর সম্বন্ধেই অনেক জানা হয়ে গেছে বিজ্ঞানের দৌলতে। প্রকৃতির নিয়মাবলী আরও ভালভাবে জানা হয়েছে, যে সব ধারণা কুসংস্কারের

৭ T. Huxley : *Religion and Science* : Essays of a Biologist.

অক্টোপাশ বাঁধনে জড়িয়ে ছিল তার মুক্তি ঘটেছে। এই যুগকে 'বিজ্ঞানের যুগ' বলা যেতে পারে। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ভাষণে বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এমন একটি উক্তি করেছেন যা চিরদিন তাঁকে বৈজ্ঞানিক মেজাজসম্পন্ন সন্ন্যাসী-দার্শনিকদের ইতিহাসে ভাস্বর করে রাখবে। বিজ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে তিনি বলেছেন[৮],

'Science today dominates human thought, human reason and all human activities, physical and mental. Art, literature, cooking, walking, dressing, everything must now be in harmony with science. Science stands today triumphant in her own glory because she stands on the adamantine rock of truth. She is dressed in the multiform colors of the light of truth, her food is truth, and truth is her aim, her life and her soul. Wherever she goes she brings with her the light of truth, which dispels the darkness of ages. After exploring almost all the departments of nature, she has now begun to investigate the vast and mysterious domain of religion.'

বিজ্ঞান আজ মানুষের চিন্তা, যুক্তি ও যাবতীয় মানবিক কার্য—কি কায়িক, কি মানসিক, সব-কিছুর উপরেই প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে। কলা, সাহিত্য, রন্ধন, ভ্রমণ, বেশ বিন্যাস প্রভৃতি সবকিছুই এখন বিজ্ঞানের সংগে তাল রেখে চলে। বিজ্ঞান আজ তার নিজের গৌরবে মহিমান্বিত, বিজয়ী, যেহেতু তার অবস্থিতি সত্যের সুদৃঢ় পর্বতের উপর। তার অংগে সত্যের নানা বর্ণালোকে রঞ্জিত পরিচ্ছদ। তার আহার্য হ'লো সত্য, 'সত্য' তার ধ্রুব লক্ষ্য,—তার জীবন, তার আত্মা। যেখানেই সে যাক না কেন তার সংগে থাকবে সত্যের আলোক, যা দূর করে যুগযুগান্তের তমিস্রা। প্রকৃতির প্রায় প্রতিটি বিভাগে অভিযান চালিয়ে এখন সে ধর্মের বিশাল ও রহস্যময় প্রদেশের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে।' [অনূদিত]

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাপক ও প্রচণ্ড হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে জেগেছে জিজ্ঞাসার প্রবণতা, জেগেছে তর্ক বা যুক্তি দিয়ে ধর্মের

---

৮ *The Scientific Basis of Religion* : Vedanta Philosophy : p. 2

তত্ত্বসমূহকে যাচাই ক'রে নেবার প্রবৃত্তি। যিনি একবার বিজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞানকে যুক্তি বা তর্কের সাহায্য ছাড়া গ্রহণ করবেন না। বিজ্ঞানের ছাত্রের প্রাথমিক মানসিক অবস্থা হলো অস্থিরতা, জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ প্রকাশ করা। কোন কিছুকে গ্রহণ করার আগে তিনি যুক্তি ও প্রমাণসমূহকে যাচাই ক'রে দেখবেন। বিজ্ঞান আমাদের যোগায় কোন ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রুত কোন বক্তব্য বিনা বিচারে মেনে না নেবার প্রবৃত্তি, অথবা এই কথা গ্রন্থে লেখা আছে বা এই কথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিশ্বাস ক'রে গেছেন, অতএব আমাদের তা বিশ্বাস করতে হবে এমনি কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার প্রেরণা।

বিজ্ঞান আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ক'রে, পরিমাপ ক'রে, এবং তা যদি আমাদের যুক্তির অনুপন্থী হয় ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত অপরাপর 'সত্যের' সংগে সমতা সৃষ্টি ক'রে চলে তবে তাকে গ্রহণ করতে বলে।

অভেদানন্দ বলেছেন, পাশ্চাত্যে দুটি বিভিন্নমুখী বৈজ্ঞানিক মেজাজ গড়ে উঠেছে। তারা পরস্পরের প্রতি বিবদমান। একদল ধর্মকে অস্বীকার করেন, যেহেতু তাঁদের মতে ধর্ম আধুনিক বিজ্ঞানের সংগে সমন্বয় সাধন ক'রে চলে না, কারণ—তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অপর দল বলেন ধর্মের সংগে যুক্তি ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সম্ভবপর, ধর্মকে বিজ্ঞানের সূত্রাবলীর সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়।

যাঁরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সমন্বয় দেখতে পান না, তাঁরা ধর্মকে উপেক্ষা করেন যেহেতু তাঁদের মতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত 'সত্যের' মতো কোন 'সত্য' ধর্মের অনুশাসনে নেই। তাঁরা বলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য হলো সত্য অন্বেষণ করা এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা। কিন্তু ধর্ম তা পারে না, কারণ—'ধর্ম' প্রবক্তাদের অনেকে বলেন এই বিশ্বকে এবং বিশাল পুরুষ শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই ধর্মের সাহায্যে আমাদের কি লাভ হতে পারে? কিছুই না, বরং কতগুলি সংকীর্ণ মত আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে। অতএব ধর্মকে স্বীকার না ক'রে, বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা যুক্তিসংগত।

আবার এক ধরণের মানুষ আছেন যাঁরা ধর্মের সংগে বিজ্ঞানের মৈত্রী বন্ধন করতে চান। তাঁরা ধর্মশাস্ত্রের বক্তব্য সমূহকে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সাহায্যে

ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু ভাল ফল পাওয়া যায় নি। পাশ্চাত্যখণ্ডে এই বিসম্বাদ চলেছে দীর্ঘকাল ধরে।

মনীষী জন ফিস্কে (John Fiske) বলেছেন : 'Antagonism (between science and religion) has been chiefly due to the fact that the religious ideas until lately were allied with the doctrine of special creation.'

অধ্যাপক হাক্সলি বলেন,

'The antagonism of science is not to religion, but to the heathen survivals and bad philosophy under which religion herself is often well-nigh crushed. True science will continue to fulfil one of her most beneficent fuuct'ons, that of relieving men from the burden of false science which is imposed upon them in the name of religion.'

একই সংগে হার্বার্ট স্পেন্সারের বক্তব্যও উদ্ধৃতির যোগ্য। তিনি বলেছেন,

'The most abstract truth contained in religion, and the most abstract truth contained in science, must be the one in which the two coalesce. To reach that point of view from which the seeming discordance of religion and science disappears and the two merge into one, must cause a revolution of thought fruitful and beneficial in consequences, and must surely be worth an effort.'

অভেদানন্দ বলেছেন,

'...That abstract truth must not be a particular phase of truth discovered by a particular branch of science, or by a particular sect or creed, but it must be the one where all the various branches of science and philosophy end,—the truth which is the goal of all religions sects and creeds that exist upon the face of the earth. Truth discovered by science, cannot be different from truth discovered by religion,

because truth is one and the same. The same truth is the object of science, of philosophy, of metaphysics, and of religion. It can, therefore, be reached through any one of these.

চরম-সত্য বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট কোন শাখা কর্তৃক আবিষ্কৃত সত্যের কোন বিশে অবস্থা হতে পারে না, কিংবা কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া হতে পারে না। এই সত্য হচ্ছে সেই সত্য যা বিজ্ঞান ও দর্শনের শেষ কথা, পৃথিব সকল ধর্ম, সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মূল লক্ষ্য। ধর্ম যে সত্য আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের সত্য তার থেকে পৃথক নয়, যেহেতু সত্য এক ও অভিন্ন। যে সতে উপনীত হওয়া বিজ্ঞানের লক্ষ্য, তা দর্শনের, জড়-দর্শনের এবং ধর্মেরও অতএব যে কোন পথ ধরে ঐ সত্যে উপস্থিত হওয়া যায়।

বিজ্ঞান দাবী করে, বাস্তব বস্তু একটিই এবং তা থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে বৈচিত্র্যের মধ্যেই একত্ব বিরাজিত এবং এইটে প্রাকৃতিক নিয়ম। ক্রমবিবর্তনের তত্ত্ব, প্রাকৃতিক শক্তির (natural force অস্তিত্ব এবং বিভিন্ন 'শক্তি'-এর মধ্যে সম্বন্ধ পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে প্রাকৃতিক বিভিন্ন 'শক্তি'-সমূহ এক চিরন্তন শক্তিপ্রবাহের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র একইভাবে মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে আমাদের আন্তরপ্রকৃতিতে যে সব বিভি শক্তি ক্রিয়াশীল তা সেই এক চিরন্তন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বিজ্ঞা আমাদের বলে, একই প্রাণ থেকে সৃষ্ট হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতি। হার্বার্ট স্পেন্সা বলেন, 'বস্তু, গতি ও শক্তি বাস্তব নয়, তারা বাস্তবের সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র অভেদানন্দ বলেন, [৯]

'The same Reality expresses in the objective world as matte in the subjective world as mind ; in the objective world a gravitation, electricity, heat and motion, in the subjectiv world as intellect, understanding, emotion, will, etc. Th Reality is one, but the manifestations are diversified. Thu the ultimate conclusion of science is unity in variety.'

যদি কোন ধর্ম বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান দিতে পারে তাহলে বিজ্ঞান ধর্মের মধ্যে ঐক্য আসতে পারে, নচেৎ হবে না। এমন কি কোন ধর্মমত আ

---

৯ *Cf. The Scientific Basic of Religion.* p. 11

যার মধ্যে এই দু'য়ের মিলন সম্ভবপর ? স্বামী অভেদানন্দ অন্যান্য ধর্মমতের সংকীর্ণতা দেখিয়ে বেদ উপনিষদে বর্ণিত ধর্মমতের কথা প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, একমাত্র এই ধর্মমতেই বিজ্ঞান ও ধর্মের ঐক্য আছে। যেহেতু প্রাচীন ভারতের দূরদ্রষ্টা ঋষিরা অনৈসর্গিক কাণ্ডকারখানাতে আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানীদের মত প্রথমে পার্থিব বস্তু সত্তাকে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা ধর্মকে বিজ্ঞান, দর্শন বা যুক্তি থেকে পৃথক ভাবে দেখেন নি। কিন্তু যখন তাঁরা কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তখনই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যদি কোন ব্যাখ্যা অযৌক্তিক মনে হয়েছে তাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করেছেন এবং অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেটিও যদি অবৈজ্ঞানিক মনে হয়েছে তাহলে তাকেও তাঁরা অবিলম্বে ত্যাগ করেছেন। ফলে তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত সমূহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন সেই অতি প্রাচীনকালে। সত্য শাশ্বত। যিনিই আবিষ্কার করুন না কেন সত্যের হেরফের হয় না। ভারতীয় ঋষিরা যদিও মানবের ক্রমবিবর্তনের অর্থাৎ কেমন ক'রে মানুষ এলো তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেন নি, তথাপি তাঁদের কথিত দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মূল সূরটি হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপন। এবং তা বিজ্ঞানের সংগে ঐক্যবদ্ধ। প্রাচীনভারতীয় দ্রষ্টাদের এই দর্শন হ'লো বেদান্ত। অভেদানন্দ বলেন, বেদান্তের কোন বক্তব্যকে ব্যাখ্যা ক'রে তাকে বিজ্ঞানের সংগে মেলাবার প্রয়োজন নেই, কারণ বেদান্ত বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বকে বেদান্ত মেনে নিয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হতে পারে তাকেও। বেদান্তের মধ্যে সব-কিছুরই স্থান আছে যেহেতু বেদান্তের পরিসর অসীম।

বেদান্ত ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা বলে, যেহেতু বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছে বেদান্ত। অভেদানন্দ বলেন, যদি আমরা তর্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব দিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মমতকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি তাহলে বিস্ময়ের সংগে লক্ষ্য করবো সেই সব ধর্মমত বিজ্ঞানের যুক্তি সইতে না পেরে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। তার ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়ে ওঠে। কিন্তু হিন্দুধর্ম বিশেষতঃ বেদান্ত এমনই বস্তু যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা তো করাই চলে, পরন্তু এমন অনেক বক্তব্য আছে যা আগামী দিনের বিজ্ঞান হয়ত ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।

সত্য কি ? এ'সম্বন্ধে লিও এরেরা (Leo Errera) বলেছেন : 'Truth is a curve whose asymptote our spirit follows eternally.' দর্শন ও বিজ্ঞান এই একই সত্যের প্রতি ধাবমান।

হাক্সলি বলেন,

'By science I understand all knowledge which rests upon evidence and reasoning of a like character to that which claims on assent to ordinary scientific proposition, and if any one is able to make good the assertion that his theology rests upon valid evidence and sound reasoning, then it appears to me that such theology, must take its place as a part of science.'

সার জন আর্থার টমসন তাঁর বিখ্যাত 'Introduction to Science'-গ্রন্থে লিখেছেন, বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের মধ্যে প্রকৃত কোন বৈপরীত্য নেই। বিজ্ঞান হলো বর্ণনামূলক এবং কোন শেষ সিদ্ধান্তের কথা শোনায় না। ধর্ম রহস্যময় এবং ব্যাখ্যা করবার অপেক্ষা রাখে। অনুভূতির সাহায্যে ধর্মের বহু বক্তব্য উপলব্ধি করতে হয়। ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

'Socalled conflict between science and religion depends in part on a clashing of particular expressions of religious belief with facts of science, or on a clashing of particular scientific philosophies with religious feeling, or on attempts to combine in one statement scientific and religious formulations, or on the contrast of the two moods.'

এর পরেও তিনি বলেছেন যে, বিজ্ঞান ধর্মের সিদ্ধান্ত সমূহকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু অভেদানন্দ বলেন বেদান্ত হ'লো এমন এক ধর্মমত যার প্রতিটি কথা বিজ্ঞান সম্মত। বিজ্ঞান দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা চলে। তিনি বলেন,

'The truth of Vedanta which is absolutely scientific, should be preached before the world and then we shall find not only peace and harmony among the different sectarian

religions of the world but also shal find harmony between true religion and true science.'

প্রায় দুহাজার বছর ধ'রে সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কথা চালুছিল যে মহাবিশ্বের বাইরেকার কোন সত্তা শূন্য থেকে মাত্র দু'দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন কয়েক কোটি বছর আগে তা কি কোন শুভ লক্ষণের সূচনা করেছিল ? পক্ষান্তরে ইতিহাস বলেছে এই বিশ্বাস ভাল করার চেয়ে বরং খারাপ করেছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী ছিলেন বলেই পুরোহিত-সম্প্রদায় গিয়োর্দানো ব্রুনো, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল, তাঁদের কারারুদ্ধ ক'রে রেখেছিল। যেহেতু গীর্জা থেকে যে বক্তব্য প্রচারিত হয়েছিল সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এঁরা তা মেনে নেন নি। তারই ফলে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ব্রুনোকে রোমের রাজপথে পুড়িয়ে মারা হলো। কিন্তু আজ ক্রমবিবর্তন তত্ত্ব সেই 'বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বের' মূলে করেছে প্রবল কুঠারাঘাত, বুঝতে পারা যাচ্ছে ঐ 'ছ'দিনে সৃষ্টির 'তত্ত্ব' নিঃসন্দেহে আজগুবি। অধুনা সৃষ্টিতত্ত্বের সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে রচিত হয়েছে জ্ঞানের নতুন সড়ক।

আজ আমারা বিশ্বাস করতে পারি না যে পৃথিবী সূর্যের আগে সৃষ্টি হয়েছে, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এমন কি নীচু প্রাণী সমেত সব কিছুই মানুষের সন্তোষের জন্যে। অভেদানন্দ বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। আমরা জেনেছি এই পৃথিবী পরিবর্তনশীল, বিশ্বের প্রতিটি ঘটনা বা বস্তুর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। যে সব পরিবর্তন হচ্ছে তা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, ক্রমবিবর্তনের পদ্ধতিতে। বলের অবস্থিতি এবং বস্তুর অবিনাশীতত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে কোন সৃষ্টিকার্য শূন্য থেকে সম্ভবপর নয়। যে মৌল বস্তু আজ দেখা যাচ্ছে তা অতীতেও ছিল ও ভবিষ্যতেও থাকবে। উপমাস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমরা যদি একখণ্ড কাঠ পোড়াই তাহলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কাঠের খণ্ডটি ধ্বংস হ'য়ে গেল। কিন্তু ঐ সময়ে যদি আময়া অভিনিবেশ সহকারে দেখতে চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারবো ঐ কাঠ থেকে 'ছাই' তৈরী হয়েছে, জল, কার্বনিক অ্যাসিড, নানা গ্যাস ও নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়েছে। কাঠের খণ্ডটির রূপ বিনষ্ট হ'লো কিন্তু তার মৌল পদার্থ ঠিকই রইল।

বস্তু, শক্তি ও বল চিরন্তন, অসীম, আদিহীন বা অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞান কি করছে? বিজ্ঞান আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে এক বিশেষ ধারণা সৃষ্টি করেছে। আমরা অনুভব করতে পারি বিশ্বের আদি নেই, অন্ত নেই। বিশ্বের বস্তুপুঞ্জ অসীম।

মহারাজের নিজের ভাষায়—

'By studying the external world, the objective world, science helps us in arriving at the conclusion, that the universe with all its variety of phenomena has come out of this eternal substance which is beginningless and endless. This substancc is infinite.'

অভেদানন্দ বলেন, বিজ্ঞান আমাদের বলে 'দেশ' হলো অসীম। আমরা কল্পনা করতে পারি না কোথায় তার সুরু এবং কোথায় তার শেষ। এই প্রসঙ্গে বেদান্তের কথা তুলবো। বেদান্তের মতে 'দেশ' সসীম। এর সুরু আছে শেষ আছে। বিংশ শতকের বিজ্ঞানীদের কাছে বেদান্তের এই মতবাদের সমর্থন মেলে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, দেশের সৃষ্টি হয়েছে 'আত্মা থেকে:

'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ সম্ভূতঃ' (তৈত্তিরীয় ২·১)। অভেদানন্দ বলেন, জড়বিজ্ঞান তার সত্যের অনুসন্ধানের পথে বুঝতেই পারিনি যে, দেশ ও কালের বাইরে কি আছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চাতে আমরা এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু বা ঘটনা সেই এক ঘনীভূত বস্তু থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। এর বাইরে কিছু জানা যায় না। আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুভূতিগ্রাহ্য স্তর থেকে সুরু হয়, অনুভূতির উপরেই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর করে। বিজ্ঞান বলে এর বাইরে আমরা যেতে পারি না, অতএব এখানেই থামতে হবে। কাজেই আধুনিক বিজ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কে ঐ ঘনীভূত বস্তুপিণ্ডের কথা পর্যন্ত বলতে পারে। তবে আগে তার বলার কিছু নেই। কতিপয় বিজ্ঞানী আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু তাদের আর বিজ্ঞানী বলা হয় না, তাঁরা বিজ্ঞানের শেষ সীমানা অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গেছেন, তাই তাঁদের বলা হয় জড়বাদীদার্শনিক অথবা দার্শনিক। বিজ্ঞানীরা দার্শনিকদের

তত্ত্বকে অভ্রান্ত ব'লে মনে করেন না। অভেদানন্দ বলেন, ভারতে খৃস্টের বহু শতক আগে সত্যসন্ধানীরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে একটি বস্তু সকল বস্তুর সৃষ্টিকারী। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন 'প্রকৃতি' বা মহাজাগতিক শক্তি— যার মানে হলো সৃজনী-শক্তি।

অনেকে এই শব্দটিকে বলেছেন 'মায়া'। বেদান্তের মতে, 'মায়াশক্তি' অবিভাজ্য এবং এটিই বিরাট শক্তি। এর আদি নেই, অন্ত নেই। অনুভূতি গ্রাহ্য নয়, কিন্তু এর বিভিন্ন রূপ থেকে একে চেনা যায়।

বেদান্তের মতে, বিজ্ঞানীরা যতদূর অগ্রসর হয়েছেন তা অনুভূতির সীমানার মধ্যে। তাঁরা বস্তু জগতের যতটা অনুসন্ধান করেছেন তার সবটাই অনুভূতি-গ্রাহ্য। কিন্তু এই অংশ সমগ্রের অর্ধেক মাত্র।

বিজ্ঞান-সম্বন্ধে জওহরলাল চমৎকার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বিজ্ঞান মূল তত্ত্বানুসন্ধানকে এড়িয়ে বড় ক'রে তুলেছে বাস্তবকে। পৃথিবীকে এক লাফে অনেক এগিয়ে নিয়ে সৃষ্টি করেছে বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা, উন্মুক্ত করেছে জ্ঞানার্জনের নানা পথ। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং অন্যান্য চিন্তার সাহায্যে বিজ্ঞান পৃথিবীর রূপ পালটে দিলেও সে বহু প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি। জীবনের লক্ষ্য-সম্বন্ধে বিজ্ঞান নীরব।

তথাপি বিজ্ঞানের জ্ঞান, সমগ্র বিজ্ঞানের প্রতিটি সত্য প্রতিটির সংগে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিজ্ঞানের সত্য সনাতন। শাস্ত্র বা সাম্প্রদায়িক মতবাদ বা কোন উচ্ছ্বাস না মেনে শুধু বিচারের সাহায্যে যে সত্য পাওয়া যায় তাকেই বলবো বিজ্ঞান। যদি এমনি ভাবে বিচার করা যায় তাহলে অনুভব করা শক্ত নয় যে, দর্শন ও বিজ্ঞান এক। বিদগ্ধ বিজ্ঞানী এডিঙ্‌টন প্রায় অনুরূপ কথা-ই বলেছেন। 'Where Science Going on' গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট স্বীকার করেছেন এমন দিন আসবে যখন বিজ্ঞানের সংগে দর্শনের মিতালী হবে।

'True Basis of Morality'-র আলোচনায় স্বামী অভেদানন্দ গ্রীক, জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি দার্শনিকদের নৈতিক মতবাদ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা ক'রে বলেছেন বহু শাস্ত্র বা ঈশ্বরের বাণীর দোহাই না দিয়ে নৈতিক নিয়ম তথা নৈতিকতাকে নিছক বিজ্ঞান ও যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চান। যেহেতু নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। অভেদানন্দ বলেন, বিজ্ঞান মানুষকে তার জ্ঞানের বিশালত্ব ও নিজের

দিব্যমহিমাকে উপলব্ধি করার জন্যে সাহায্য করে। এ' সম্বন্ধে রাশিয়ান দার্শনিব প্রিন্স ক্রোপোটকিন্ বলেছেন, ১০

'Modern science has thus achieved a double aim. On th one side it has given man a very valuable lesson of modesty It has taught him to consider himself as but an infinit simally small particle of the universe. It has taught hir that without the whole the 'ego' is nothing ; that our 'I' car not even come to a self-definition without the 'Thou'. Bu at the same time science has taught man how powerfu mankind is in its progressive march, if it skilfully utilize the limited energies of nature.'

অর্থাৎ, 'বর্তমান বিজ্ঞানের দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। একটি মানুষবে দিয়েছে মূল্যবান নিরহঙ্কারমূলক বিনয়ের শিক্ষা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত অসহায় একথাই মানুষ শিখেছে বিজ্ঞানের কাছ থেকে, যাতে তার সীমাবদ্ধ অহঙ্কারের গণ্ডী গেছে ভেঙে, বুঝেছে বিরাট বিশ্বেরই সে একটি কেন্দ্রবিশেষ। স্রষ্টা ভগবানের একান্ত আকর্ষণের বস্তু বিজ্ঞানই মানুষকে শিখিয়েছে যে, ঈশ্বরকে ছেড়ে দিলে স্বতন্ত্র সত্তা তার অতি তুচ্ছ, 'তুমি' অর্থাৎ ভগবান ছাড়া ক্ষুদ্র 'আমি'র অস্তিত্ব অর্থহীন একেবারে আবার অপরদিকে আত্মচৈতন্যের উদ্বোধন ক'রে বিজ্ঞানই মানুষকে শিখিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে যাতে ক্রমোন্নতির পথে সে হ'তে পারে অনন্তশক্তিশালী'।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত পৃথিবীতে কেমন ধর্মের প্রয়োজন ? অভেদানন্দ বলেন, এমন ধর্ম চাই যা বিজ্ঞানের সকল 'সত্যের' সঙ্গে সম্পূর্ণ মিতালীবদ্ধ। এমন ধর্ম চাই যা দর্শনের সঙ্গে একত্রীভূত, যা সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যধর্ম বর্তমান শতকে সব কিছুর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবে। এই বৈজ্ঞানিক ধর্মে 'মুক্তি প্রাপ্তির কোন কথা থাকবে না, স্বর্গ বা নরক কিংবা চিরকাল নরকবাসের শাস্তির কোন উল্লেখ থাকবে না।

১০ *Cf. Ethics, Origin and Development* (1924). p. 4

বৈজ্ঞানিক সত্তার ভাস্বর অধিকারী স্বামী অভেদানন্দ আশ্চর্য কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, বিংশ শতকে ধর্ম এমন হওয়া উচিত যা কোন মন্দির বা গীর্জা অথবা মসজিদ থেকে চালিত হবে না। পুরোহিতদের, যাজকদের, মৌলভীদের সঙ্গেই যে দেবতার একমাত্র আলাপ বা তারা দৈব সত্তার অধিকারী এ কথা মুছে ফেলতে হবে। শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলবে না এই ধর্ম অথবা আত্মার মুক্তির জন্য শাস্ত্রে যে সব আচার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে (বলা বাহুল্য অভেদানন্দের মতে এগুলি ধর্মের অপ্রয়োজনীয় অংশ) সেগুলিকে বরবাদ করতে হবে।

বিজ্ঞান জগতের চিরন্তন সত্যকে আবিস্কার করতে চাইছে। ধর্ম সেই চিরন্তন সত্যকে পূজা করতে চায়। কিন্তু সেই চিরন্তন সত্যের আরাধনা তার গবেষণার উপর নির্ভর করে। আমরা সবকিছুকেই সরিয়ে রাখবো যা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত বা আবিস্কৃত সত্যের পরিপন্থী। স্বামী অভেদানন্দ বলেন, বেদান্ত আধুনিক বিজ্ঞানকে মেনে চলে। একমাত্র বেদান্তের ধর্মকেই সর্বজনগ্রাহ্য ব'লে মনে করা যেতে পারে।

তাহ'লে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি ? বিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে সত্যের অন্বেষণ এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা হচ্ছে বিজ্ঞানের লক্ষণ! বিজ্ঞানের পদ্ধতির অনুসরণ করে মানুষের মন ও বুদ্ধি মোহবিমুক্ত হতে পারে।

সাধারণতঃ বাহ্য-বস্তুজ্ঞান নিয়েই বিজ্ঞানের কাজকারবার। জহরলাল নেহরু যেমন বলেছেন জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান একান্ত উদাসীন। মানুষের অহংকার এবং লোভকে নমিত ক'রে, সংযত ক'রে তাকে অভিব্যক্তির পথে উন্নীত করতে হলে প্রয়োজন হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন, চাই উচ্চবৃত্তির, মহৎ প্রবৃত্তির সমুচিত ও সমধিক কর্ষণ। একারণেই বিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে 'অনীতিমূলক জ্ঞান'। বিজ্ঞান মানুষের জীবনের কর্তব্য বা উদ্দেশ্যকে নির্দেশনা দিতে পারে না। মাত্র দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে পারে বিজ্ঞানের শিক্ষা ও সাধনা। তথাপি বিজ্ঞানের শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষের সমাজকে, তার চিন্তাধারাকে দিতে পারে নতুন আলোক, দিতে পারে কুসংস্কার বিমুক্ত মন।

মানবজীবনের উদ্দেশ্য, কর্তব্য ও অভিব্যক্তি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নয়, তা অধ্যাত্মবিদ্যার অন্তর্গত বিষয়। এ' সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের উপনিষৎ এবং বেদান্তের বাণী-ই মানুষের কল্পনা বা চিন্তার নিদর্শন বলে মনে করা হয়। যেহেতু

বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যা বলছে তার সংগে বেদান্ত দর্শনের বাণীর বহু মিল দেখা যায়। বেদান্ত বলে, বিশ্বজগতের ও বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ "এক অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, অনির্বচনীয়, অচিন্ত্যনীয়, বোধাতীত, নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকার, অনাদি, অনন্ত, সনাতন, চেতন সত্তা। উপনিষৎ এই বিরাট চেতন সত্তাকে সদ্‌আত্মা, ব্রহ্ম, শিব, আনন্দ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে"[১১]।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে, 'আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে জগতের যেরূপ আমরা দেখতে পাই তা তার স্বরূপ বা প্রকৃত রূপ নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও মনের অবস্থার সংগে সংগে এর রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। একারণেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অলীক বা অনিত্য'।

বহির্জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি থেকে বিজ্ঞানীরা ক্রমান্বয়ে বিশ্বের অন্তিম উপাদান সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব গ'ড়ে তোলেন বা যে-সব সিদ্ধান্ত করেন তাদেরও কোন স্থিরতা নেই। কালে কালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে তাদেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্তে এসেছেন সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে চলেছে ভাঙা-গড়ার খেলা। বিজ্ঞানীরা বলেন, "বিশ্বের অন্তিম ভিত্তি হচ্ছে এক সর্বব্যাপী শক্তিরক্ষেত্র, তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র"। এর সংগে বেদান্তের মায়া বা সাংখ্যের প্রকৃতির সংগে তুলনা করা যেতে পারে। nature বা প্রকৃতিকে 'বেদান্তের ঈশ্বর বা মায়াসমাবৃত ব্রহ্ম অথবা শিব-শক্তি-রূপ' যুগল সত্তার সংগে তুলনা করা চলতে পারে'।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে শক্তিমান হয়ে মানুষ নিজেকে মনে করেছে দুর্জয়, লোভ, মোহ, দ্বন্দ্ব, হানাহানিতে পৃথিবীর বাতাস কলুষিত। তাই বিজ্ঞান মানুষকে জ্ঞানের সার বস্তুটি দিচ্ছে কোথায়—এ' বিজ্ঞান দিতে পারে না। সর্বত্র সমান দেখা, সকল বস্তুকে সমজ্ঞান করা সকল ভূতে নিজেকে দেখতে পেলে মানুষ হিংসা ভুলে যায়। তখন মারামারি, দ্বন্দ্ব আর থাকে না। যেহেতু, নিজের মতন সে আর কাউকে ভালবাসতে পারে না।

গীতার এক বাণীতে আছে—

সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।

১১ প্রিয়দারঞ্জন রায়, সবিতা, বৈশাখ, ১৩৭৩

যিনি সমদর্শী তিনি সর্বত্র নির্বিশেষভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন ব'লে নিজেকে নিজে হিংসা করেন না, ফলে তিনি পরমগতি বা মোক্ষ লাভ করেন।

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শান্তি ও মুক্তিলাভের পথের নির্ভুল নির্দেশ আমরা পাই বেদান্ত ও গীতার বাণীতে। এই বাণী সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য ও অহিংসার সুমহান বাণী। তাহলে আমাদের করনীয় কি? বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে অধ্যাত্মবিদ্যার উপলব্ধিকে। তাহলেই আজ পৃথিবীতে যে সব গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাদের সমাধান করা সহজ হবে। মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে অভিশাপ দেবে না বিজ্ঞানকে। সেই অনুসারী হবে ধর্ম। তা শুধু আচার নিয়মের শুষ্ক বিষয় নয়, বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ধর্ম, বিজ্ঞানের সাহায্যে কুসংস্কার-বিমুক্ত ধর্ম হবে আরো সুন্দর ও সর্বজনগ্রাহ্য। স্বামী অভেদানন্দ মনে করেন, বেদান্তের ধর্ম এই রকমেরই ধর্ম। তাঁর নিজস্ব কথায়:

> 'The truth of Vedanta, which is absolutely scientific, should be preached before the world and then we shall find not only peace and harmony among the different sectarian religions of the world, but also we shall find harmony between true religion and true science, and that harmony is needed in the Twentieth Century.' ১২

'অধ্যাত্মবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' অধ্যায়ে অভেদানন্দের সমন্বয়কারী দৃষ্টিভঙ্গীর এক সুন্দর চিত্র-কল্প ফুটে উঠবে।

১২ *Religion of the Twentieth Century*, p. 37

তিন

॥ অধ্যাত্মবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ॥

প্রাণায়াম মানে কি? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিলেন স্বামী অভেদানন্দ অতি সরল, সহজবোধ্য ভাবে। শুধুমাত্র নাক দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রেখে তাকে আবার ছেড়ে দেবার নামই প্রাণায়াম নয়। প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে প্রাণশক্তিকে দমন করা। 'প্রাণ' অর্থাৎ প্রাণশক্তি এবং 'আয়াম' মানে দমন করা।

এই প্রাণশক্তি কি? এই শক্তি নিঃসন্দেহে জড়শক্তি নয়। উপনিষৎ এই শক্তিকে প্রজ্ঞা থেকে অভিন্ন বলেছে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে,

'নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমো পরো যৎ।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রচেতঃ॥
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং'।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন এই অখণ্ড প্রাণশক্তির কম্পন থেকেই ইলেকট্রন, আয়ন, পরমাণু, অণু ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়েছে।

সৃষ্টি হলো জগৎ। এই জগতটা ক্রমাগতই বদ্‌লে যাচ্ছে। তবে জগৎ কি মাত্র একটি-ই? জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, সৌরজগৎ এমনি নানা ধরণের জগৎ আছে। এমন কি মানব দেহটিই তো একটি জগৎ—'miniature form'-এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে উপমা সংগ্রহ ক'রে তিনি তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করতে চাইলেন।[১]

'সৌরজগতের কথাই ভেবে দেখ না কেন—সূর্যের আশে পাশে কত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্র সব ঘুরে বেড়াচ্ছে! সূর্যটাই কত বড়! সায়েন্টিষ্টরা সব calculate ক'রে দেখেছেন যে সূর্যের circumference হল পৃথিবীর চেয়ে একশো গুণ বড়; অর্থাৎ পৃথিবীটা যত বড়, সূর্যের circumference তার চেয়ে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার মাইল বড়। চন্দ্রের চেয়ে সূর্য আবার চারশো গুণ বড়। এই রকমেরই মঙ্গলগ্রহ হল পৃথিবীর যা circumference তার

---

১ তীর্থরেণু (প্রথম সং) পৃ ৭—৮

অর্ধেক। জুপিটারের diameter (ব্যাস) পৃথিবীর চেয়ে প্রায় এগার গুণ বড়, আর weight-এও ভারি তেমনি তিনশো সতের গুণ পৃথিবীর চেয়ে। এ ছাড়া সৌরজগতে আরো সব এত বড় বড় গ্রহ আছে, পৃথিবী কেন—সূর্যের চেয়েও তারা অনেক লক্ষ গুণ বড়।

এই সৌরজগৎ ছাড়া আরো অনেক সৌর জগৎ আছে। এ' সূর্যই সেই বিরাট সৌরজগতের একটা গ্রহ মাত্র। তারপর এমন সব নক্ষত্র বা ধূমকেতু আছে যা থেকে আলো আসতে হয়তো দশ লক্ষ বছর লাগে। আবার কোন কোন নক্ষত্রের আলোর গতি এক সেকেণ্ডে পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইল ক'রে হ'লে হয়তো পৃথিবীতে আলো আসতে তার লাগবে পঞ্চাশ লক্ষ বছর। সায়েন্টিস্টরা অংক ক'ষে এসব বার করেছেন।

তা ছাড়া এমন সব গ্রহ উপগ্রহ সৌরজগতে রয়েছে যাদের থেকে আলো এসে পৃথিবীতে এখনও পৌঁছায়নি বা আলো এসে পৌঁছবার ঢের আগেই সে সব গ্রহ উপগ্রহ নিভে গেছে। আলোর গতি এক সেকেণ্ডে এক লক্ষছিয়াশী হাজার মাইল। এখন ধর—একটা গ্রহ পঁচিশ বছর আগে সৃষ্টি হ'লে সেই সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ঐ speed-এ দৌড়েও যদি তার আলো আজ পর্যন্তও না পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় তা'হলে ভেবে দেখ আকাশের vastnessটা কতখানি। তার immensity of depth-ই বা কতখানি। মানুষ কল্পনা ক'রেও তা ধারণায় আনতে পারে না।

পৃথিবী থেকে সূর্য প্রায় ন'শো উনত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে। সূর্যকে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বললেও চলে। এই সূর্যও কিন্তু একদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, কেননা প্রতিদিনই কিছু কিছু ক'রে পরমায়ু এর ক্ষয় হ'যে যাচ্ছে। নতুন সূর্য সব আবার nebula-র আকারে তৈরী হচ্ছে। এরকম কত সূর্য ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে এখনো আকাশে ঘুরছে। Telescope দিয়ে তাদের দেখা যায়। সায়েন্টিস্টরা এদের সব dying sun ব'লে থাকেন।

এত যে বিরাট ও বিচিত্র সৃষ্টি তার সব কিছুরই ধ্বংস আছে। সব কিছুই প্রতিমুহূর্তে বদ্‌লে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরাও তা স্বীকার করেন। একারণেই তাঁরা আজ কেবলমাত্র জড় বস্তু নিয়ে তৃপ্ত হ'তে পারছেন না।

সাধকরা বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে শিব হচ্ছেন শক্তির background বা অধিষ্ঠান, তারই উপর সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও অনেকটা এ

কথাকে স্বীকার করেন, তবে তার প্রকাশ ভিন্ন, তাঁরাও বলেন সমগ্র জগৎ এক শক্তির বিকাশ। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন energy। অভেদানন্দ বলেন,[২] 'energy-কেই তন্ত্রে আদ্যাশক্তি বলা হয়েছে। এই একই energy কখনো ব্যক্ত হয় আবার কখনো অব্যক্ত থাকে। ব্যক্ত অবস্থার নাম তাঁরা বলেন kinetic আর অব্যক্তের নাম potential. আমাদের দর্শনেও অনেকটা তাই। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় ক'রে কখনো অব্যক্ত। বেদান্তের যিনি ব্রহ্ম, বিজ্ঞানের energy অনেকটা তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে—যদিও এক নয়।' সাংখ্যের প্রকৃতিও একইরকম। তবে সাংখ্যে 'প্রকৃতি'কে জড় বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের energy-র আবার heat ও motion দু'টো বিকাশ রয়েছে। বিজ্ঞানের মতে heat, light, motion, sound electricity এসবই এক শক্তির বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ। একারণেই এদেরও শক্তি বা energy বলা হয়।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'The Ways to the Blessed Life' বক্তৃতাতে এবিষয়ের উল্লেখ করেছেন,

> 'Electricity is one universal, inscrutable force, but on account of the various ways in which it is made manifest through different electric machines, it appears in many forms, as heat, as light or as motion.'

বিজ্ঞানীদের মতে এই শক্তি নিত্য ও ধ্বংসবিহীন। 'বস্তু'ও তাই। শক্তি-সংরক্ষণের (conservation of energy) কথা বিজ্ঞানীরা বলেন। অভেদানন্দ বলেন এই শক্তি-সংরক্ষণ ক্রিয়া আমাদের শরীরের পক্ষেও প্রযোজ্য। প্রাণশক্তি বা vital energy-কে রক্ষা করবার নামই হলো শক্তি-সংরক্ষণ। আসলে স্বামী অভেদানন্দ একথাই বলতে চেয়েছেন শক্তি-সংরক্ষণের অর্থ হলো 'to hold our mind in a centre', অর্থাৎ আমাদের বিচিত্রমুখী সচঞ্চল মনকে কোন একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে স্থির ক'রে রাখার নাম হ'লো শক্তি-সংরক্ষণ। তাঁর নিজস্ব ভাষায় বলা যায়[৩],

> 'Revelation does not come to one unless one has that one-pointed state of mind...* *. Revelation is powering all the

২ তীর্থরেণু, পৃ ১০

৩ cf. *True Psychology* p. 113

time into each mind, but the mind is not able to receive it. It is dissipated. But make the receiver ready to receive that revelation. How can you make it ready ? By stopping all the disturbing elements, by focussing and conserving. your energy, so by conservation of energy, we can keep our minds quiet and peaceful.'

যোগশাস্ত্রে 'সুষুম্না' শব্দটির প্রচুর ব্যবহার আছে। এটি কি—এ' নিয়ে বিজ্ঞানী-মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে। স্বামী অভেদানন্দ নিজেও এ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী ছিলেন। তাই আমেরিকা থাকাকালীন দেখলেন শবব্যবচ্ছেদ। তারপরে এলেন নিজস্ব সিদ্ধান্তে। তাঁর নিজস্ব কথায়[৪],

'আমি যখন আমেরিকায় ছিলুম তখন একদিন এক বিশিষ্ট ডাক্তার-বন্ধুর অনুরোধে একটা dissection-এর class attend করি। আমারও কৌতূহল হয়েছিল এই সব কিছু দেখার। বাস্তবিক পক্ষে spinal column এর ভেতরে একটা cord আছে। এই spinal cord থেকেই শরীরের সমস্ত nerve (স্নায়ু) বেরিয়েছে। এদের spinal nerves বলে। এই spinal cord-এর মাঝখানে খুব একটা সরু সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে—তাকে central canal of the spinal cord বলে। সেটা একটা fluid substance দিয়ে অনবরত ভর্তি থাকে। যোগীরা একেই সুষুম্না ব'লে কল্পনা করেছেন'।

এমনিভাবে অধ্যাত্ম মার্গের প্রায় প্রতিটি বক্তব্যকে তিনি বিচার করেছেন বিজ্ঞানের আলোকে। তারপর স্বীয় প্রজ্ঞার প্রভাবে তাকে গ্রহণযোগ্য ক'রে তুলেছেন সর্বসাধারণের কাছে।

'আত্মা' সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, যে আত্মা বা প্রাণশক্তি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত তা অবিনাশী। প্রাণশক্তি থেকেই জড় জগতে সকল শক্তি এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি বিকাশ লাভ করে। বিষয়টি ভালো ক'রে বোঝানোর জন্যে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানের আশ্রয় নিলেন[৫],

বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ্য করেছেন সমগ্র বিশ্ব সূক্ষ্ম অণু-পরমাণু কিনা electrons

---

১ তীর্থরেণু ১ম সং, পৃ ১৪
ঐ ২য় সং, পৃ ১০৯

তারই

বা বিদ্যুতিনু দ্বারা ব্যাপ্ত, বিন্দুপরিমিত স্থানও অণু-পরমাণু ছাড়া নয়। সর্বত্র তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতীন্দ্রিয় electrons-য়ে পূর্ণ। অনু-পরমাণুর মধ্যেও প্রাণশক্তি ও স্পন্দন আছে। প্রাণশক্তি বা প্রাণ প্রজ্ঞা ও আত্মা থেকে অভিন্ন'।

আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। দেহের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আত্মাকে তাই দেখা যায় না। ইথারের যেমন সত্তা আছে অথচ তাকে দেখা যায় না তেমনি। অতএব আত্মা অদৃশ্য ব'লে যে তার অস্তিত্ব নেই একথা বলা উচিত নয়। আবার বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে প্রাঞ্জল করতে চাইলেন স্বীয় বক্তব্যকে[৬]—

'বাতাস চোখে দেখা যায় না কিন্তু তাকে আমরা স্পর্শ করি। নেপচুন (Neptune) চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যায় না কিন্তু তাই বলে কি বলতে হবে নেপচুনের কোন অস্তিত্ব নেই? Telescope দিয়ে নেপচুনকে দেখা যায়, সুতরাং তার অস্তিত্ব আছে। সৌরজগতে এমন হাজার হাজার গ্রহ উপগ্রহ আছে যেগুলোকে হয়তো খুব powerful telescope দিয়েও দেখা যায় না, কিন্তু তাই বোলে কি বলবে তাদের অস্তিত্ব নেই? তা কেন? কালে (সময়ে) বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরো কত নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হবে, আরো কত শত অজানা অতীন্দ্রিয় জিনিস আমরা দেখতে পাব ও জানতে পারব'।

অভেদানন্দ 'প্রকৃতি'-কে বিজ্ঞানের ভাষায় বলেছেন 'Cosmic Energy' বুঝিয়ে তিনি বলেছেন—X'ray দিয়ে সুরু করা যাক। এই আলোকরশ্মি দিয়ে সূক্ষ্ম জিনিস দৃষ্টিগোচর করা যায় এবং অন্ধকারের বা ঘরের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে দূরের বা বাইরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। আজকাল X'ray ডাক্তারি চিকিৎসায় ব্যবহার করা হচ্ছে। পেটের ভিতরে খাবারের সঙ্গে একটি আলপিনু খেয়ে ফেল্লে X'ray-র সাহায্যে তাকে দেখা যায়। 'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, প্রকৃতির মধ্যে সকল শক্তিই সুপ্ত আছে। প্রকৃতি কিনা Cosmic Energy। প্রকৃতিই অব্যক্ত বা ঈশ্বর'।

অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হওয়া মানেই শক্তির বিকাশ। কারণ থেকে কার্যে পরিণত হলেই শক্তি প্রকাশিত হয়। এই শক্তিকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন force (কার্য

৬ তীর্থরেণু, ২য় সং, পৃ ১৩২

শক্তি)। তন্ত্রে এই force-কেই বলা হয়েছে কালী, আদ্যাশক্তি বা মহামায়া, বেদান্তে মায়া ও সাংখ্যে প্রকৃতি। বিশ্বসংসারে পরিবর্তন চলেছে অবিরত ধারায়। তার বিরাম নেই। এই পরিবর্তনও আবার শক্তি বা force। এই শক্তি গতিশীল। অভেদানন্দের ভাষায়[৭]—

'শক্তি ব্যক্ত হওয়া মানেই কার্যের আকারে প্রকাশ পাওয়া। রেলওয়ে-ইঞ্জিন তীরের মতো বেগে ছুটে যায় শক্তিরই বলে। কিন্তু ইঞ্জিনের ঐ শক্তি থাকে কোথা? Steam-এ (বাষ্পে)। কয়লায় heat (তাপ বা আগুন) potential form-এ (বীজ বা অব্যক্ত আকারে) থাকে। কয়লায় অগ্নির সংযোগ হোলে heat (তাপ) জন্মায় ও প্রকাশ পায়। প্রকাশ অর্থে manifested (ব্যক্ত) হওয়া। Heat (তাপ) আবার জলকে steam-এ (বাষ্পে) পরিণত করে আর তাই দিয়ে ইঞ্জিন চলে। steam-ই (বাষ্পই) সেখানে energy (শক্তি)। ইঞ্জিন জড় আর সেই জড়ের পিছনে energy (শক্তি বা চৈতন্য) থাকে বোলেই ইঞ্জিন চেতনের মতো কাজ করে'।

যোগীরা অনেকে বলেন, হৃদয়ে আত্মা বা পুরুষের স্থান, তেমনি আবার মস্তকেও তার স্থান আছে। যোগীরা মস্তকে সহস্রার-পদ্মের কল্পনা করেন। সহস্রার কিনা সহস্রদল পদ্ম। অভেদানন্দ বলেন, পদ্মও সাধকদের ভাবনা বা কল্পনা। সহস্রার-পদ্মে যোগীরা পরমশিবের স্থান চিন্তা করেন। পরমশিব Pure Consciousness (শুদ্ধ চৈতন্য)। যোগীরা পরম শিবকে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ উপলব্ধি করেন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার দর্শন হয়। আসলে ঐসব ভাবজগতের খেলা।

'মাথায় মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা consciousness বা knowledge-এর স্থান নির্দেশ করেন। মস্তিষ্কেও একটা empty space (শূন্যস্থান) আছে। ঐ space-এর আকাশে তেজোদ্দীপ্ত আত্মা থাকেন বলে অনেকে চিন্তা করেন। ঐ space-এর location হোল ঠিক মাথার ব্রহ্মতালু (ব্রহ্মরন্ধ্র) থেকে যদি একটা আলপিন সোজাসুজি ভাবে চালিয়ে দাও এবং আর একটা আলপিন medulla oblongata (সুষুম্নাশীর্ষক বা ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী যেখানে meet করবে সে স্থানটাই সাধারণতঃ ঐ space-এর location (স্থিতিক্ষেত্র)'[৮]।

৭ তীর্থরেণু, ২য় সং পৃ ১৪৯
৮ ঐ পৃ ২০০

অভেদানন্দ বলেছেন আত্মা ও ঈশ্বর অভিন্ন। যে মুহূর্তে আমাদের আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি প্রকাশ হবে, সেই মুহূর্তেই আমরা বুঝতে পারবো যে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং বহু দূরবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ—যে সব জ্যোতিষ্ক থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসতে একশ' বছরেরও বেশি সময় লাগে আত্মা সেই সব বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যে চৈতন্যের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি ও যার দ্বারা আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহকে অনুভব করতে পারি, তা-ই প্রকৃত আত্মা। এই আত্মাই যাবতীয় চিত্তবৃত্তি ইন্দ্রিয়শক্তি এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মূল কারণ। বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করবার জন্যে অভেদানন্দ পদার্থ বিজ্ঞানের সাহায্য নিলেন :

'আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি যে, সমগ্র জগৎটি জড় ও প্রকৃতির শক্তির সমবায়ে উৎপন্ন হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, জড় জগৎ কতগুলি পদার্থের স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পদার্থগুলির প্রকৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুর কম্পন বা স্পন্দন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। যা হোক আমাদের কাছে উত্তাপ, আলোক, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রস বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির যোগ্য যে কোনও বিষয় বলে পরিচিত তা সেই অজ্ঞাত পদার্থের স্পন্দনাবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়'।

সার উইলিয়ম ক্রুক্স্ বলেছেন[১],

'এক সেকেণ্ডে বত্রিশটি বায়ুর কম্পন থেকে শব্দ প্রথম কর্ণগোচর হয় এবং যখন এই কম্পনের হার প্রতি সেকেণ্ডে তেত্রিশ হাজারের কিছু কম হয় তখন আর শব্দ কর্ণগোচর হয় না। উত্তাপ ও আলোকরশ্মির কম্পন এত দ্রুত হয় যে, তা প্রায় ধারণার মধ্যেই আসে না। পনেরটি রাশির দ্বারা তাদের কম্পনের হার (প্রতি সেকেণ্ডে) নিরূপিত হয়। আবার সম্প্রতি 'রেডিয়ম' নামে একটি মৌলিক ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে ও তার কম্পনের সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে নব্বই লক্ষের দশ লক্ষ গুণের দশ লক্ষ অপেক্ষার বেশি ধার্য হয়েছে'।

তৎকালে প্রকাশিত এই বৈজ্ঞানিক তথ্য স্বামী অভেদানন্দ সম্পূর্ণভাবে জানতেন এবং একারণেই তিনি বলেছেন জগৎটাই পরমাণুর কম্পনবিশেষ। তাঁর মতে,

১ আত্মজ্ঞান, পৃ ৩৩-৩৪

এই কম্পন-রাজ্যের বাইরে এবং প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির মূলে সেই একই পরম-ত্য বা আত্মা বিরাজ করছেন। এই যদি আত্মার সংজ্ঞা হয়, তাহলে 'মন' কি ? ন্দন বা কম্পনের ফলে সূক্ষ্মতর অবস্থায় পরিণত পরমাণুকেই বেদান্তে 'মন' বলা । মনের এই উপাদানের কম্পন থেকেই সর্বপ্রকার বোধশক্তি ও অনুভব রার ক্রিয়া উদ্ভব হয়ে থাকে ও যেসব বস্তু স্থূল জড়-পরমাণুর কম্পনের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে না, এ তাদের প্রকটিত করে। অভেদানন্দ বলেন সত্ত্বগুণ পন্ন অতিসূক্ষ্ম পরমাণু রাশির কম্পনই মনের যাবতীয় বৃত্তি (function)। এবারে পদার্থবিজ্ঞানের উপমার সাহায্যে জটিল বিষয়টিকে সরলীকৃত করতে চেয়েছেন। অভেদানন্দের ভাষায় বলি[১০],

'একখণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রাখিলে উহা যেরূপ ঐ অগ্নির মতই জ্বলন্ত লোহিতবর্ণ ও তাহার দাহিকাশক্তি বিশিষ্ট হয়, সেরূপ মন পদার্থটিও চৈতন্যময় আত্মার সংস্পর্শে আসিলে তাহা চেতনধর্মী বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রজ্ঞানঘন আত্মা যেন চুম্বকের মত মনরূপী লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যখন একখণ্ডলৌহকে চুম্বকের নিকট রাখা যায় তখন লৌহখণ্ডটি তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নড়িতে থাকে ; কিন্তু বাস্তবিক লৌহের নিজের উক্ত প্রকারে নড়িবার ক্ষমতা নাই ; লৌহখণ্ড চুম্বকের নিকট অবস্থান করিলে অথবা উহার সংস্পর্শে আসিলে তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই লৌহের গতিশীলতা দেখাইয়া থাকে। চুম্বকের সান্নিধ্যই যেমন লৌহখণ্ডটির মধ্যে গতিশীলতা আনয়ন করে, আত্মার সান্নিধ্যই সেই প্রকারে মনরূপ বস্তুটিকে ক্রিয়াশীল করিয়া থাকে'।

উপনিষদের ভাষ্য অনুসরণ ক'রে অভেদানন্দ বলেছেন, আত্মাই একমাত্র নিত্য ও জ্ঞাতা। কেনোপনিষদের ২।১১।৩ শ্লোকে আছে—

'যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥'

এই প্রহেলিকাময় উক্তির ব্যাখ্যা করেছেন অভেদানন্দ বিজ্ঞানের সাহায্যে। তিনি বলেন,[১১]

'বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই জানি যে, আকাশের অর্থাৎ 'ইথার' নামক

১০ আত্মজ্ঞান, পৃ ১৪০

১১ ঐ পৃ ১৬০-১৬১

পদার্থের বিশেষ একপ্রকার কম্পনের দ্বারা আলোকরশ্মি উৎপন্ন হয় এব রূপের অনুভূতিটি ঐ আলোকের সাহায্যেই হইয়া থাকে। আমাদে চক্ষুব মধ্যে অবস্থিত ঝিল্লীতে আলোকরশ্মি পতিত হইলে উহার মধ্যে একপ্রকার আণবিক কম্পন ও পরিবর্তন হয় এবং উহা আক্ষিক স্নায়ুমণ্ডলী সাহায্যে মস্তিষ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র কোষগুলিতে প্রেবিত হইলে উহা হইতেও একরূপ আণবিক কম্পন উত্থিত হয়। তাহার পর ঐ কম্পনগুলিবে অনুভূতিতে পবিণত করিতে অর্থাৎ উহা যে একপ্রকার অনুভূতি, তাহা পরিচয় দিতে একজন চৈতন্য-সংযুক্ত 'অহং' বা 'আমি' থাকা প্রযোজন এব এই পরিচয় দেওযাব ব্যাপার শেষ হইলে বুঝিতে পারি যে, আমাব একটি রূপ দেখিতেছি। যদি উক্ত 'অহং' না থাকে তাহা হইলে কম্পনগুলি মস্তিষ্কেব অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে যাইযা অন্যান্য প্রকার পবিবর্ত সংসাধিত করিতে পাবে, কিন্তু তখন আর আমাদের ঐ 'রূপ' সম্বন্ধে কো প্রকার অনুভূতি হয না। যেমন একটি দৃশ্যের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলেও যদি হঠাৎ আমাদের মন অন্য একটি বস্তুব বা বিষযে উপর আকৃষ্ট হয, তাহা হইলে উক্ত দৃশ্যটি চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে আমবা উহা দেখিতে পাইব না। এখানে আলোকের কম্পন মস্তিষ্কে অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে চলিযা গিযাছে এবং যথাযথভাবে আণবি পরিবর্তন হইযাছে ও অনুভূতির নিমিত্ত শাবীরিক অন্যান্য পরিণতিগুলি ঘটিযাছে, তথাপি 'অহং' বা জ্ঞাতা বিদ্যমান না থাকায দৃশ্যের অনুভূতি হইল না'

প্রাণাযাম প্রসংগে আবাব আসছি, যেহেতু প্রাণাযামের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারলে যোগশাস্ত্রের উপযোগিতা বুঝতে পারা যায। অভেদানন্দ বলেছে আধুনিক শারীরবিজ্ঞান, দেহব্যবচ্ছেদবিদ্যা, প্রাণবিজ্ঞান ও জীববিদ্যা ও চিকিৎস বিদ্যায় অনুশীলনকারী বহু ব্যক্তিই জন্ম-মৃত্যুর যে চিরন্তন সমস্যা আছে তা সমাধান করতে পারেন নি। বহুদিন যাবৎ বিজ্ঞানের নানা বিভাগের গবেষকে এ নিযে অনেক গবেষণা করেছেন। এখনও চলছে। তাঁদের গবেষণা থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছেন যে মানবদেহের সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সমবায়ে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে তার ফলেই প্রাণশক্তির সৃষ্টি হয়। তাঁরা মনে করেন, গবেষণাগারে সংগৃহীত নানা জড়পদার্থের সমবায়ে রাসাযনিক প্রক্রিযা

ফলে সৃষ্ট পদার্থের মতো প্রাণশক্তিও জীবদেহের কয়েকটি উপাদানের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া প্রাণের আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের নানা বিভাগে গবেষণারত অনেক বিজ্ঞানী এই ধারণাই পোষণ করেন।

আধুনিক কালে অনেকে মনে করেন অচেতন পদার্থ থেকেই প্রাণের অভিব্যক্তি ও প্রাণের উৎপত্তি এবং গতি ইত্যাদি সব পদার্থবিজ্ঞান, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। অভেদানন্দ প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে কি আমরা কেবলমাত্র যান্ত্রিক নিয়মের অধীন কলকব্জার মতো, তার বাইরে কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই?

> 'আমরা কি অণু-পরমাণুর গতি ও স্থিতি ও তাদের রাসায়নিক শক্তি ছাড়া আর কিছুই নই? আমরা কি অন্ধ ও জড় প্রাকৃতিক শক্তির বশে সমস্ত অণু-পরমাণুর রাসায়নিক সমবায়ের ফলে তরল পদার্থের গাদ ও তলানি (precipitation, deposition) কিংবা দানাবাঁধা জমাট কোন দ্রব্যের মতো উৎপন্ন হয়েছি? শারীর বিজ্ঞানের ছাত্ররা বর্তমানে তাদের কলেজে প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্বে বর্ণিত পাঠ অধ্যয়ন ক'রে থাকে। কোন লোকের কাছে প্রাণশক্তি (vital enrgy) জীবনশক্তি, জীবনক্রিয়া এই শব্দ শুনলে শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা ও ছাত্রেরা জড় প্রকৃতির পদার্থসমূহ রাসায়নিক শক্তিরাশি থেকে স্বতন্ত্র কোন চেতন বস্তু থাকতে পারে তা বিশ্বাস করতে চান না। কারণ এই সব ছাত্রেরা শারীর বিজ্ঞান পড়বার প্রথম থেকেই প্রাণ ও প্রাণের গতিতে বিশ্বাস করে না। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণ ব'লে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নেই। কোনও প্রাণীর শরীর, ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্কের কোষরাশি ইত্যাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা প্রতিপন্ন করতে চান যে এদের উৎপত্তির মূলে প্রাণ ও জীবনশক্তি ব'লে কোন বস্তুর সত্তা নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে ইউরোপে এই ধরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে'।[১২]

'প্রাণ' বলতে তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে? ভারতীয় যোগীরা বলেন শ্বাসের ব্যায়ামের (breathing exercise) সাহায্যে সব রোগ তাড়ানো যায়। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। তাঁরা বলেছেন, কেবলমাত্র 'অক্সিজেন' সকল রোগের ওষুধ নয়, অবশ্যই নানা ধরণের শক্তি আছে যা রোগ

১২ Cf. How to be a Yogi থেকে অনূদিত

সারানোর পক্ষে অত্যাবশ্যক। যে শক্তি ছাড়া রোগ নির্মূল করবার কথা ভাবা যায় না, তা হ'লো 'প্রাণ'। অভেদানন্দ বলেছেন 'প্রাণে'র শক্তি অক্সিজেন, তড়িৎ শক্তি, বা আনবিক আকর্ষণ শক্তি নয়, এ শক্তি সকল শক্তি (কি ভৌতিক কি রাসায়নিক) থেকে পৃথক। এই শক্তি অক্সিজেনের সাহায্যে উদ্ভূত হয় না, এই শক্তি প্রকৃতির যাবতীয় ভৌত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। একে কখনো বা বলা যেতে পারে স্নায়বিক শক্তি অথবা জীবন-শক্তি কিংবা মুখ্য শক্তি :

'The power of the 'prana' is neither oxygen, nor electricity, nor molecular attraction, but is a force distinct from these forces and also other physical and chemical forces. It is not produced by oxygen, but it is a power which governs and directs the physical forces of nature. It is sometimes called the nervous force or the life-force, or the vital energy.'[১৩]

যদি আমরা নিজেদের দেহযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের কথা মনে করি তাহলে 'প্রাণের' কার্যকারিতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য উপলব্ধি করতে পারবো। শ্বাস কার্যের কথা ধরা যাক। নাক দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে ট্রেকিয়া, ব্রঙ্কাস, ইত্যাদির মাধ্যমে তা ফুস্‌ফুসে পৌঁছায়। আবার ফুস্‌ফুস তা বের ক'রে দেয়। এই প্রক্রিয়ার সময় দেহের মধ্যে ডায়াফ্রাম (Diaphram—মধ্যচ্ছদা) নামে পুরু পর্দাটি আছে তা ওঠা নামা করে। বলা বাহুল্য মধ্যচ্ছদার এই ওঠা-নামার ক্রিয়া ঘটে দেহস্থ বিশেষ স্নায়বিক শক্তির প্রভাবে। প্রশ্ন উঠবে মধ্যচ্ছদার এই বিশেষ ক্রিয়া কি কারণে ঘটেছে! যোগীরা বলেন এ-কাজ 'প্রাণের'। তাহলে 'প্রাণের' স্থান কোথায় দেহের মধ্যে? অভেদানন্দ এ' প্রশ্নের সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, [১৪]

'...Prana, or the life force, or the vital energy, is located in the spinal column, from which all the motor and sensory nerves branch out and spread all over the system or over the

১৩ The Value of Correct Breathing, *Complete Works of S. Abhadanand* vol III. p. 56

১৪ ibid, p. 57

organs. The nerve currents flow through the channels by this power of the prana, or the life-force. Without this life-force, the organic activities will be impossible, the heart will not beat, the lung will not move, and other organic functions will stop.'

অভেদানন্দ বলেছেন, 'প্রাণ' মেরুদণ্ডের মধ্যে আছে—অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে। কারণ তিনি একথাও বলেছেন 'প্রাণ' সর্বত্র আছে। বাতাসে, সূর্যরশ্মিতে—সর্বত্র। এই প্রাণশক্তি উত্তাপ, আলোক, গতি ও তড়িৎ শক্তির উদগাতা।

সমস্যার আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন যোগীপ্রবর অভেদানন্দ। তিনি বলেছেন, এই 'প্রাণের' প্রকাশের জন্যে এক বিশেষ অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে—মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে তা হলো মেরুদণ্ড, অন্যান্য প্রাণীদের বেলায় অনুরূপ অঙ্গ। মেরুদণ্ডকে বলা যেতে পারে 'প্রাণের' শক্তিকে বয়ে নিয়ে যাবার রথ। তাহলে এই শক্তির উৎস কোথায়? স্বামী অভেদানন্দ নিপুণভাবে তার স্থান নির্দেশ ক'রে বলেছেন,[১৫]

'...it is located in the nerve-centres in the spine, and from there it flows through the nerves all over the system.'

এ' প্রসঙ্গে মেরুস্নায়ু সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাক। গাছের কাণ্ড থেকে যেমন ডালপালা বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal Cord) দুদিক থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু বের হ'য়ে হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে এবং পেটে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কার্য হিসেবে শাখা স্নায়ুগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়,

এক : সংবেদীয় স্নায়ু (sensory nerves)

দুই : চেষ্টীয় স্নায়ু (motor nerves)

সংবেদীয় স্নায়ুর সাহায্যে নানাধরণের অনুভূতি লাভ করা যায়। দেহের ত্বকে, স্পর্শ, ব্যথা, উত্তাপ ইত্যাদি বোধক যে সব সাধারণ ইন্দ্রিয় স্থান আছে অথবা যে চার ধরণের বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে তা থেকে বিভিন্নধরণের অনুভূতি যখন স্নায়ুসমূহের দ্বারা বাহিত হয়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অনুভূতিকেন্দ্রে যায় তখনই আমরা

১৫ Cf. The Value of Correct Breathing, *Complete Works of S. Abhadananda*, vol III, p. 57

এদের অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হই। কোন সংবেদীয় স্নায়ু নষ্ট হয়ে গেলে, সেই সংশ্লিষ্ট অনুভূতি আর থাকে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

চেষ্টীয় স্নায়ু : মস্তিষ্কের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যেসব বহির্মুখ স্নায়ু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশী বা গ্রন্থিকে নিজ-নিজ কার্যে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরই চেষ্টীয় স্নায়ু বলা হয়।

তাহলে 'প্রাণের' গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাচ্ছে। এবং যদি আমরা এই 'প্রাণের' শক্তিকে বেশ কিছু পরিমাণে সঞ্চিত ক'রে রাখতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভ করতে পারবো। প্রাণের শক্তি-ই আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও চিন্তাশক্তির উৎস। যদি মুখ্যশক্তি বা স্নায়বিক শক্তি মস্তিষ্কের কোষের মধ্যে কাজ না করে (এখানে মুখ্য শক্তি বা স্নায়বিক শক্তি অর্থে 'প্রাণ' বোঝাচ্ছে) তাহলে মস্তিষ্কের চিন্তা করবার ক্ষমতা থাকে না। অভেদানন্দ 'প্রাণে'র এই অপূর্ব ও মহৎ ক্ষমতার কথা পুনর্বার বলেছেন,[১৬]

'According to the science of breath, each living soul possesses the power of the Prana, by which are caused the activities of the motor and sensory nerves. The nerve-currents which travel through these nerves are produced by the vibration of the 'prana'. The nerve-centres in the spine are the store house of this life-force where it is generated and kept. In the case of emergency, this life-force goes through different parts of the body distributing the healing powers.'

স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্য অনুসারে মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রগুলি প্রাণশক্তির ভাণ্ডার। এখানেই প্রাণ-শক্তি উৎপন্ন ও সঞ্চিত হয়। প্রয়োজনের সময়ে প্রাণশক্তি শরীরের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয় এবং আরোগ্যকারী শক্তি বিকিরণ করে।

উপনিষদে প্রাণ'কে চেতন ও জড় জগতের সমস্ত গতির মূল কারণ বলা হয়েছে। 'যদিদং কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' (কঠোপনিষৎ ২।৩।২)। ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ ক'রে জীবাণু, কীটাণু (bioplasm), প্রকাণ্ড গ্রহ-তারা-নক্ষত্র ইত্যাদি সমন্বিত সৌরজগৎ পর্যন্ত

১৬ Cf. The Healing Power of the Prana, ***Complete Works of S. Abhadananda***, **vol III, p, 63**

যেখানে যার মধ্যে কোন গতিশীলতা ও জীবনের স্পন্দন দেখা যায় সেখানেই আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে এই সর্বব্যাপী প্রাণের শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে। মুণ্ডকোপনিষদের ২।১।৩ শ্লোকে বলা হয়েছে,

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খম্বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী ॥

বেদান্তের মতে, সৃষ্টির আগে বিশ্বচরাচর যখন অব্যক্ত অবস্থায়, তখন প্রাণশক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন। অপ্রাণ (non-life) বা শূন্য থেকে প্রাণের অভিব্যক্তি হয়েছে এই ধরণের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত বেদান্তের বিচারে স্থান পায় নি। আবার যান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত কোন শক্তি থেকে প্রাণের উৎপত্তি হযেছে একথাও বেদান্ত স্বীকার করে না। বেদান্ত বলে, যাবতীয় জড় ও রাসায়নিক শক্তিকে যা সব সময় চালনা ক'রে যাচ্ছে তা-ই হ'লো 'প্রাণ'। প্রাণের নিরোধ করলে মনও শরীরের উপর কোন কাজ করতে পারে না। তাই প্রাণকে মনের কাজ করবার মাধ্যম বলা হযে থাকে।

আত্মার শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যেই জীবের দেহ এক যান্ত্রিক অবয়বরূপে সৃষ্ট। জড়জগতে কোন শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আত্মা প্রাণের সাহায্যে জীব-দেহের সৃষ্টি ক'রে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। এই প্রসংগে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,[১৭]

> 'জীবের মানসিক কর্মশক্তি পরিবর্তন হওয়ার সংগে সংগেই তাহার স্নায়ুমণ্ডলী (nerves) এবং কোষগুলিরও (cells) পরিবর্তন হইয়া থাকে। বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, শরীরের অবস্থান্তরগুলি এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলীর মূলে একমাত্র মনই বর্তমান। মনের অস্বাভাবিক কার্যকলাপ হইতেই শরীরের বিকৃতি ও বিকলতা দেখা দেয়। মনের অস্বাভাবিক অবস্থাই জীবনীশক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলে। এই জীবনীশক্তি শরীরের প্রত্যেক কোষকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকে। সুতরাং জীবনীশক্তি যদি মনের অস্বাভাবিকতার দ্বারা অভিভূত হয় তাহা হইলে দেহের প্রত্যেক কোষের স্পন্দন অন্যরূপে বিকশিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলে প্রত্যেক কোষেই মনের কার্য অস্বাভাবিকভাবে ঘটিতে থাকিবে এবং তাহা হইতেই দেহে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হইবে।'

১৭ যোগশক্তি, ৩য় সং, পৃ ৭৯

মনের প্রত্যেকটি বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ সর্বপ্রথম স্নায়ুকেন্দ্রে ও ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে রাসায়নিক ও দৈহিক বিকার ঘটিয়ে থাকে। ক্রমান্বয়ে তা শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অভেদানন্দ বলেছেন, দেহের প্রতিটি অংগ থেকে নির্গত দূষিত রস-নিস্রাবের রাসায়নিক উৎপাদন বিশ্লেষণ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করলে 'রাসায়নিক বিকার' কথাটির তাৎপর্য অনুভব করা যায়।
এই প্রসংগে তিনি এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা বলেছেন,

> 'ক্রোধ অথবা অন্য কোন রিপুর তাড়নায় বিচলিত কোন ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের পরীক্ষা করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, ঐ ব্যক্তির সমস্ত দেহ সাময়িকভাবে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোন কাচের নলের (glass tube) ভিতর দিয়া কোন ক্রোধোন্মত্ত ব্যক্তির মধ্যে সলিউসন প্রবেশ করাইলে দেখা যাইবে ঐ সলিউসনটি পূর্বোক্ত ব্যক্তির বিষাক্ত নিঃশ্বাসে কিভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। শরীরের এই সমস্ত পরিবর্তন তাহার ভিতরের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে সংঘটিত অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শরীরের বিভিন্ন অংগের ক্রিয়া পরিবর্তিত হওয়াতে শ্বাসপ্রশ্বাসেরও অনিয়মিত অবস্থা আসে। কিন্তু মনের সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ঐভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইত সলিউসনটি পূর্বের মতোই আছে, তাহার কোনই রাসায়নিক পরিবর্তন হয় নাই। মনের শান্ত অবস্থায় মানবদেহের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত, গভীর ও সহজ থাকে।'[১৮]

অভেদানন্দ বলেন, প্রাণ-ই শরীরের সমস্ত অংগের সঞ্চালনক্রিয়ার শক্তিকেন্দ্র। যোগীরা বলেন, মেরুদণ্ডের সংগে যুক্ত স্নায়ুকেন্দ্রে প্রাণশক্তি পুঞ্জীভূত থাকে। এই শক্তি দ্বারা ফুসফুসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, রক্ত-সঞ্চালন ও অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। এই কথাগুলিকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে অভেদানন্দ সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি প্রথমে ফুসফুসের শারীরবিজ্ঞান আলোচনা করেছেন নিপুণ শারীরতত্ত্ববিদের মতো। এখানে তা তুলে ধরছি, [১৯]

'We all know that our breathing apparatus consists of the

১৮ যোগশিক্ষা, ৩য় সং, পৃ ৮০

১৯ The Value of Correct Breathing, *Complete Works, of S. Abhadananda*, vol III, p 52-53

lungs and the air-passages, such as the nose, the pharynx, the larynx, the wind-pipe, and so on. We all know that the atmospheric air is drawn through these passages by the mechanical action of the diaphragm, which is nothing but a strong and flat muscle which separates the chest from abdomen. The oxygen of the air, entering through the open door of the lungs, filters through the thin walls of the pulmonary capillaries, comes in contact with the venous blood, produces a kind of combustion, and destroys all the impure matter that is deposited in the blood, and, as the result of this combustion, carbonic acid gas is generated which result of this combustion, carbonic acid gas is generated which comes out in the form of breath. Ordinarily, when we inhale the air that contains about twenty-one percent of oxygen, and when expelled, it contains twelve percent in the system, and the blood which has once been used will be of no further service, if it were not purified by the lungs.'

আবার অন্যত্র এক প্রবন্ধে[২০] আরো বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

In every adult man, the average pulsation is 75 in a minute and 2 ounces of blood are drived from the heart to the lungs at each pulsation, or 9 pounds and 6 ounces in a minute or 13,500 pounds in 24 hours.'

ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশদ্বার অর্থাৎ শ্বাস দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস প্রবেশ ক'রে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। অষ্টাদশ শতকেও অবশ্য ভিন্ন মত ছিল এমনকি ল্যাভয়শিয়র পর্যন্ত মনে করতেন শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া মূলতঃ ফুসফুসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাস্তবিকপক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ফুসফুস

২০ The Vedanta Philosophy and the Science of Breath, *Complete Works of S. Abhedananda* Vol III, P 69

ছাড়াও দেহের অন্যত্র ঘটে থাকে। এই তত্ত্বও অভেদানন্দের অজ্ঞাত ছিল না। প্রাণের শক্তির কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি এ বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন মূল বক্তব্যকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্যে। তাঁর ভাষায়,[২১]

> 'Modern physiology tells us that blood is nothing but a vehicle to carry oxygen in the oxy-hœmoglobin throughout the system in the cells, tissues and organs of the body ; and the organic combustion does not take place in the lungs only, but also in the cells and the tissues themselves. The oxygen invigorates and strenthens every part of the body, and helps in digesting the food by producing chemical changes in the food ; and those who suffer from indigestion and poor digestion, will find that their system lacks in proper supply of oxygen and, if they can get proper supply of oxygen into system, they will be free from all such troubles of digestion.'

অক্সিজেন ও রক্তের লোহিতকণিকার সংমিশ্রিত আকারের নাম Oxy-haemoglobin। কিন্তু এই সংমিশ্রণের ফল স্থায়ী হতে চায় না, যেহেতু অক্সিজেন অল্পকাল পরেই এই সংযোগ থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থিকলাতে (tissue) ও রক্তবাহী নাড়ীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে পড়ে এবং শরীরের প্রত্যেকটি কোষে তার এই সঞ্চরণের ফল দেখা দেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে দেহের 'ক্রিয়ার' ব্যাপারে রক্তধারা একটি প্রবাহমাত্র।

এমনিভাবে একের পর এক শারীরবিজ্ঞানের বহু বিষয় গভীর ভাবে আলোচনা ক'রে অভেদানন্দ তাঁর শ্রোতাদের নিয়ে গেছেন প্রাণায়ামের মূলতত্ত্বে। এ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

যোগশাস্ত্রে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার উল্লেখ প্রায়ই আছে। সুষুম্নাকে অনেক সাধক শূন্য নালী মনে করেছেন। অভেদানন্দ তা করেন নি। তিনি বলেছেন, এর মধ্যে fluid substance বা তরল পদার্থ আছে। শারীরবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করতে গেলে শেষোক্ত ধারণাটি আধুনিক।

---

২১ The Value of Correct Breathing, ibid, P 53-54.

মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্র থেকে ও গতি উৎপাদক স্নায়ুরাশি বের হয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী অনুভবকারী ও গতি-উৎপাদক স্নায়ুগুলি আছে বলেই সংবেদন ও দেহের প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগের অনুভবের কার্য ও চলাচল ক্রিয়া ঘটে ওঠা সম্ভব হয়। মস্তিষ্ক থেকে দুটি স্নায়ুপ্রবাহ স্নায়ুরাশি ও মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে। মেরুদণ্ড ও মেরুরাশির ভিতর দিয়ে এদের মধ্যে একটি মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসছে, অপরটি আবার মস্তিষ্কের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। এদের একটিকে অন্তর্বাহী (afferent) আর অন্যটিকে বহির্মুখী (efferent) বলে। সংস্কৃত ভাষায় এদের নাম ঈড়া ও পিংগলা।

এরা যথাক্রমে মেরুদণ্ডের বাম ও ডান দিক থেকে প্রবাহিত হয় এবং এভাবে প্রাণশক্তি প্রবাহিত হবার দুটি পথ আছে, স্নায়ুর সমস্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়। অতএব যদি কোন ব্যক্তি প্রাণকে আয়ত্তে আনতে চান তাহলে প্রাণ যেখানে প্রধানতঃ থেকে নিজের কাজ করে সেই স্থানকে নিয়ন্ত্রিত করবার কৌশলপ্রণালী তাঁকে আগে শিখতে হবে।

যোগশাস্ত্র অনুসারে দেহ ও মনের কার্যনির্বাহক শক্তিকেন্দ্র ছ'টি। ছ'টি শক্তিকেন্দ্রের প্রধান কেন্দ্রটি বক্ষগহ্বরে (thorax) ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। এখানেই শ্বাসপ্রশ্বাসের মূল-কেন্দ্র। সংস্কৃত ভাষায় এর নাম 'অনাহত'। এর দ্বারাই ফুসফুসের গতি উৎপন্ন হয়। যদি এই মূলশক্তি কেন্দ্র বিশৃংখল হ'য়ে পড়ে বা স্বাভাবিকভাবে তার কাজ করতে না পারে তাহলে তার অধীন শক্তিকেন্দ্রগুলি আর দেহের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগে আনুসংগিক বিকৃতি দেখা দেবে। তারই ফলে শরীরে ব্যাধি, অংগ-প্রত্যংগে নানাধরণের যন্ত্রণা বা বহুকাল ধ'রে অস্বাস্থ্যের সূচনা করবে। প্রাণশক্তি অব্যাহত থাকলে ফুস্‌ফুসের শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক স্বাভাবিক নিয়মেই চলতে থাকবে। সুতরাং কোন যোগী স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে আয়ত্তে আনতে চাইলে তাঁকে প্রথমেই শ্বাস-প্রশ্বাসকে জয় করতে হবে। প্রাণায়াম-অভ্যাসের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে ফুস্‌ফুসের কাজ ও গতি এবং দেহের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র ঠিকভাবে চালাতে পারা যায়।

এবারে শারীর-বিজ্ঞানের মতে সুষুম্না সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। শারীর বিজ্ঞানে সুষুম্না শীর্ষক (Medulla Oblongata) এবং সুষুম্নাকাণ্ড (spinal

cord) এর কথা আছে। সুষুম্নাকাণ্ডটি নলাকৃতির। মেরু মধ্যস্থ নলাকার প্রণালীতে এটি দড়ির মত বস্তি প্রদেশ পর্যন্ত নেমে গিয়ে অতি সরু লাঙ্গুলান্তে (Filum terminale) শেষ হয়েছে। এটি প্রায় ষোল ইঞ্চি লম্বা। চওড়াতে আঙ্গুলের মত। মাথার নীচে শরীর সমস্ত অংশ থেকে স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ, ইত্যাদি সংবেদীয় অনুভূতি, 'পেশী কণ্ডরা' অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী হতে অঙ্গবিন্যাস-সংশ্লিষ্ট অসংজ্ঞ পেশীর অনুভূতির কেন্দ্রাংশে বহন, চেষ্টীয় কেন্দ্রকোষের সাহায্যে পেশীর সঙ্কোচন এবং চেষ্টীয় তন্তুর ঊর্ধ্বভাগের সাহায্যে এদের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণক্রিয়া সুষুম্নাকাণ্ড সমাধা করে। তাছাড়া—[২২]

> 'সহযোগী শ্বসনকেন্দ্র ও নিম্নধমণী সঙ্কোচক কেন্দ্র থাকাতে সময় সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্ত চলাচলের নিয়ন্ত্রণও এর দ্বারা হতে পারে। সমব্যথী স্নায়ুর উৎপত্তিস্থল ব'লে তারা রন্ধ্রের বিস্ফারণ, লালার ক্ষরণ, হৃদস্পন্দনের গতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিকোচন, রক্তপ্রণালীর সঙ্কোচন, অ্যাড্রিনালিনের ক্ষরণ, প্রভৃতিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এতদ্ব্যতীত মল ও মূত্র ত্যাগ, সন্তান প্রসব এবং হাঁটুর ঝাঁকানি প্রভৃতির কেন্দ্রও সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্নভাগে অবস্থিত।'

যোগীরা মনে করেন; সবচেয়ে নীচে মূলাধার থেকে সুরু ক'রে মস্তিষ্কে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত কতগুলি কেন্দ্র আছে। বিবেকানন্দ বলেছেন ঐ পদ্মগুলিকে স্নায়ুজাল বা plexus বলা যেতে পারে।

যোগীরা সাতটি চক্রের কথা বলেছেন। তান্ত্রিকেরাও তা অনুসরণ করেন। নীচ থেকে উপরের দিকে চক্রগুলি হ'লো'

প্রথম—মূলাধার [মেরুদণ্ডের নীচে]
দ্বিতীয়—স্বাধিষ্ঠান [উদরের নীচে]
তৃতীয়—মণিপুর [নাভিদেশে]
চতুর্থ—অনাহত [বক্ষে বা হৃদয়ে]
পঞ্চম—বিশুদ্ধ [কণ্ঠে]
ষষ্ঠ—আজ্ঞাচক্র [ভ্রু-দ্বয়ের মধ্যে]
সপ্তম—সহস্রার [মস্তকে]

এই সব চক্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে,

২২ ডঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, শারীর বৃত্ত
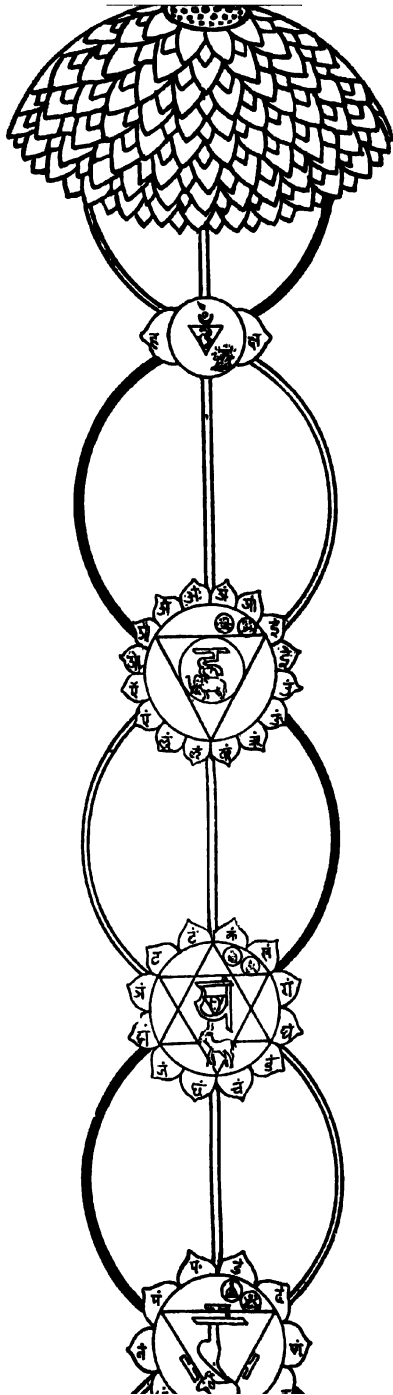
(১) মূলাধারচক্র—এটি হ'ল স্যাক্রো কক্ফিসজিয়াল প্লেক্‌সাস (Sacro-coccygeal Plexus)। এর চারটি শাখা আছে। সৌরচক্র (Solar Plexus, কাণ্ড, ব্রহ্মগ্রন্থি) থেকে এগার আঙ্গুল (প্রায় নয় ইঞ্চি) নীচে।

(২) স্বাধিষ্ঠানচক্র—একে স্যাক্রাল প্লেক্‌সাস (Sacral Plexus) বলা যেতে পারে। এর ছ'টি শাখা। বৌন উত্তেজনা, যৌন বোধ, সেই সঙ্গে অবসাদ, অসাড়তা, নিষ্ঠুরতা, সন্দেহ প্রবণতা, ঘৃণা প্রভৃতির কেন্দ্র এখানে।

(৩) মণিপুরচক্র—এই চক্রের কথা বলার আগে প্রথমে নাভিকাণ্ডের কথা বলা দরকার। নাভিকাণ্ড সৌরগ্রন্থি বা ভানুভবনের অনুসারি (corresponding)। ডান ও বাম সমবেদী স্নায়ুর শৃংখলের (পিঙ্গলা বা ঈড়া) সঙ্গে সেরিব্রো-স্পাইনাল অক্ষের সংযোগ সাধন করে। এরই সঙ্গে সংযুক্ত হ'লো মণিপুর চক্র। এটি লাম্বার প্লেক্সাস (Lumber Plexus)। তৎসহ সংযোগকারী সমবেদী স্নায়ু। এর দশটি শাখা—নিদ্রা, তৃষ্ণা, ঈর্ষ্যা, লজ্জা, ভয়, নিশ্চলতা ইত্যাদি প্রকাশের উৎস।

(৪) অনাহতচক্র—সমবেদী স্নায়ু-শৃংখলের 'কার্ডিয়াক প্লেক্সাস' (Cardiac Plexus। এর বারোটি শাখা হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। এগুলি অহংবোধ, আশা, উদ্বেগ, সন্দেহ, প্রবঞ্চনা, অস্মিতা প্রভৃতি প্রকাশ করে।

(৫) বিশুদ্ধচক্র—একে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ভারতীস্থান—মেডালা অবলংগেটার (Medulla Oblongata) সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের সংযোগস্থল। এটি কয়েক ধরণের স্নায়ুর সাহায্যে (যেমন 'নিউমোগ্যাস্ট্রিক')—এদের সাহায্যে ল্যারিংস এবং সন্নিহিত কয়েকটি যন্ত্রকে (organ) নিয়ন্ত্রিত করে।

(খ) লালনাচক্র—আলজিভের বিপরীত দিকে। এর বারোটি পত্র (leaves) আছে। অহংবোধ, আত্মশ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভাবপ্রবণতা, অহংকার, দুঃখ, অনুশোচনা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, তৃপ্তি, প্রভৃতি অনুভূতি সৃজিত হওয়ার কেন্দ্র।

(৬) আজ্ঞাচক্র—আজ্ঞাচক্র ও মানসচক্র হ'লো sensory-motor tract। আজ্ঞাচক্র দু'টি ভাগে (lobe) বিভক্ত। এখান থেকে যাবতীয় অঙ্গ চালনা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানসচক্রের (the sensorium) ছ'টি অংশ। পাঁচটি হ'লো বিশেষ

সংবেদী (sensory) স্নায়ু—অনুভূতির জন্য। একটি স্বপ্ন, দৃষ্টিভ্রম ব হ্যালুসিনেশন ইত্যাদির কেন্দ্র।

একই সঙ্গে আরো একটি চক্রের কথা বলবো। তা হ'লো সোমচক্র ষোলটি ভাগ বিশিষ্ট গ্যাংলিযন। সেনসোরিযামেব উপরে গুরুমস্তিষ্ক ব সেরিব্রামের মধ্যভাগের কেন্দ্রসমূহ রচনা বরে। করুণা, ভদ্রতা, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য আগ্রহ, দৃঢতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উৎসস্থল।

(৭) সহস্রারচক্র—সহস্রদল বিশিষ্ট। ভাগ ও ভাঁজ (convolution) সমেত গুরুমস্তিষ্কের উপর দিক। জীব বা জীবাত্মার বিশেষ ও সর্বোচ্চ আসন।

বিজ্ঞানী সার জেমস্ জীনস্ তাঁর 'Physics and Philosophy' গ্রন্থে দেশ ও কালের পরিচয় দিয়েছেন এমনিভাবে, [২৩]

> '...Space is merely the arrangement of things that co-exist and time the arrangement of things that succeed one another.'

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দূরত্ব, নৈকট্য, ঘনত্ব ইত্যাদি দিযে আমরা 'দেশ'কে প্রত্যক্ষ করি 'কাল'-এর প্রত্যক্ষ হয বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন বিকাশের মধ্যে দিযে। বিদেশে দার্শনিক-বিজ্ঞানীরা দেশকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন—[২৪]

> 'Sensational space, perceptual space, conceptual space, mathematical space, space as a category of physical science.'
>
> [সংবেদনমূলক, প্রত্যয মূলক, মানসিক, গণিতমূলক জড়বিজ্ঞানের উপাদানমূলক]

দেশ ও কালকে চরম সত্য বলে স্বীকার করা হয় না। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বক্তব্যকে সমর্থনের জন্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের গবেষণাব বিষযের সাহায্য নিযেছেন :

> 'বিজ্ঞানেও দেশ ও কালকে চরম সত্য ব'লে স্বীকার করা হয না। অধ্যাপক ম্যাক্স প্লাঙ্ক, স্যার জেমস্ জীনস্, মনীষী আইনস্টাইন, এডিংটন-প্রমুখ বিদগ্ধ বিজ্ঞানীরা দেশ ও কাল সম্বন্ধে ঠিক একমত। মনীষী আইনস্টাইন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'থিয়োরী অব্ রিলেটিভিটি' বা আপেক্ষিকতত্ত্বের মারফতে

২৩ *Physics And Philosophy* (1943), p 50

২৪ ibid p 55-58

প্রমাণ করেছেন যে দেশ ও কাল দুটি আলাদা জিনিস নয়, যার নাম দেশ, তারই নাম কাল ; আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন ব'লে একই জিনিসকে এক অবস্থায় 'দেশ' ও আর এক অবস্থায় 'কাল' ব'লে মনে করি। কালের প্রবাহ থাকে দেশের মধ্যে এবং দেশের সমনিয়ততা থাকে কালের মধ্যে। দেশ-কালের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এতদিন ছিল তিনটি পরিমাণ বিশিষ্ট গতিহীন বস্তু, আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন তাকে পরিমাণ-চতুষ্টয় বিশিষ্ট গতিচঞ্চল ব'লে। সময়কে তিনি মায়া বলেছেন, বেদান্তে 'মায়া' শব্দের ব্যবহার প্রচুর। এ জগৎকে মায়ার শিকলে বেঁধে স্রষ্টা নানা খেলা খেলছেন এমনি নানা কথা শুনতে পাওয়া যায়। মায়ার সত্তা প্রধাণতঃ দু'রকমের—ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক বা প্রাতীতিক। পার্থিব বিষয়-মাত্রেই 'তৎক্ষণাৎ কাজের' ব্যবহারোপযোগী হয় ব'লে আমরা পৃথিবীর সব জিনিসকে ব্যবহারিক সৎ ব'লে থাকি। এই সত্তা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। আর প্রাতিভাসিক সত্তার ব্যবহারিক উপযোগীতা কিছুমাত্র নেই, মনে হয় এই মাত্র, যথার্থ নয়। এই সত্তা অজ্ঞান থাকার অবস্থাতেই 'যথার্থ বস্তু' দর্শনের পর নষ্ট হ'য়ে যায়। মায়া বা বিশ্বপ্রপঞ্চের এই দুটিমাত্র সত্তা আছে। পারমার্থিক সত্তা এর নেই। সাধকেরা বলেন, একমাত্র শুদ্ধ বা মায়ানির্মুক্ত ব্রহ্মেরই পারমার্থিক সত্তা আছে। তাহলে 'মায়া' কি? এ স্বামী অভেদানন্দ নিজেই প্রশ্ন করেছেন, 'কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—মায়া কি? মায়া কি নিছক প্রাতিভাসিক? না, মায়ার অর্থ আপেক্ষিক সত্তা, অর্থাৎ দেশ, কাল ও নিমিত্ত?'

স্বামী অভেদানন্দ 'দেশ, কাল ও নিমিত্তকে' বলেছেন 'মায়া' বা সৃষ্টি। 'দেশ' ও 'কাল' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,[২৫]

'আমাদের মনের গতি বা বৃত্তিগুলি ধারাবাহিক ভাবে অথবা একসাথে ছন্দায়িত ও প্রবাহিত হ'লে তাদের থেকে দেশ ও কালের ধারণা রূপায়িত হয়। ইমানুয়েল কাণ্ট এদের মনের অবস্থা বা 'চিন্তার আকার-বিশেষ'

---

২৫ (ক) *Doctrine of Karma*

(খ) *Path of Realization*

(গ) *True Psycology*

বলেছেন। আমাদের একটি চিন্তার পর আর একটি চিন্তা যখন মনে ওঠে তখনি একটি অপরটির মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে—তার নাম 'কাল', আর দুটি চিন্তা বা ধারণা একসঙ্গে মনের মধ্যে অভিব্যক্ত হলে বা একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করলে যে বিস্তৃতি বা ব্যবধানের সৃষ্টি হয়—তার নাম 'দেশ'। দেশ ও কাল সম্পূর্ণ আন্তর ভাবসামগ্রী, মনেই এদের উৎপত্তি, মনেই লয়'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, দেশ ও কাল উভয়েই গতিশীল। চলমানতা এদের ধর্ম, অতএব তা নিত্য ও অপরিবর্তনীয় একথা বলা চলে না। বেদান্ত বলে, এই 'চলমানতা' মায়ার নামান্তর মাত্র

স্বামী অভেদানন্দ যেমন অধ্যাত্মবস্তুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন ও প্রমাণ করেছেন ভারতের প্রাচীন ধর্ম বিজ্ঞান সম্মত ও ব্যাখ্যা করেছেন আধুনিক কালের ধর্ম কেমন হওয়া উচিত, তেমনি ক্রমবিকাশতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন পরিশীলিত বিজ্ঞানীর মতো। ভারতের প্রাচীনতম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তিনি ক্রমবিকাশ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোকে।

চার

॥ স্বামী অভেদানন্দ ও ক্রমবিবর্তনবাদ ॥

বিজ্ঞানের এক জটিল অধ্যায় বিবর্তনতত্ত্ব। ক্রমবিকাশ—অর্থাৎ ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে আরোহন। সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উন্নয়ন। ক্রমোন্নত বিকাশ। শুধু বিকাশ হলেই হবে না, তা হওয়া চাই সুশৃঙ্খল। কেবল মাত্র এককোষী প্রাণি থেকে মানুষ পর্যন্ত পৌঁছালেই চলবে না, এরই মধ্যে ক্রমবিকাশতত্ত্বের সবটুকু বলা শেষ হলো না। ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলছে ক্রমবিকাশের খেলা। আদিমতম কাল থেকে চলেছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার নানা ক্রিয়াকলাপ। তা যেমনি জটিল তেমনি বহুমত-কণ্টকিত।

স্বামী অভেদানন্দ এই বিশেষ দিকটি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন গভীর ভাবে। দার্শনিক অভেদানন্দ শুধু বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বকে অধ্যাত্মবোধ দিয়ে বিচার ক'রে তৃপ্ত হন নি, তিনি যদিও স্বীকার করেছেন বিশ্বসৃষ্টির মূলে পরমেশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছা প্রবলভাবে বর্তমান, তথাপি তিনি ক্রমবিকাশ-তত্ত্বকেই বিজ্ঞান ও যুক্তিসংগত ব'লে বিশ্বাস করতেন আন্তরিকভাবে। তিনি বলেছেন[১],

> 'This theory of evolution has opened our eyes to the truth that this world was not created six thousand years ago, but it is beginningless and endless, that it is eternal ?'

তাঁর রচনাবলী অনুসরণ করলে অনুভব করা যায় তিনি বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্বকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন এবং সেই সংগে একথাও বলেছেন কপিল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানের অনুপন্থী। তিনি বলেছেন, সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা নানা দেশের মানুষ নানাভাবে করেছেন, সেই সব ব্যাখ্যার মূলে ছিল তাঁদের নিজেদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস। আবার অধিকাংশ বিশ্বাসের মূল অনুসন্ধান করতে গেলে লক্ষ্য করা যায় যে তাঁরা 'ঈশ্বরের অলৌকিকী শক্তিকে' প্রাধান্য দিয়েছেন। মধ্যযুগে স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের সুযোগ বা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভংগীতে সব কিছু

---

১ Attitude of Vedanta towards Religion (1947). p. 102-103

বিচার ক'রে দেখার রীতি ছিল না। এই রীতি এলো অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের চিন্তাধারা বিকশিত হতে লাগলো বিজ্ঞানের কুসংস্কার বিমুক্ত পথ বেয়ে। ক্রমান্বয়ে মানুষ কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বিচার করতে শিখলো বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যকে। বলা যেতে পারে, ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্যখণ্ডে বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশতত্ত্ব প্রসার লাভ করলো। যদিও অষ্টাদশ শতকে কাণ্ট ও লাপ্লাস নিউটন-প্রবর্তিত নিয়মের সাহায্যে সৃষ্টির রহস্যজাল ভেদ করতে সচেষ্ট হলেন। লাপ্লাস দিলেন তাঁর সুবিখ্যাত নীহারিকাতত্ত্ব। স্বামী অভেদানন্দ এ প্রসঙ্গে বলেছেন[২]—

'লাপ্লাস তাঁর নীহারিকাতত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের যান্ত্রিক উপায়ে গঠন ও পরস্পর বিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যান করেছিলেন, তবু একথা ঠিক যে, ডারউইন ও আর্নেস্ট হেকেলের আগে পর্যন্ত অভিব্যক্তিবাদ ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে নি। অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশনীতিকে যথার্থভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ডারুইন ও হেকেলই…'

এখানে প্রথমেই হেকেল নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যাক। হেকেলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'লো 'কোষের মৌলিক ধারণা' নিয়ে। তবে ফ্রিৎজ মুলারকে (Fritz Muller) অনুসরণ ক'রে (অনুসরণ বললে ভুল বলা হবে, বরং তাঁর দেখাদেখি) হেকেল ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর একটি মতামত তৈরী করেছিলেন। তবে তাঁর কতগুলি ত্রুটি ছিল। সেগুলি হচ্ছে[৩]—

(ক) 'He failed to give full weight to the study of development

(খ) 'He failed to give full weight to the disturbing factor of the mechanical element in the process of development.

(গ) 'He failed to explain the dropping out of many stages and the modifications of other factors concerning many of which we are still in the dark.'

২ *Attitude of Vedanta towards Religion*, p 101-102

৩ Charles singer, : *History of Biology* (1959).

খন থেকেই প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা প্রায় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে কেবলমাত্র গুণতত্ত্বের সাহায্যে পর্যালোচনা করলে পৃথিবীর বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণির উদ্ভব সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ডারউইনের 'অরিজিন অব দি স্পিসিস্' গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার ক্রমবিকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। গবেষকেরা মনে করেন নীচু প্রাণি থেকে উঁচু প্রাণির বিকাশের কথা ('general process of production of higher from lower forms') তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন। যদিও বিজ্ঞানী লাইয়েল (Lyell) এরও প্রায় কুড়ি বছর আগে ক্ষুদ্রতর অর্থে ঐ বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।
অর্থাৎ ডারউইনের আগেও কতিপয় বিজ্ঞানী ক্রমবিকাশতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করেছেন যদিও ডারউইনের বক্তব্য তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

ঋগ্বেদ ও উপনিষদে ক্রমবিকাশের ধারা-সম্পর্কে বক্তব্যের কথা উল্লেখ ক'রে অভেদানন্দ বলেছেন, ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে সাংখ্যকার কপিলই সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খলভাবে ও বৈজ্ঞানিকভিত্তির উপর সৃষ্টিক্রমের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রীক দার্শনিক ও নব্য-প্লেটোবাদীরাও সাংখ্যীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন :

> 'In this Sankhya system it is most startling to find that its ultimate conclusion harmonize and coincide with those of modern science.' ৪

ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে আসছিলেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। ডারউইন, লামার্ক, মেণ্ডেল, হাক্সলি, হলডেন, সার্ডিন, সিম্পসন সকলেই নিজ চিন্তার মৌলিকতত্বে আস্থাশীল।

ঋগ্বেদ, উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবতে ক্রমবিকাশের কথা আলোচিত হয়েছে। এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন।

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে, জীব চার শ্রেণীর। যেমন—'অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ—অশ্বাগাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্।' (৩।১।৩)

মূলকথা জীব চার রকমের—অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বেদজের স্থান নেই। সেখানে জীব তিন শ্রেণীর,

৪ *Cf. Cosmic Evolution and Its Purpose.* p 5

'তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি' (৬।৩।১) অর্থাৎ জীব তিন প্রকারের—অণ্ডজ, জীবজ, উদ্ভিজ্জ।

বেদান্তসূত্রে (৩।১।২১) দুটির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। বেদান্তসূত্রে স্বেদজকে উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টিকার্যে পুরোপুরি ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে,

সৃষ্টা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদংশমৎস্যান

তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপদেবঃ।

অর্থাৎ ভগবান পরমেশ্বর নিজশক্তি প্রকৃতির দ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, দংশ ও মৎস্য প্রভৃতি বিবিধ জীবশরীর সৃষ্টি ক'রে সেই সেই শরীরের দ্বারা সন্তুষ্ট হ'তে না পেরে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বুদ্ধি সম্পন্ন মানবশরীর সৃষ্টি ক'রে সন্তোষলাভ করেছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন—যখন কোন আদিম মানব তার চার পাশে তুষারাবৃত বিশাল পর্বতরাজি প্রত্যক্ষ করলো, এবং দেখতে পেলো তার মাথার উপরে নীল আকাশের চাঁদোয়া, যখন দেখলো পাহাড়ে বরফ গলে জল হয়ে সেই স্রোতধারা নদীর আকারে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে অথবা যখন ফুলে-ফলে পরিশোভিত উদ্যানের শোভা দেখে বিমুগ্ধ তখন থেকেই নিশ্চয় সেই প্রাচীন মানবের অপরিণত মস্তিষ্কে প্রশ্ন জেগেছে প্রকৃতি সম্বন্ধে। সমগ্র প্রাণিজগতের মধ্যে এই জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়েছে কেবলমাত্র মানব মনে। পৃথিবীর প্রাচীনতম শাস্ত্র গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই ধরণের প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে। বৈদিক কবির বারে বারে প্রশ্ন তুলেছেন আপন মনে—'কোথায় এর আদি?' 'আমি' কে? 'কোথা থেকে সৃষ্ট হয়েছে পৃথিবী ও আকাশ?' 'কেমন ক'রে আরম্ভ হ'লো সৃষ্টি এবং কে এই রহস্যের কথা জানেন?' এই ধরণের প্রশ্ন আজও কি বিজ্ঞানীর দার্শনিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে না?

বিজ্ঞানের মতে এই পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা বা বস্তু বিবর্তনের প্রক্রিয়া মেনে চলে। বৃহৎ সৌরজগৎ থেকে শুরু ক'রে ছোট্ট ঘাসের ডগাটি পর্যন্ত যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সবই বিবর্তনের ফলশ্রুতি মাত্র। ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফলে জন্ম নিয়েছে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, উপগ্রহ এবং অপরাপর গ্রহসকল। তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও। স্বামী অভেদানন্দ বিশ্বাস করতেন[৫]—

৫ Evolution and Reincarnation. p. 49

'...that man did not come into existence all of a sudden, but is relat?d to lower animals and to plants, either directly or indirectly. The germ of life had passed through various stages of physical form before it could appear as a man.'

(...মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে আকস্মিকভাবে আসে নি, মানবরূপে জন্মগ্রহণের আগে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে নিম্নশ্রেণীর জন্তুজানোয়ার ও উদ্ভিদাদির সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল। প্রাণের বীজ মানবরূপে জন্মগ্রহণের আগে নানা ধরণের শরীর ধারণ করেছে।)

ভ্রূণতত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি যে মানব হচ্ছে সকল সৃষ্টির সার। ('Man is the epitome of the whole creation')।

আধুনিক বিবর্তনতত্ত্বকে মেনে নিয়ে অভেদানন্দ বলেছেন—

'human body before its birth passes through all the different stages of the animal kingdom—such as polyp, fish, reptile, dog, ape and at last man.'

ডারউইন বলেছেন লক্ষ লক্ষ জন্মের স্রোতের ভিতর দিয়ে জীবকোষকে চলে আসতে হয়েছে। কত অবস্থার বিপর্যয়ে কত পরিবর্তন তাকে আঘাত করেছে ইয়ত্তা নেই। তবু নানাবিধ পার্থক্য সত্ত্বেও জীবকোষের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে এবং সে তার জীবনীক্রিয়ার একটি অখণ্ড সংস্কারও বয়ে নিয়ে চলেছে। অভিব্যক্তি বাদ সম্পর্কে স্যামুয়েল বাটলার মন্তব্য করেছেন—

'I suppose, that the fish of fifty million years back and the man of to day are one single living being in the same sense or very nearly so, as the octo genarvan is one single tining being with the infant from which he has grown.'

ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় বহু কোটি বছর আগে আমেরিকার উত্তরাংশে বিরাট আকারের সরীসৃপ জাতীয় জীবের সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য এটি পণ্ডিতদের অনুমান মাত্র। এদের মধ্যে দুজাতের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তারা ছিল অত্যন্ত কুৎসিৎ দর্শন। নাম Pareia awrus baini। কিন্তু এদের কথা আগে থাক। ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করা যাক। প্রাচীনতম মহাযুগ বা আর্কিওজোয়েক এরা (Archaeozoic Era)

শেষ হয়েছে ১১০ কোটি বছর আগে। আরো কত কোটি বছর আগে এর আরম্ভ হয়েছিল তা ধারণা করা শক্ত। এই মহাযুগের বিষয় সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তবে বিজ্ঞানীরা বলেন অ্যামিবা, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি এককোষী প্রাণী, অ্যাল্‌জি, স্পঞ্জ তখন জন্মেছিল। প্রোটারজোইক মহাযুগে এ ছাড়া নতুন কোন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় না। তারপরে দীর্ঘদিন পৃথিবী তুষারাচ্ছন্ন ছিল। হয়তো তার জন্যে বিবর্তন বাধা পায়। এই দুই মহাযুগে পৃথিবীর আবহাওয়া ছিল জীবের প্রাণ ধারণের প্রতিকূল। এদের কোন ফসিল পাওয়া যায় না। এর হয়তো একটা কারণ আছে। আগে সমুদ্রের জলে চুনের অভাব ছিল—তার জন্যে সে সময়কার প্রাণীদের দেহের হাড় বা খোলস শক্ত হতে পারে নি। যাই হোক প্যালিও জোইক মহাযুগে এসে জীবজন্তুর বাহুল্য দেখা যায়। অ্যাল্‌জি নামে এক ধরণের শ্যাওলাকে ভূতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাশ ব'লে চিহ্নিত করেন, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে এই যুগের পাহাড়ে।

প্যালিয়োজাইক মহাযুগে শামুকের মতো শক্ত আবরণওয়ালা জীবের চিহ্ন পাওয়া গেল প্রথম। সামুদ্রিক ঘাস দেখা যায় তখন। এই মহাযুগের গোড়ার দিকে ক্যামব্রিয়ান যুগকে ট্রাইবোলাইটদের (Tribolite) যুগ বলা যেতে পারে। এ সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে জেলিফিশ্‌ এবং নানা জাতীয় জলজীব জন্মেছে। অর্ডোভিসিয়ান যুগে ট্রাইবোলাইটদের জায়গা নিয়েছে ইউরিপ্‌-টেরিডস্‌। কাঁকড়া বিছে ও মাকড়সার আদিপুরুষ এরা। এই মহাযুগের শেষ প্রান্তে সিলুরিয়ান যুগে (৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে) মাছের চিহ্ন প্রথম দেখা যায়। সে সময়কার মাছের কাঁটা, চোয়াল শক্ত হয় নি। এ সময় থেকেই প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমবিবর্তনের বেশ বড়ো এক ধাপ এগিয়ে এলো। ডাঙায় বসবাসকারী মেরুদণ্ডী জন্তু জন্ম নিতে আরো কয়েক যুগ লেগেছিল।

এ পর্যন্ত পৃথিবী জলময় ছিল, খুব বেশি ডাঙা সৃষ্টি হয় নি। ধীরে ধীরে জমি উঁচু হয়ে বিস্তৃত হলো। কিন্তু প্রাণের কোন স্পর্শ নেই। একেবারে মরুভূমি। স্থলে গাছপালা শুরু হ'লো সামুদ্রিক ঘাস বিবর্তিত হয়ে। জল সরে গেলে সামুদ্রিক ঘাসের শিকড় গজানো, কাণ্ড শক্ত হলো, ক্রমান্বয়ে বল্কল সৃষ্টি হয়ে ডাঙায় উপযোগী ক'রে তুললো। ডেভোনিয়ান যুগের (৩২০

মিলিয়ন বছর আগে) আদিতে রাইনিয়া (Rhynia) হর্নিয়া (Hornea)
ত্যাদি কয়েক ধরণের উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের ফার্ন, মস্ এবং
জির সম্মিলিত রূপ বলা যেতে পারে। গাছের পাতা তখনও হয় নি।
ই যুগের প্রান্তভাগে পূর্ণাঙ্গ গাছ ক্রমশ তৈরী হলো। উদ্ভিদের খুব বেশি
স্তার দেখা যায় কার্বনিফেরাস কয়লার যুগে (২৭৫ মিলিয়ন বছর আগে)।
ই সময় পৃথিবীতে জীবের প্রাণধারণের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে।

ডাঙার জন্তু খুব সম্ভবতঃ মাছ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। জল যত শুকিয়ে
তে লাগলো মাছেরা চেষ্টা করলো স্থলে থাকবার মতো উপযুক্ত হতে।
াছের পাখনা রূপান্তরিত হলো পায়ে, অপরিণত ফুস্ফুস্ শ্বাস নেবার
পযোগী হতে লাগলো। কয়লা-যুগের শেষভাগে মাছ থেকে পুরোপুরি
াদ জন্তুর সৃষ্টি হয়েছে। তখন মাছ ছিল আমিষভোজী, তাই চতুষ্পদ
ন্তুর মধ্যে সেই ধারা বর্তমান ছিল। এদের মধ্যে যারা শীঘ্র 'উদ্ভিজ্জাশী'
ত পারলো এর পরবর্তী যুগে তাদেরই মধ্যে দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

এই সময়ে যে সব জন্তু জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে সরীসৃপ প্রধান। এদের
ক্রম-উন্নতি হয় মেসোজোইক মহাযুগে। এরা তখন টিকটিকি, গিরগিটির
তো ছোট নয়—প্রকাণ্ড আকারের। ডাইনোসর, ইগুয়ানোডন, আর্কিও-
প্টেরিক্স প্রভৃতি অতিকায় জন্তুর আবির্ভাব ঘটলো।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, আর্কিয়োপটেরিক্স থেকে পাখির সৃষ্টি হয়েছে।
গোড়ার দিকে পাখিরা ঠিক উড়তে পারতো না। ক্রমে শরীর হাল্কা হলো,
া বড়ো হলো এবং ওড়বার ক্ষমতা হলো।

কয়লার যুগে গাছ অনেক ছিল, কিন্তু ক্রিটেশ্যাস যুগে (১৪০ মিলিয়ন
র আগে) প্রথম দেখা দিল সপুষ্পক উদ্ভিদ, গাছে ফুল এল। কীট-পতঙ্গের
বধে হলো, মৌমাছি প্রজাপতি ইত্যাদি নানা শ্রেণীর পোকামাকড়ের সৃষ্টি
লা। ডাইনোসরের মতো অতিকায় জন্তুরা শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য
রে ধীরে লোপ পেল। আজ থেকে প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে স্তন্যপায়ী
ীবের দর্শন পাওয়া গেল। বাঘ, সিংহ, গরু, ঘোড়া, ছাগল, কুকুর, মোষ,
ড়াল সবাই স্তন্যপায়ী জীব। সেই প্রাচীন স্তন্যপায়ী জীবের সঙ্গে বর্তমানের
ন্যপায়ী জীবের আকারে যথেষ্ট মিল আছে।

সেনোজোইক মহাযুগে (Cenozoic Era—৩০ থেকে ৫৭ লক্ষ বছর আগে)

প্রথম দিকে জন্ম হ'লো বানরের। দশ লক্ষ বছর আগে বনমানুষের আবির্ভা
ঘটে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এদের দৈহিক পরিবর্তন হ'তে হ'তে আধুনিব
প্লিস্টোসিন যুগে মানুষের আবির্ভাব। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে
পৃথিবীতে একধরণের জীবের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হয়েছে। তাদের
প্রকৃত মানুষ বলে অনুমান করা হয়েছে। তারা আগুনের ব্যবহার জানতো
শীত এবং বন্যজন্তুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারতো। এই হচ্ছে
ক্রমবিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। বিবর্তনের ধারা থেমে থাকে নি। ত
ক্রমশ চলছে। এমনি ভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে জন্ম নিয়েছে মানুষ
স্বামী অভেদানন্দ ক্রমবিবর্তনের এই ধারা-সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন
কেমন ক'রে মৃত্যু হয় তা নিয়ে হাজার হাজার বছর ধ'রে মানুষ ভয়মিশ্রিত চিন্ত
বা কল্পনা ক'রে এসেছে। কেমন ক'রে 'জীবন' সম্ভবপর? ধর্ম নানা ব্যাখ্যা
দিয়েছে। মধ্যযুগে যাঁরা ধর্মের সেই ব্যাখ্যা মানতে রাজী হন নি তাদে
ভাগ্যে জুটেছে নিষ্ঠুর মৃত্যু। যখন আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি বেশ সুদৃ
হয়ে উঠলো, তখনই মানুষ জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে 'সত্য' জানতে নিমগ্ন হলো
ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'বুলি'কে অস্বীকার করার সাহস পেল। অবশেষে পাওয়া
গেল কি ক'রে মৃত্যু জীবনকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু ধ্বংস করা সহজ, যেমনি
জীবন গড়া শক্ত। পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের বা ক্রমাগত সৃষ্টির জগতে
'প্রাণের' সৃষ্টি এক বিস্ময়কর ঘটনা। নানা ধরণের বিপরীত-ধর্মী উপাদান
নিয়ে গঠিত পৃথিবীর বিশাল সৃষ্টিভাণ্ডারে সজীব 'প্রাণ' সৃষ্টি এক অভিন
ব্যাপার।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্যালোক রূপান্তরিত হয় তাপে। তাপ রূপান্তরিত
হয় বিপুল শক্তিতে। 'জীবন' বা 'প্রাণ' প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই শক্তি
সংগে জড়িত। আবার বিজ্ঞান বলে, কোন কৃষ্ণকায় বস্তু দিনের আলো
নৈপুণ্যের সংগে তাপে পরিণত করতে পারে,—এতে 'এনট্রোপি' (entro
বেড়ে যায়। ফলে 'সৃষ্টি' 'দূর অস্তু' হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে অবশ্যই
কোন 'সুনিয়ন্ত্রিত' এবং 'সুপরিচালক' 'অনুশাসন' বা 'নিয়ম' আছে
ক্ষমতাবলে বিশৃংখলায় ভরা অজৈব পৃথিবীতে সুশৃংখল 'প্রাণের' স
সম্ভব, এবং এই নিয়ম কিংবা অনুশাসন কেবলমাত্র জীবন্ত বা প্রাণবন্ত ব
ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য, আর কোথাও নয়। এই 'নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি' মৃত্যুর

সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে যায়। আধুনিক মানুষ তার গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফলে জেনেছে যে 'প্রাণের' সাহায্যেই প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে।

দেহ-মনের সমস্যার (কেমন ক'রে জীবন্ত বস্তুতে চৈতন্যের সঞ্চার হলো) সঙ্গে জড়িত হয়ে যুক্তি-তর্কের জটাজাল 'জীবন কি' এই সমস্যার রহস্যকে অধিকতর রহস্যমণ্ডিত ক'রে তুললো। মনীষী সি. পি. স্নো (C. P. Snow) (১৯৫৯) একটি সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন,

'It isn't easy to pick up the tone of the scientific experience at second hand. The most intelligent and respective non-scientists, with all the good in the world, find it pretty difficult.'

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মস্কোতে 'পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে জীবন সৃষ্টি সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি কথা বলা হয়েছিল:

'Real perspective for the solution of the problem of the origins of life have been opened up for natural science by the method of dialectic materialism, which views life as a special form of matter in motion arising at a definite stage of the historic development of matter.'

কাণ্ট, গ্যেটে, হামবোল্ট এবং আরো কতিপয় প্রাক্-ডারুইন বিজ্ঞানী, টিণ্ডাল, টমাস হাক্সলি এবং ডারুইন-পরবর্তী বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা সকলেই 'ডায়ালেকটি-ক্যাল মেটেরিয়ালিষ্ট' ছিলেন না, অথচ আমাদের সময়ের বহু আগে তাঁরা জীবনের রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হয়েছিলেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অধিবাসীদের একটি বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে, যেমনি দাবা খেলোয়াড় তার খেলার প্রতিটি পদক্ষেপকে যুক্তির দ্বারা সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যেসব নিয়মাবলী ব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করছে আমরা তার উর্ধে বা পশ্চাতে যেতে পারি না—যদিও আমাদের দৈবী ঘটনা-সম্পর্কে চিন্তা করবার প্রবণতা আছে। সমস্ত নিয়মাবলী জানা যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানীরা অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যুক্তি—কেবলমাত্র যুক্তির সাহায্যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মাবলী অনুভব করতে সক্ষম হবো।

এই কথা মনে রেখে বায়োলজিস্ট দু'ধরণের সমাধানে উপনীত হবার চেষ্ট করেন। তিনি হয় প্রমাণ করবেন যে জীবন (পরে মন) কোন সুশৃঙ্খল পন্থা বুদ্ধিগ্রাহ্য পথ ধরে সৃষ্ট হয়েছে, অথবা এর সৃষ্টি-রহস্য বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় কতদিন—কত যুগ কেটে যাবে এই রহস্যের সমাধানে তা কারো জানা নেই কিন্তু বিজ্ঞানীরা এগিয়ে চলেছেনই। তাঁরা একাগ্র মনে কাজ ক'রে যাবেন যাতে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা উজ্জ্বল দিনের সন্ধান পায়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি মানবতাবাদীরা বেশ বিরক্ত এ'কারণেই যে বিজ্ঞানীরা মনে করেন আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির জন্য কঠোর বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষারও প্রয়োজন, কেবলমাত্র 'চিন্তা'র সাহায্যে তা সম্ভব নয়[৬]। এ-বিষয়ে মতভেদ বর্তমান, এবং তা স্বাভাবিক। যেহেতু প্রাচ্যখণ্ডে মহর্ষি কপিল পতঞ্জলি ব্যবহারিক পরীক্ষার পদ্ধতি ছাড়াই জীবনের উৎপত্তি, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হামবোল্ট বলেছিলেন, কেবলমাত্র জৈব বস্তুই নয় যা ক্রমাগ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নতুন বস্তুর সৃষ্টি করছে, সমগ্র পৃথিবীটাই পরিবর্তিত হচ্ছে। এই কথার মধ্যে রয়েছে ক্রমবিবর্তন পন্থার অংকুর। ডারউইনের গবেষণার পরে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু সুসংবদ্ধ ধারণা করা সম্ভব হ'লো

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত পদার্থবিদ্ জন টিণ্ড্যাল তাঁর সুবিখ্যাত 'ফ্র্যাগ মেণ্টস্ অব সায়েন্স ফর আনসায়েণ্টিফিক পিপ্‌ল্' (Fragments of Scienc for Unscientific People) গ্রন্থে জীবন-সৃষ্টি সম্পর্কে যে কথা বলেছিলে তার থেকে অনেক বেশী কিছু আজ-পর্যন্ত বলা হয়েছে কিনা জানি না। তাঁ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি—

'[Darwin] placed at the root of life a primordial germ, fro which he conceived the amazing richness and variety of the life that now is upon the earth's surface might be deduced

---

৬ Alexander Von Humboldt '*Cosmos, Description of the Universe*' (N. 1850) গ্রন্থে বলেছেন : **'My intercourse with highly gifted men early led me t discover that, without an earnest striving to attain to a knowledge of speci branches of study, all attempts to give a grand and general view of t universe would be nothing more than a vain illusion.'**

If this hypothesis was true, it would not be final. The human imagination would infalliably look behind the germ, and, however hopeless the attempt, would enquire into the history of its genesis....A desire immediately arises to connect the present life of our planet with the past. We wish to know something of our remotest ancestry. On its first detachment from the central mass, life, as we understand it, could hardly have been present on the earth. How then did it come there ?...This leads us to gist of our present enquiry, which is this :—Does life belong to what we call or is it an independent principle inserted into matter at some suitable epoch—say when the physical conditions became such as to permit of the development of life ?...Our difficulty is not with the 'quantity' of the problem, but with its complexity ; and this difficulty might be met by the simple expansion of the faculties which we now possess.'

তারপর এলেন পাস্তুর ও মেণ্ডেল। আলোচনা ব্যাপকতর হলো। এমন কি দার্শনিকেরাও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা থেকে নিজেদের মনের খোরাক পেলেন। বি. মুর (B. Moore) তাঁর 'দি অরিজিন এণ্ড নেচার অব লাইফ' (The Origin and Nature of Life) গ্রন্থে বলেছেন,

যাঁরা মনে করেন যে জীবনের রহস্য সন্ধান করা ভ্রমাত্মক ঘটনা মাত্র, এতে কোন বাস্তব সিদ্ধি লাভ করা যায় না বা কোন বাস্তব সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না, তাঁরা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিব ইতিহাস স্বচ্ছ দৃষ্টির সাহায্যে পাঠ করেন নি। এই সমস্যাটি কেবলমাত্র দার্শনিকের নয়, বরং এর অনুসন্ধানের কাজে অনেক ব্যবহারিক পবীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন এবং বায়োলজিক্যাল গবেষণার সর্বোৎকৃষ্ট ফসল হলো জীবনের উৎপত্তির অনুসন্ধান···হয়ত জীবনের সৃষ্টি হযেছে এমন সব ঘটনার জন্যে যে সব ঘটনা আজও ঘটে চলেছে এবং নতুন নতুন প্রাণের সৃষ্টি হচ্ছে, যদিও পাস্তুর বেশ দৃঢ়তার সংগে প্রমাণ করেছেন জীবনের সৃষ্টি 'বিশেষ কোন' পথ ধরে হয় নি।

তথাপি একথা অস্বীকার করা চলে না যে 'জীবন' অন্য কোন পথ ধরে সৃষ্ট হয় নি। এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন আরো বিস্তৃত ও গভীর চিন্তা, মনঃসংযোজন এবং প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা'।

জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,[৭]

'Distribution is life and unification is death (বিস্তারই জীবন আর সংকোচ মৃত্যু)। Expansion-ই (বিস্তারই) জীবন আর contraction (সংকোচ) মৃত্যু। মনে কর, একজন কুমোর একতাল কাদা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ঘটী বাটি জিনিস তৈরী করলো। একেই distribution অথবা expansion (বিস্তার) বলে। Distribution (বিস্তার) মানে variation (বৈচিত্র্য)। একতাল কাদা ছিল, তা থেকে সৃষ্টি হলো হাঁড়ি, কলসী, গ্লাস প্রভৃতি। সেগুলো ভেঙে ফেলে তারা আবার একতাল কাদাতেই পরিণত হলো আর এটাই unification বা contraction (একত্রিত করা বা সংকোচ)। এই unification-ই death কিনা মৃত্যু।

Struggle for existence (জীবনসংগ্রাম) হোল life and satisfaction (নিশ্চেষ্টতা) death। যেমন তুমি বেঁচে আছ আর তার প্রমাণই you are fighting for life with your circumstances, surroundings বা environments (তুমি বাঁচার জন্য তোমার জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশের সংগে যুদ্ধ করছ)।

'Fighting (যুদ্ধ) মানেই struggle for expansion which is life (প্রসার বা জীবনের জন্য যুদ্ধ করছ যা জীবন)। প্রসার ও উন্নতির জন্য এই যে জীবন-সংগ্রাম এটাই তোমার existence এবং life-এর (সত্তা ও জীবনের) পরিচয়'।

ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব-সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র এই ক্রিয়া চলছে। জগতের মৌল বস্তু সমূহ তরল, বাষ্পীয় এবং কঠিন অবস্থার রূপান্তর গ্রহণ ক'রে চলছিল। তখনও গ্রহ বা মহাজাগতিক কোন স্থান উদ্ভিদ ও প্রাণী আবাসস্থল হয়ে ওঠে নি।

ক্রমবিবর্তনতত্ত্বকে সাগ্রহে স্বীকার ক'রে নিয়ে অভেদানন্দ বলেছেন, এ

৭ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ: তীর্থরেণু, পৃ ২৩৯-২৪০

রেের সাহায্যে আমরা সমগ্র মানবসমাজের উৎপত্তি এবং বর্তমান অবস্থাতে ৗঁছানোর বিষয়টি জানতে পারি। আমরা একথা বুঝতে পারি যে অতি- াকৃত কোন সত্তা 'বিশেষ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার' সাহায্যে মানুষ সৃষ্টি করেন নি। ং প্রাণের 'বীজ' কোন সুদূর অতীতে সুরু করেছিল তার যাত্রা, কখনও াণীরূপে, কখনও বা উদ্ভিদরূপে। কাজেই আমরা শূন্য থেকে অকস্মাৎ সৃষ্ট ইনি। এই দেহ লাভ করবার আগে এই প্রাণ নানা দেহকে আশ্রয় ক'রে ল। মৃত্যুর পরে এই দেহ বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু প্রাণের বীজ ধ্বংস ব না।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির কথা স্মরণ করলে ভাল হয়। যদিও াঁর ভাবনা বা উপলব্ধি কবিজনোচিত, তাহলেও তা বিজ্ঞানের চিন্তাধারার নুপন্থী। ১৮৯২ খ্রীণ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর কবি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা বীকে এক পত্রে লিখেছিলেন,

'এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকালের নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটু খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে, তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, বনশিশুর মতো একটা অন্ধ-জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলুম; এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটতো, এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা ক'রে বর্ষার মেঘ উঠত তখন ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করতো। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি...'।

আগেই বলা হয়েছে স্বামী অভেদানন্দের বিবর্তন প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে ধারণা বেদ ও সাংখ্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় অংশ এবং নিজে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা মিলিয়ে তৈরী হয়েছে। মহর্ষি কপিল সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশী অভেদানন্দ বলেছেন,

'প্রাচীন ভারতে ক্রমবিকাশতত্ত্বের জনক বলা যেতে পারে কপিল মুনিকে খৃস্টের জন্মের প্রায় ১৪০০ বছর আগে তাঁর জীবনকাল। তিনি ক্রমবিবর্তনতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় এবং অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে বিচ ক'রে গিয়েছেন'।

মহর্ষি কপিল সম্বন্ধে অধ্যাপক টমাস হাক্সলি এবং সার মনিয়ার উইলিয়মসে সশ্রদ্ধ মন্তব্য সংগ্রহ করেছেন স্বামী অভেদানন্দ। কপিল সম্বন্ধে তাঁর নিজ মতামত প্রকাশ করবার পর তিনি বলেছেন[৮],

'This fact was admitted by Prof. Thomas Huxley when h said that this doctrine [theory of evolution] was known t the Hindu sages long before Paul of Tarsus was born. We has it been said by Sir. Monier Monier Williams that th Hindus were spinozites more than two thousand years befo the existence of Spinoza ; Darwinians many centuries befo the doctrine of evolution had been accepted by the scientis of our time and before any word like evolution existed any language of the world.'

বহির্জগতে যেমন ক্রমবিকাশের স্তর আছে, তেমনি আছে মানুষের ভিতরে ক্রমোন্নতির ধারা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন প্রতিটি জ ক্রমবিকাশের সিঁড়ি বেয়ে নিম্নতর স্তর থেকে ক্রমাগত উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে ভিতর দিয়ে চরমলক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন,

'সৃষ্টি কিছু হঠাৎ হয় নি। উদ্ভিদ-জগৎ থেকে আরম্ভ ক'রে মানব-জ পর্যন্ত বিকাশের ক্রমোচ্চ ধারা দিয়ে ধীরে ধীরে সকলেই চরম মুক্তি দিকে অগ্রসর হচ্ছে ; প্রত্যেকেই একদিন না একদিন মুক্তিরূপ চরমলক্ষ্যে এসে পৌঁছবে'।

৮ Swami Abhedananda ; *Vedanta Philosophy*, pp. 29-30.

তাঁর নিজস্ব ভাষায়—

'The souls have not been created suddenly, but these souls are passing through the different stages of evolution ; from the lower to the higher planes, gaining experience after experience, and marching onward towards the ultimate goal of the realization of the absolute.'

একথা তিনি বলেছেন যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন যখনই জীবের মধ্যে (মানুষের কথাই ধরা হচ্ছে, কারণ মানুষ ক্রমবিকাশের পর্বে সর্বোত্তম) পরিপূর্ণতা আসবে তখনই বিবর্তনের চক্র শুদ্ধ হবে, তার গতি রুদ্ধ হবে। পরিপূর্ণতা অর্থে তিনি বলেছেন স্বার্থপরতার সম্পূর্ণ অন্তর্ধান। আরো ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন এই পরিপূর্ণতা হ'লো ঈশ্বর-চেতনা বা মুক্তি। স্বামী বিবেকানন্দও পূর্ণ-মানবের কথা বলেছেন।

অভেদানন্দ বলেছেন[১],

'মানুষই ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। মানুষ ছাড়া জগতে আর কোন উন্নততর বিকাশ-সম্পন্ন প্রাণী নেই। সুতরাং একথা যদি আমরা বলি যে, দৈহিক বিকাশের চরম-উদ্দেশ্য জৈব বা প্রাণী-শরীরের পূর্ণ পরিণতি লাভ করা, তাহলে তা ন্যায়সংগত হয়। তাছাড়া একথাও সত্য যে সমগ্র বিশ্বে প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্য ও প্রণালী যদি সকল সময় একরূপ হয় তাহলে বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হবে যখন এগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ হবে। বৌদ্ধিক পরিপূর্ণতার অর্থ বুদ্ধির চরম-বিকাশ। বুদ্ধি পরিপূর্ণরূপে বিকাশ সম্পন্ন তখনই হয় যখন 'শুদ্ধমন' রূপে জাগতিক সমস্ত জিনিসের যথার্থ রূপ ও প্রকৃতিকে তা উপলব্ধি করতে পারে ও মিথ্যাকে সত্য, জড়কে চৈতন্য অথবা অনিত্যকে নিত্য বলে কখনও ভুল করে না। স্বার্থপরতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হলে নৈতিক পূর্ণতা সিদ্ধ হয় এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা তখনি লাভ হয় যখন শাশ্বত, নিত্যমুক্ত, অদ্বিতীয় ও চিরপবিত্র পরমার্থ সত্যস্বরূপ ভগবানকে আমরা লাভ করি। এই শাশ্বত সত্যের কল্যাণময় রূপ যথার্থভাবে প্রকাশিত হলে ক্রমবিকাশ শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করে'।

---

১ স্বামী অভেদানন্দ : *Reincarnation.*

অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বিজ্ঞান বলেছে—এই প্রণালীর (ক্রমবিকাশ) মধ্যে দুটি প্রধান বিষয় আছে। প্রথমটি—কি উদ্ভিদ জগৎ, কি প্রাণিজগৎ সর্বত্রই প্রাণবান্ পদার্থের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করবার প্রবৃত্তি আছে। আর দ্বিতীয়টি—অনুকূলে বা প্রতিকূলে ঐ বৈষম্যের উপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্যে একটি পরিবেশের (environment) প্রবণতা আছে। ক্রমবিবর্তন তত্ত্ব আমাদের তিনটি সূত্রের সন্ধান দিয়েছে—

(১) বিভিন্নতা বা বৈষম্যসৃষ্টির প্রবণতা।

(২) প্রাকৃতিক নির্বাচন।

(৩) জীবনসংগ্রাম।

অভেদানন্দ বলেন, বিজ্ঞান এই নিয়মের সাহায্যে মানুষের দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক (intellectual), নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু একথাও সত্য যে বিজ্ঞান যতদিন না প্রত্যেক অবস্থার প্রাণিদের মধ্যে সুপ্তভাবে নিহিত 'বৈষম্য সৃষ্টির প্রবৃত্তি'র কারণ নির্দেশ করতে না পারছে ততদিন ক্রমবিকাশবাদ কতকটা অপরিজ্ঞাত থেকে যাবে। তাঁর নিজস্ব ভাষায়—

> 'But the theory of Evolution will remain unintelligible until science can trace the cause of that innate 'tendency to vary' which exists in every stage of all living forms' (Evolution and Reincarnation, p. 51)

প্রথমে 'জীবন সংগ্রাম' ও 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যাখ্যাতারা বলেন, যদি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করা যায় তাহলে অনুভব করা যায় যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় জীবনের প্রারম্ভ থেকেই, এবং তা নিঃসন্দেহে কঠোর সংগ্রাম। শিশু জন্মাবার আগেই ভ্রূণ বা বীজ অবস্থায় অনেকটা নির্বাচন হ'য়ে যায়। তারপরে দেখা যায় একদিকে বংশবৃদ্ধির জন্যে যেমনি প্রচুর আয়োজন, তেমনি অপরদিকে জীবনধারণের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা। প্রাণ ধারণের জন্য জাতিগত ও ব্যক্তিগত যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলছে তাকেই ডারউইন বলেছেন, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন সংগ্রাম।

ডারউইনের 'সংগ্রাম' কথাটি বেশ জটিল। সংগ্রাম কথাতে বোঝায়—প্রত্যক্ষ ও সজ্ঞান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সংগ্রাম প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত।

স্ব-শ্রেণীর মধ্যে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে থাকে এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে তা সমগ্র প্রজাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক।

হলডেনও একথা স্বীকার করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এমনকি স্ব-শ্রেণীর মধ্যে 'নির্বাচনের' ক্ষেত্রেও সংগ্রাম বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবশ্যক নয়। বরং সহ-অবস্থানের নীতি দেখতে পাওয়া যায়—

> '...Selection in favour of harmonious or co-operative group association, is certainty common.'[১০]

ডারউইনের ত্রুটি এই যে তিনি মানুষ ও মনুষ্যেতর জীব-জন্তুদের বিবর্তনকে একই ভাবে লক্ষ্য করেছেন। যদিও তিনি অন্যান্য প্রজাতি থেকে মানুষের বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন, তিনি স্বীকার করেছেন, বিবর্তন প্রক্রিয়ার সর্বোত্তম ফল মানুষ তাহলেও তিনি ঐ মৌল দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিলেন।

'ক্রমবিকাশ' কথাটির সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচ কথাটিও অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। কোন এক সাধক মনে করেন মহাপুরুষ জন্মাতে পারে কেবলমাত্র মহাপুরুষ থেকেই। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ থেকে মহাপুরুষের সৃষ্টি হতে পারে না। এই বক্তব্যকে আঁকড়ে ধরলে ক্রমবিকাশতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হতে হয়। কিন্তু অভেদানন্দ এ' বিষয়ে অধিকতর আধুনিক। তাঁর মতে দেব-মানবও সাধারণ মানব থেকে ক্রমবিকাশের পরিণতি। সাধারণ মানুষই সাধনার ক্রমোচ্চসোপানে আরোহন ক'রে দিব্যভাব লাভ করে।

মানবিক ক্রমবিকাশতত্ত্বের কথা আধুনিক বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। খ্যাতনামা বিজ্ঞানী Pierre Teilhard De Chardin (পিয়ের টেলহার্ড দ্য সার্ডিন) বলেছেন, মানুষের মধ্যে 'অন্তর্নিহিত বস্তু' বলে কিছু আছে যাকে উপেক্ষা করা যায় না। মানুষের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,[১১]

> 'It is impossible to deny that, deep within ourselves an 'interior' appeals at the heart of beings, as it were seen through a rent. This is enough to ensure that in one degree

---

১০ G. G. Simpson : *The Meaning of Evolution* (1964), p. 223

১১ *The Phenomenon of Man*, (London, Cottins, 1959), p. 55

or another, this 'interior' should obtrude itself as existing everywhere in nature from all time. Since the stuff of the universe has an inner aspect at due point of itself, there is necessarily a 'double aspect to its structure,' that is to say, in every region of space and time—in the same way, for instance, as it is grannular : "Co-extensive with their without, there is a within to things."

অভেদানন্দ জানতেন, প্রকৃতির স্বভাবই তার সমস্ত শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলা। শক্তিগুলির বিকাশও ঠিক এভাবে হয় যে, যেগুলি প্রবল ও বিকাশোন্মুখ শক্তি সেগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয় ও অবশিষ্ট শক্তিগুলি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বিকাশের প্রণালী লক্ষ্য করলে আমরা দেখব, পশুপ্রকৃতি সম্যক প্রকাশিত হলে নৈতিক ও অধ্যাত্মিক প্রকৃতি অব্যক্ত থেকে যায়। আবার নৈতিক বা আধ্যাত্মিক ভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ হলে পশুভাব বা নীচ প্রকৃতি-গুলির আর বিকাশ হয় না। এজন্য আমরা দেখে থাকি যে, নীচুস্তরের পশু বা প্রাণীতে ও এমনকি—যে সব মানুষ পশুর মত জীবনযাপন করে তাদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ হয় না। মানুষই একমাত্র প্রাণী যাতে কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক উভয় প্রকৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

মানুষের যখন আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ হয় তখন সে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, তার নীচ বা পশুপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়। উন্নত প্রবৃত্তিগুলি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীচ প্রবৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায়, তাদের শক্তিগুলির রূপান্তর হয় এবং শেষে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়, আর কখনও তারা বিকশিত বা ব্যক্ত হয় না। তখনই মানুষ সমস্ত নীচ বা পশুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্তি লাভ করে।

অভেদানন্দ বলেছেন, কি উঁচু, কি নীচু সকল বিকাশে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। মানুষ বা যে কোন প্রাণী যতক্ষণ পর্যন্ত যে যে স্তরে অবস্থান করে ততক্ষণ সে তাতে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন সে একটি স্তরকে অতিক্রম ক'রে অন্য স্তরে উপস্থিত হয় তখন সেই আগেকার স্তর আর তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। যখন সমস্ত স্তর ও বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক ভাবের স্তরগুলি অতিক্রম ক'রে পূর্ণতা বা মুক্তিরূপ চরম-স্তরে উপনীত হয় তখনই সে শাশ্বত ও পবিত্র

আত্মসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে, তখনই তার যথার্থ ব্যক্তিত্ব ও সত্তার স্ফুরণ হয়।

সত্যজ্ঞান ও বিবেক না থাকার জন্যে যখন যে অবস্থায় সে বাস করে তখনই সেই অবস্থার শক্তিগুলির সংগে নিজের ব্যক্তি সত্তাকে একাকার ক'রে ফেলে, পৃথক করতে পারে না। ফলে ভুল করে সে মনে করে যে, প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্তন ও বিকার তাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে। কিন্তু জ্ঞান লাভ ক'রে বিবেকের বশে সে আবার উপলব্ধি করতে পারে যে, তার সত্তা চিরদিন অবিকৃত ও পবিত্র। বিকাশের স্তর ও অবচ্ছেদগুলির ক্রমাগত পরিবর্তন হলেও সে তার যথার্থ সত্তাকে শুদ্ধভাবে সর্বদা প্রকাশিত ব'লে অনুভব করে। "স্তর-গুলির বিকাশ ও শরীরের পরিবর্তন হলে আত্মা শরীরী সর্বদা এক ও অবিকৃত থাকেন, তাঁর কখনও পরিবর্তন হয় না"। অভেদানন্দ আরও বলেছেন,[১২]

> 'বিভিন্ন স্তরের রঙের কাঁচযুক্ত একটি লণ্ঠনের ভিতর আলোকশিখা থাকলে তার রশ্মিগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হয়ে বাইরে প্রকাশ পায়, প্রাণীদের আত্মাও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত হয়। পশুশরীরের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হলে আত্মায় পশু প্রবৃত্তিরই বিকাশ হয়। অথবা সূক্ষ্ম মানব-শরীরে প্রকাশ পেলে তাতে মানবীয় সূক্ষ্ম শক্তি সমূহেরই বিকাশ হয়। প্রাণীদের সূক্ষ্মশরীর পশুপ্রকৃতি থেকে ক্রমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভূমিতে প্রকাশিত হবার পর তারা দিব্য ভাবের অধিকারী হয়, কাজেই একথা সত্যি যে সূক্ষ্ম শরীরের বিভিন্ন ধরণের বিকার বা পরিবর্তন হয়। যে কোনও একটিমাত্র শরীর বা জন্মে যখন পাশবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এই সব স্তরের বিকাশ সম্ভব নয়। তখন পুনর্জন্ম-বাদরূপ নীতি বা সত্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যেহেতু জীবাণু বা প্রত্যেক প্রাণীই ক্রমবিকাশের ফলে বহুবার জন্মায় ও বহু শরীর ধারণ ক'রে থাকে। একথা না মানলে ক্রমবিকাশবাদকে অসম্পূর্ণ, বিকৃত ও উদ্দেশ্যবিহীন ব'লে প্রমাণ করা হবে'।

স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্য অনুসরণ করলে একথাই অনুমান করা যায়, তিনি ক্রমবিবর্তনের সিঁড়িতে 'মানুষ'কে দেখেছেন কিঞ্চিৎ 'ভিন্ন চক্ষে'। প্রকৃতপক্ষে তা-ই হওয়া উচিত। একথা আধুনিককালের বিজ্ঞানীদের কণ্ঠে বেশ ভাল ভাবেই

১২ *Cf. Reincarnation.*

শোনা যাচ্ছে। বিখ্যাত বায়োলজিস্ট সার জুলিয়ান হাক্সলি তাঁর এক বক্তৃতায় একথাই বলেছেন মানুষের ক্রমবিকাশ বায়োলজিক্যাল নয়, একে বরং মনস্তাত্ত্বিক বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়া সভ্যতা বা সংস্কৃতির অনুযায়ী হয়। তার ফলে আত্মবোধ, মানসিক বিকাশ প্রভৃতি ঘটে থাকে। স্বামী অভেদানন্দ মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের কথা বলে মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র করেছেন। বলা বাহুল্য আধ্যাত্মিক বিকাশ মানে মানসিক বিকাশ। চিত্ত শতদলের ঘুমন্ত পাঁপড়িগুলি একে একে উন্মোচিত হ'তে থাকে, সাধকের দেহে চক্রের পর চক্রের দ্বার ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত হতে শুরু করে। একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে মানসিক বিকাশ ঘটলেই সকলেই বিচিত্র অনুভূতির মুখোমুখি হতে পারেন না। চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশ, আত্মার পূর্ণ উপলব্ধির ফলে মনের মধ্যে জেগে ওঠে বিচিত্র অনুভূতির সুর। একারণেই মানুষ পশু থেকে স্বতন্ত্র। তাই অভেদানন্দ বলেন মানুষের বিকাশ মানসিক। তবে একথা সত্য মানুষ তার মনের মধ্যে যে জগতের সৃষ্টি করে সে সেই জগতেরই বাসিন্দা হয়ে পড়ে। কাজেই মানুষের কাছে মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনটাই বড়ো কথা।

সার জুলিয়ান হাক্সলির ভাষায়[১৩] বলা যায়—

> 'Man's evolution is not biological but psychological, it operates by the mechanism of cultural tradition, which involves the cumulative self-reproduction and self-variation of metal activities and their products. Accordingly, major steps in the human phase of evolution are achieved by break throughs to new dominant patterns of mental organization of knowledge, ideas and beliefs ideological instead of psychological or biological organization...'

অন্যান্যদের চেয়ে মানুষ স্বতন্ত্র। 'জীন' (Gene) তত্ত্ব সাহায্যে সভ্যতা বা কৃষ্টির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে টের পাওয়া যেতে পারে কিন্তু 'জীন' তত্ত্বে কখনও কেমন সভ্যতার বিকাশ হবে বা কোন ব্যক্তির মানসিক বিকাশের ফলে কি কি অবস্থার উদ্ভব হতে পারে তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। এখানে মানুষ

১৩ J. Huxley : *Evolution After Darwin*, Vol III, p, 251-2

সম্পূর্ণ একক। মানসিক বিকাশ প্রতি মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্নতর। অভেদানন্দ তাই বলেছেন বিকাশের প্রণালী দেখা আবশ্যক। বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ব ও জীনতত্ত্ববিদ Dobzhansky বলেছেন[১৪]—

> 'Genes determine the possibilities of culture but not its content, just as they determine the possibility of human speech but not what is spoken.'

প্রাণী হিসেবে মানুষ একক নয়, কিন্তু সংস্কৃতির বাহকরূপে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে ভীষণভাবে আলাদা। এবং ক্রমান্বয়ে মানুষ নিজেকে 'বায়োলজিক্যাল গোষ্ঠী' থেকে এমনভাবে সরিয়ে নিয়ে এসেছে যে তাকে আর কোন মতেই ঐ শ্রেণীতে রাখা যায় না। বৃটিশ জীনতত্ত্ববিদ সি. এইচ. ওয়াডিংটন (C. H. Waddington) মানুষের মানসিক পরিচ্ছন্নতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সুন্দর কথা বলেছেন,

> 'Man has acquired what amounts to a totally new evolutionary system . conceptual thought and language constitute' ineffect, a new way of transmitting information from one generation to the next. This cultural inheritance does not the same sort of thing for man that in the sub-human world is done by genetic system...This means that besides his biological system, man has a completely new 'genetic system' dependent on cultural transmission.'

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেক পুরুষে (generation) অধঃস্তনদের মধ্যে মানসিক নানা পরিবর্তন ঘটে। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পিতার থেকে সন্তানের মধ্যে মানসিক বিকাশের তারতম্য ঘটে। হয়তো বা ভালো অথবা খারাপ। কিন্তু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। একে গাণিতিক সমীকরণে বেঁধে ফেলা যায় এমনি ভাবে—

$$\phi(q) = \frac{c}{\sigma^2 \Delta q} \exp\left[2\int\left(\frac{\Delta q}{\sigma^2 \Delta q}\right) dq\right] \cdot \int^{1} \phi(q) dq = 1$$

১৪ Science, CXXVII 109f

এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী সেওয়াল রাইট (Sewall Wr ght)-এর বক্তব্য বেশ সুন্দর। তিনি বলেছেন,

'A genetic system can take the step from one selective peak to a higher one only by some non-selective process. A novel mutation may do this by creating a new peak, but this must be an excessively rare event. The alternative is a random departure from the strictly determinitic effects of the various process. This may itself be due to some unique event in the history of the population, or it may be a cumulative consequence of many small accidents'.

'প্রাণ' বলতে কি বোঝা যায়। এ' নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। জড় দেহে প্রাণের প্রথম প্রকাশ পাবার পর থেকেই সমগ্র বিশ্বের বুকে সৃজিত হ'লো নতুন ইতিহাস। এক স্পন্দনশীল বস্তুর ক্রমবিকাশের পালা রচিত হলো পর্বে পর্বে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২।৩ শ্লোকে আছে: 'প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে',—অর্থাৎ প্রাণই সর্বভূতের আয়ু, তাই তাকে বলা হয় সর্বায়ু অর্থাৎ বিশ্বের জীবন।

প্রকৃত-জগতে শক্তির বিভূতি-বিশেষকে অভিহিত করা হয় প্রাণ। তার থেকেই সৃষ্ট হয়েছে মনের। এই পৃথিবীর বুকে জড়ের আধারে প্রাণের মহাপ্লাবী প্রকাশ দেখে বিমূঢ় আমরা। স্পষ্ট অনুভব করতে পারি এ প্রাণ কেবলমাত্র ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের মধ্যেই অবরুদ্ধ নয়—এক বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির বিভূতি হলো এই প্রাণ। বিজ্ঞানীরা যাকে বলেছেন কস্‌মিক এনার্জি। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই শক্তির ধারা প্রবাহিত। তারই নিরন্তু লীলায় গড়ে উঠেছে র পের মেলা। চলেছে ভাঙা-গড়ার শিল্পকলা, তারই মধ্যে অপ্রমত্ত ধারায় অনবরুদ্ধ গতিতে চলেছে প্রাণের প্রবাহ। এই মহাজাগতিক শক্তি থেকে শক্তি লাভ করছে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুনিচয়।

বিজ্ঞানীরা বলবেন, 'প্রাণ' বলতে তো কোন অখণ্ড ছবি আমাদের চোখ বা মনের সামনে আসে না। বিশ্বশক্তির এক বিশেষ পরিণামকেও প্রাণ বলে জানি। তার পরিচয় পশু ও উদ্ভিদ রাজ্যে। ধাতুখণ্ড বা বায়বীয় পদার্থের মধ্যে ঐ

১৫ S. Wright *Genetics, Ecology and Selection of Life*: The Evolution p. 45.

।কই প্রাণের পরিচয় মেলে না। তাহলে প্রশ্ন উঠবে যাকে আমরা বলি ধাতু ;গৎ কিংবা রাসায়নিক জগৎ, তার সঙ্গে উদ্ভিদ বা পশু জগতের পার্থক্য যায় ? আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু জোর দিয়েছেন যে অভিঘাতে সাড়া দেওয়াই প্রাণসত্তার অবিসংবাদিত পরিচয়। তিনি যেমনি উদ্ভিদে, তেমনি ধাতুখণ্ডে ়ত্যক্ষ করেছেন প্রাণের সেই মূল লক্ষণ। তবুও বিভেদ আছে। কিন্তু সেই বভেদ হয়তো কালক্রমে লোপ পেয়ে যাবে যখন অনুভব করা সম্ভব হবে সর্বত্র ়রিব্যাপ্ত হয়ে আছে এক অখণ্ড প্রাণ প্রবাহ, কোথাও বা অতিপ্রকট, কোথাও ল্প প্রকট ; কোথাও সংবৃত, কোথাও বিবৃত। কিন্তু আছে সারা বিশ্ব ভুবন জুড়ে। ক্রমবিবর্তিত বিশ্বের তত্ত্বালোকে যদি প্রাণের উন্মেষের লীলাকে বিচার করি তাহলে অন্ততঃ এই সত্যটি উপলব্ধি করা সম্ভব যে উদ্ভিদের মধ্যে যে প্রাণ, পশুর মধ্যে তার সংহননের (জমাট বাঁধা) ধারা পৃথক হলেও ূলতঃ তা একই শক্তি। উদ্ভিদের মধ্যেও পশুর মত জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু আছে। আছে বীজের সহায়ে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা, ব্যাধির আক্রমণে মৃত্যু, আছে বহুজনন অথবা বন্ধ্যাত্ব, সুপ্তি ও জাগরণ, শৈশব-যৌবন-প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের ক্রম-পরিণাম। উদ্ভিদ ও পশু জগতের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকলেও একথা অনস্বীকার্য উদ্ভিদের ধ্যেও বয়ে চলেছে সেই এক প্রাণময়-বোধের ফল্গুধারা, তাহলে উভয়ের সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ জগৎ রয়েছে জীবজগৎ আর— 'অজীব' জড়জগতের মধ্যবর্তী এলাকায়। এবং এইটেই যথার্থ। যেহেতু প্রাণ যদি বিশ্বশক্তি সংবেগ হয়, তাহলে তা জড় থেকে অঙ্কুরিত হয়েছে আর রত হয়েছে মন মানসে। তবে প্রাণ তো মধ্যবর্তী স্থানেরই। একথা তে গেলে স্বভাবতই বলতে হবে প্রাণ ছিল জড়ের মাঝেই সুপ্ত হ'য়ে। তা হ'লে কোথা থেকে তার আবির্ভাব হ'লো ? নচেৎ বলতে হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের এই অতর্কিত আবির্ভাব এক আকস্মিক ঘটনা মাত্র। সার জুলিয়ান হাক্সলি ১৬ বলেছেন, অতর্কিতে সৃষ্টি হয়নি প্রাণের। আগেকার জীবন বা প্রাণ থেকে ধারা বেয়ে নেমে এসেছে নতুন প্রাণ। কাজেই একথা কেমন করে বলি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রাণের। তারও তো কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

---

১৬ **'Life is not now being generated afresh ; it springs always from pre-existing life.' —J. S. Huxley : *'The Continuity of Life'* (The Stream of Life :) 1932, p 3)**

পরমাণু থেকে মানুষ পর্যন্ত সর্বত্র মূলতঃ এক অখণ্ড প্রাণের প্রকাশ সেকথ বলেছি। 'প্রাণ' তাহলে কি? একে বলা যেতে পারে 'চিৎ-শক্তির এব বিশ্বব্যাপিনী লীলা'। এর লীলার ছন্দে উষাপর্বে জড়ের বুকে ধরেছিল কাঁপন তার সুষুপ্তি যেন ছিন্ন হয়েছিল অবিচ্ছিন্নতার ঊর্ণনাভ থেকে। মধ্যাহ্নে তার 'অস্পষ্ট-সাড়া' যাকে 'চেতনার কাছাকাছি' বলা যেতে পারে। সায়াহ্নে পরিপূর্ণ প্রকাশ বা চেতনার প্রস্ফুটন প্রাণি-মনমানসে। গড়ে উঠলো ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির কাঠামো। তথাপি একথা অবিস্মরণীয় প্রতি পর্বে-পর্বান্তরে অখণ্ড প্রাণশক্তির লীলা প্রবাহমান। একথা বিজ্ঞানীর কথাতেও প্রায় অনুরূপভাবেই বলা চলে

'Biology thus shows each species of animal or plant as a stream of one kind of living matter, alternately expanding into pools and contracting into narrows. The pools are represented by the grown-up organisms, the narrows by the comparatively tiny reproductive cells. But the flow goes on continuously.' ১৭

বায়োলজি হয়ত কোষের সংযুক্তি ও বিযুক্তির কথা বলবে, কিন্তু কোষের গভীর প্রদেশে চির চাঞ্চল্যময় প্রবাহ ঐ প্রাণের। হয়ত জড় থেকে জীবে তার রূপ বিভিন্ন কিন্তু অবিনাশী ও চির পুরাতনী।

এই যদি প্রাণ হয়, তাহলে মৃত্যু কি! তার প্রয়োজন কোথায়, কোথায় তার সার্থকতা! 'অন্ন ও অন্নাদের অন্যোন্য-বুভুক্ষায় সংক্ষুব্ধ জগতে শরীরী প্রাণকে বাঁচতে হবে লড়াই ক'রে—আঘাত সয়ে, আঘাত দিয়ে। এ হতেই দেখা দেয় বিশ্বপ্রাণের কল্পিত মৃত্যু-বিধান'। ১৮ এখানেই মৃত্যুর প্রয়োজন ও সার্থকতা। মৃত্যু প্রাণের প্রতিরোধ নয়, এ তারই এক বিশেষ ভঙ্গিমা। প্রাণ যতই জড়-আধারের নাগপাশ থেকে নিজেকে বিমুক্ত করতে চেষ্টা করে, ততই তার অভিনব রূপটি ফুটে ওঠে। এই প্রবৃত্তি প্রাণের মধ্যবিভূতি। এর মধ্যে আছে 'মৃত্যু ও অন্যোন্য-কবলনের লীলা, আছে বুভুক্ষা ও সদ্যোজাগ্রত কামনার প্রবেগ, সংকীর্ণ প্রসর ও সামর্থ্যের একটা পীড়িত অনুভব, আপনাকে ছড়িয়ে দেবার, বাড়িয়ে তোলবার, একটা ক্ষুব্ধ আয়াস, বিজিগীষা ও বিত্তৈষণার একটা

১৭ J. S. Huxley : *'The Stream of Life*, p. 4

১৮ দিব্য-জীবন—শ্রীঅরবিন্দ

প্রমত্ততা'।[১৯] একে আমরা বলি মৃত্যু-কামনা ও সংঘাতের ত্রয়ী। ডারউইনের ক্রমবিকাশতত্ত্বের ভিত্তি হ'লো এটি।

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে একটা বিক্ষোভ। মরণের মধ্যেও মরণকে উত্তীর্ণ হবার বিক্ষুব্ধ প্রয়াস। যেহেতু মৃত্যু তো প্রাণেরই নেতিরূপ। এরই আড়ালে থেকে প্রাণ ইতিরূপের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চাইছে অমৃতত্ব লাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। একই ভাবে বলা যেতে পারে, বুভুক্ষা ও কামনার মধ্যেও তেমনি অকুণ্ঠ 'আত্মতর্পণের নিরাপদভূমিতে' পেঁছিবার উদগ্র বাসনা। যেহেতু কামনার ফেনিলতার ভিতর দিয়ে প্রাণ চায় অতৃপ্ত বুভুক্ষার নেতিরূপ থেকে তার ইতিরূপকে নিরঙ্কুশ সম্ভোগের দিকে নিয়ে যেতে। তাই জাগে পরিবেশকে পরাজিত করবার দুর্দমনীয় আগ্রহ। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রশ্ন শুধু নয়। তার মধ্যে আছে সর্বসিদ্ধির আত্যন্তিক তপস্যা। যেহেতু যখনই পরিবেশ নিজের করায়ত্ত তখনই বেঁচে থাকার সম্ভাবনা সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত। ডারউইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' বাদের ইঙ্গিত রয়েছে এখানে। এ কথা নিঃসন্দেহে চিরন্তন সত্যধারণার প্রকাশ।

এ সত্ত্বেও ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ সংকীর্ণ দৃষ্টি-যুক্ত। ডারউইন দেখলেন প্রাণের মধ্যে 'যুযুৎসু-ভাবটাকে' বড ক'রে। জীবজগতে নিজের স্বার্থ অতি বড়, আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তার জন্যে আততায়ী হয়ে অপরের প্রাণবিনাশে তার সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি একথা ডারউইন রায় দিয়েছেন স্বচ্ছন্দচিত্তে। তাঁর ভ্রান্তি এখানেই। জড় প্রকৃতি এবং ইতর জীবের মধ্যে প্রাণধর্মের যে দুটি বিভূতি প্রকাশিত, তার মাঝে অপ্রকাশিত আছে প্রাণের এক নতুন বিভূতি, যার বিকাশ চৈতন্যের পরিপূর্ণ প্রকাশিত আধারে। জীবের চিরস্থায়ী হয়ে টিকে থাকার বা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস দূর হয়েছে মৃত্যুর কড়া শাসনে। তাই ব্যষ্টি জীব স্থায়িত্বের সন্ধান খোঁজে নিজের মধ্যে নয়, সমষ্টির মধ্যে। তার জন্যে প্রয়োজন সহযোগিতা, অন্যোন্য-নির্ভরতা। নিজের প্রয়োজনেই তার চাই অপরকে। 'এমনি করে পরস্পরের মেলামেশায়, সচেতন সংঘবন্ধন অন্যোন্য-সংমিশ্রণে উপ্ত হয় যে নূতন ভাবের বীজ, তা হতেই ফোটে একদিন প্রেমের ফুল'।[২০] সৃষ্টি হয় প্রজাতির।

---

১৯ দিব্যজীবন—

২০ ঐ

ক্রমবিকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্য আরো সুন্দর ভাবে ফুটে উঠবে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কিত বিষয়ের উপর তাঁর আলোক সম্পাতে। প্রজ্ঞাসুন্দর স্বামী অভেদানন্দ তাঁর অনুপম অনুভূতি বিশ্লেষনীশক্তির সাহায্যে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি বৈজ্ঞানিক। এই বিস্ময় গভীরতর হয় পুনর্জন্মবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠে। তার আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে।

পাঁচ

॥ অভেদানন্দের দৃষ্টিতে পুনর্জন্মবাদ ॥

'পুনর্জন্মবাদ' কথাটি শুনলেই আধুনিক বিজ্ঞানীরা ভ্রূকুঞ্চিত করবেন একথা মানি। যে বিজ্ঞান আমাদের অধিগত তার সাহায্যে জন্মান্তরবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু যে বিজ্ঞান আমাদের গ্রহান্তরে পাড়ি জমাতে সাহায্য করছে, পঞ্চাশ মেগাটনী বোমা তৈরী ক'রে পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতার সংকট ঘটাতে উৎসাহ দিচ্ছে সে বিজ্ঞান মৃত্যুর শীতল যবনিকার অপর প্রান্তে কি আছে তা জানার কাজে একান্ত নিরুৎসুক। কিংবা বলা যেতে পারে তার সীমা মৃত্যুর এপারে অর্থাৎ জীবনের প্রান্তদেশ পর্যন্ত—ওপারে নয়। 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' যে জগৎ সে জগতের নাম কি বলবো—অতীন্দ্রিয় লোক বা মানসলোক! নতুন বিজ্ঞানের নিত্যি-নতুন আবিষ্কার মানুষকে ক'রে তুলছে অধিকতর কৌতূহলী। তথাপি একথা অনস্বীকার্য প্রচলিত বিজ্ঞানের গণ্ডি আছে, সীমা আছে। অতীত যুগে বিজ্ঞানের একাধিপত্য বা অধিগম্য স্থানের পরিসর অধুনা বিস্তৃততর হয়েছে। জড় বিজ্ঞানের পাশে মনোবিজ্ঞান আপন স্থান ক'রে নিয়েছে সম্ভ্রমের সঙ্গে। একারণেই মনে হয় যে মনোবিজ্ঞানকে একদা বিজ্ঞানের পংক্তিতে স্থান দেওয়া হ'তো না, আজ বিজ্ঞানের অ্যারিস্টোক্র্যাট মহলে তার অকম্পিত আসন। 'পুনর্জন্মবাদ' জড় বিজ্ঞানীদের কাছে উপহসিত। কিন্তু এককালে তো চাঁদে যাবার ভাবনাও কল্পনা বলে মনে হতো। সেই কল্পনা আজ রূপায়িত বাস্তবে। তার জন্যে গড়ে উঠেছে নতুন মহাকাশ-বিজ্ঞান। উদ্ভাসিত হয়েছে নানা তত্ত্ব, তথ্যের সম্ভার। বিনিদ্র গবেষকের লেখনী থেকে চ্যুত হয়েছে নতুন নতুন সমীকরণের মালা। কল্পনা সজীব হলো। প্রসারিত হ'লো বিজ্ঞানের স-গম্ভীর এলাকা।

এমনি কথাই মনে জাগে, এমনি ভাবনা উঁকি দেয় বিজ্ঞানের এলাকা প্রসারিত হবে কি না মৃত্যুর পরপারেও। শারীরবিদ্যা ব'লে দেয় মৃত্যুর নানা চিহ্ন। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর তফাৎ আজ শারীরবিদ্যার ছাত্রের পঠিতব্য বিষয়। কিন্তু তার-ও পরে? বিজ্ঞান সেখানে নীরব। যে জগৎ ইন্দ্রিয়ের বাইরে তার সম্বন্ধে

জড়বিজ্ঞান উদাসীন। কিন্তু তা-ব'লেই কি মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায় ডারউইনের সেই 'মিসিং-লিংক' এর মতোই অনুদ্‌ঘাটিত থাকবে! আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজ মনোবিজ্ঞানের। বিশেষ ক'রে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানীর কাছে থাকে এর চাবি-কাঠি। হয়তো আগামী কালের বিজ্ঞানে এ বিষয়টিও তার অন্তর্গত হবে। কিন্তু আজ জন্মান্তরবাদের কথা বলতে গিয়ে উদ্ধৃতি দিতে পারবো না বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কথা থেকে। স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্যকে প্রচলিত বিজ্ঞানের নিরিখে বিচার করা সম্ভব হবে না। এ বিচারের দায়িত্ব ভবিষ্য-বিজ্ঞানের। এখন শুধু উপস্থাপনার দায়িত্ব। এ প্রয়াস সুকঠিন তথাপি অবশ্য করণীয়। যেহেতু স্বামী অভেদানন্দের উপলব্ধি-জাত বক্তব্য বিজ্ঞানের নতুন মহাদেশের আবিষ্কারের সুমহান স্পর্ধা রাখে।

প্রশ্ন উঠবে জন্মান্তরবাদ কি! অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা মনে করেন শুধু মানুষ কেন, সমস্ত প্রাণীর আত্মা চৈতন্যময়, তা জড় শরীর থেকে একান্তভাবে পৃথক। আত্মাকে বলা হয় শাশ্বত, মনে করা হয় দৈহিক মৃত্যুর সঙ্গে তার বিনাশপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁরা মনে করেন দেহের লয়প্রাপ্তির পরেও আত্মা সূক্ষ্ম-শরীরী অবস্থায় লোকান্তরে থাকে। নিজের চিৎ-সত্তাকে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত আত্মা বা সূক্ষ্মদেহী জীবাত্মা বারংবার জন্মগ্রহণ করে। এক দেহ পরিত্যাগ করে পুনরায় অন্য দেহ গ্রহণ করে। এটিই হচ্ছে পুনর্জন্ম এবং জন্মান্তরবাদ কথার মানে হলো পুনর্জন্মে বিশ্বাস। ভারতীয় দার্শনিকদের অধিকাংশ পুনর্জন্মে আস্থা প্রকাশ করেছেন। দার্শনিক-বিজ্ঞানী পিথাগোরাস বলেছিলেন সকলেরই আত্মা আছে এবং সকল আত্মা বিরাট ইচ্ছা বা প্রবল নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অভেদানন্দ প্রথমেই বিজ্ঞানের হাতিয়ার নিয়েছেন। তাঁর যুক্তিকে অস্বীকার করা চলে কি না তা জ্ঞানবান পাঠকদের বিচার্য বিষয়। আমি তাঁর বক্তব্যের কিয়দংশ তুলে ধরছি—

'স্থূলবাস্তব জগৎ অনন্ত কার্য-কারণরূপ শৃংখলে চিরদিন আবদ্ধ রয়েছে। কার্য বা ফলকেই আমরা দেখতে পাই, কারণকে দেখতে পাই না, যেহেতু তা সর্বদা দৃষ্টির বাইরেই থাকে। কোন আপেল-গাছ থেকে যখন একটি আপেল মাটিতে পড়ে তখন বুঝতে হবে—যে আপেলটি পড়ছে তা কোন এক অদৃশ্য শক্তির ফল ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই অদৃশ্য শক্তিকে আমরা

বলি মাধ্যাকর্ষণ। যদিও কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কারণরূপী মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে দেখা যায় না, তথাপি তার কাজ আমাদের চোখে পড়ে। কাজেই অনুমান করা যায়, যে সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় শক্তিসমূহ নিয়ন্তারূপে অদৃশ্যে থেকে কাজ করে:এই দৃশ্যমান জগৎ বা সৃষ্টি তাদের স্থূল ও বিচিত্র বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। অদৃশ্য শক্তিসমূহ ও জড়বস্তুর অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম উপাদানগুলি একসঙ্গে মিলিত হয়ে স্থূল বিশ্ববৈচিত্র্যের সূক্ষ্মরূপকে সৃষ্টি ক'রে থাকে। যাদের আমরা স্থূল পার্থিব বস্তু বা পদার্থ বলি, তারা অদৃশ্য সূক্ষ্মশক্তির বিকাশ মাত্র আর এজন্য সূক্ষ্মশক্তিসমূহ স্থূল ও জড় পদার্থের উপাদানগুলির উপর সর্বদা ক্রিয়া ক'রে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সূক্ষ্ম মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প দুটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একসঙ্গে মিলে জল তৈরী করে। জল থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প দুটিকে কখনো আলাদা করা যায় না, তারা জলেরই সূক্ষ্ম মৌলিক উপাদান। অতএব জলের অস্তিত্ব তার মূল উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস দুটির উপর নির্ভর করে, অথবা বলা যায় ঐ বাষ্প দুটিকে নিয়েই জলের সার্থকতা। তাই জলের উপাদান বাষ্প দুটির যখন কোন বিকার বা পরিবর্তন হয় তখন তাদের স্থূল বিকাশরূপ জলেরও বিকার বা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এভাবে দেখান যায় যে, একটি চারাগাছের সব কিছু বৈশিষ্ট্য তার সূক্ষ্মকারণ-রূপ বীজের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। সেইরকম যে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মশক্তি দৃশ্যমান প্রাণীজগতের অনুপ্রাণী থেকে আরম্ভ ক'রে সৃষ্টির চরমবিকাশ মানব-জগৎ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের স্তরগুলির ভিতর অনুস্যূত রয়েছে, তার বৈশিষ্ট্যের উপর ক্রমিক স্তরগুলির বৈশিষ্ট্যও একান্তভাবে নির্ভর করে।'[১]

এই 'বৈজ্ঞানিক ভূমিকাটির' পরে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন মানুষের স্থূল-শরীরের সঙ্গে তার সূক্ষ্মশরীরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শুধু তা-ই নয়, স্থূলশরীরের প্রতিটি বিকাশ ও পরিবর্তনও তার সূক্ষ্মশরীরের বিকাশ ও পরিবর্তনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিকাশ বা পরিবর্তনকে 'কার্য' বলা যেতে পারে। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন সূক্ষ্মশরীরের যদি সামান্যভাবেও

১ *Reincarnation*, 1st Chapter.

কোন বিকার বা পরিবর্তন উপস্থিত হয় তাহলে স্থূলশরীরও তার জন্য বিকৃ
বা পরিবর্তিত হয়। অভেদানন্দ বলেছেন,

'প্রকৃতপক্ষে স্থূল সূক্ষ্মেরই কার্যাবস্থা আর তারজন্যে স্থূলশরীরের ‹
মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি ও সমস্ত বিকারই সূক্ষ্মশরীরের পরিবর্তনের উপর নির্ভ
করে। কাজেই যতদিন কারণরূপী সূক্ষ্মশরীর থাকে ততদিন স্থূলশরীরে
তার প্রভাব বা ক্রিয়া কার্যরূপে চলতে থাকে।'[২]

একটি প্রশ্ন অবধারিত। 'সূক্ষ্মশরীর' কাকে বলে ? অভেদানন্দের মতে সূক্ষ্ম
শরীর চেতন কোন একটি পদার্থের সূক্ষ্মবিকাশ মাত্র। এই সূক্ষ্মবিকাশ
পদার্থের নাম 'প্রাণশক্তি'। এ বিষয়ে গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদ আলোচ
হয়েছে। অতএব পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিটি প্রাণীর বহিঃপ্রকৃতি তার আন্তর প্রকৃতিরই বহির্বিকাশ।
প্রকৃতির নাম 'স্বভাব' যাকে ইংরেজীতে বলা হয় নেচার (nature)।
প্রকৃতি বা স্বভাবের বারংবার আত্মপ্রকাশের নাম পুনর্জন্ম। কোন মানুষ ম
গেলে তার জীবাত্মার মৃত্যু হয় না। জীবাত্মা সূক্ষ্ম আকারে অনন্তক
অদৃশ্যভাবে বেঁচে থাকে এবং কখনও ব্যক্ত হয়ে পশু বা মানব-শরীরের আকা
স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই পুনর্জন্মগ্রহণ করা জীবাত্মার প্রকৃ
ও তার সমগ্র জীবনের প্রবৃত্তি ও মনের ইচ্ছাশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কে
তাহলে পুনর্জন্ম কি ! কোন একটি জীবাণুর নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ও তার মে
যেসব শক্তি ও তেজ অব্যক্ত আকারে নিহিত থাকে তাদেরই ধীরে ধ
পুনঃপ্রকাশ।

পুনর্জন্ম নীতি কার্য-কারণ নিয়মসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামী অভেদা
বলেছেন কার্য কারণেরই অভিব্যক্ত রূপ। স্যাংখ্যকার কপিল বলেছেন, 'না
কারণলয়ঃ'—অর্থাৎ নাশ বা ধ্বংস বলতে বোঝায় কারণাকারে থাকা বা স্থি
বিজ্ঞান একই কথা বলে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত—বিশ্বের কোন জিনিসে
সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। অর্থাৎ তারা রূপান্তরিত হয়। যেমন 'শক্তি
ক্ষেত্রে। 'Conservation of Energy' বলে শক্তির বিনাশ নেই, তবে
রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ এক থেকে অন্যে।

পুনর্জন্মবাদের ধারণাকে সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাঃ হেনরী মোর (Dr. He

---

২ *Reincarnation*, 1st. Chapter.

More) প্রমুখ কয়েকজন কেম্ব্রিজ প্লেটোবাদীগণ মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সমর্থন পায় নি। মনে হয় ফ্লামারিয়ান (Flammarion) এবং হাক্সলির T. H. Huxley) মত বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম পুনর্জন্মবাদকে স্বীকার করলেন। হাক্সলি বলেছেন,[৩]

'Like the doctrine of evolution itself, that of transmigration has its roots in the world of reality ; and it may claim such support as the great argument from analogy is capable of supplying.

হাক্সলি বলেন, একমাত্র অসংলগ্ন অযৌক্তিকতার কারণ দেখিয়ে অবিবেচক লোক ছাড়া কেউ এই মতবাদকে অস্বীকার করবে না। ক্রমবিকাশবাদের মত পুনর্জন্মবাদও বাস্তব জগতে সত্য ব'লে পরিগণিত।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের কাছে বংশানুক্রমের একটি ছবি ফুটে ওঠে। কোন ব্যক্তিবিশেষের কথা ধরা যাক। তার দেহে বা কর্মে যে বিশেষত্ব থাকে তার জন্যে আমরা তার মা-বাবা এমনকি ঠাকুর্দা বা দাদুকেও টেনে আনি। হয়ত কোন 'বিশেষত্ব' বংশানুক্রমিক ধারায় ছড়িয়ে পড়ে। অতএব আমরা বলতে পারি এই বিশেষত্বই হচ্ছে মানুষের আদর্শগত ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মূল কথা। নবজাতকের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং 'অহং' বোধটিও তার মধ্যে সুসুপ্তাকারে রয়েছে। কিন্তু তা বেশিদিনের জন্য চেপে থাকে না। শিশু তার শৈশব ছাড়িয়ে যখন কিশোর, কিশোর থেকে যুবকে পরিণত হতে চলে, তার ঘুমিয়ে থাকা বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী টমাস হাক্সলি বলেছেন[৪]—

'...from childhood to age they manifest themselves in dulness or brightness, weakness or strength viciousness, uprightness ; and with each feature modified by confluence with another character, if by nothing else, the character passes on to its incarnation in new bodies.'

'পুনর্জন্ম' বললে আমরা দুই বা ততোধিক জন্মের ধারণা পাই। একটি জন্মের

---

৩ T. H. Huxley : *Evolution and Ethics* 1898) p. 61.

৪ ibid, p. 62.

পর আবার দেহধারণের মধ্যে সময়ের একটা ব্যবধান পাওয়া যায়। 'সময়' বা 'কাল' 'দেশ' ছাড়া হয় না। উভয়ের পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ, বৈদেশিক সাহিত্য ও পুরাণে, উপনিষদে মৃত্যুর পরবর্তীকালে জীবাত্মার অবস্থিতি সম্পর্কে নানা কথা বলা হয়েছে। সে বিষয়ে অভেদানন্দ নানা কথা বলেছেন। এখানে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরাই বাঞ্ছনীয়,[৫]

'মৃত্যুর পর জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীরের আবরণ ধারণ ক'রে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করে; সেখানেই পৃথিবীর এলাকা শেষ হয়েছে ও প্রেতলোকের বিস্তৃতি আরম্ভ হয়েছে। তাকেই সীমারেখা বা বর্ডারল্যাণ্ড বলে। তবে আসলে তাকে কোন স্থান, ক্ষেত্র বা স্তর বলা যায় না। কেননা দিগন্ত বা বাইরের কোন দেশ-রূপ সীমার নির্ধারণ বলতে সেখানে কিছু নেই। তাকে তাই একরকম ভিন্ন ধরণের স্পন্দনের (Vibration) অবস্থা বলা যায়। প্রত্যেক জীবাত্মা স্থূলশরীর থেকে নির্গত হবার সময়ে নিজের নিজের স্পন্দনকে সাথে নিয়ে যায়। তার চিন্তাধারা বা ভাবধারা সমস্তই স্পন্দন ছাড়া অন্য কিছু নয়। জীবাত্মা যেন স্পন্দন বা কম্পনের একটি কেন্দ্র বিশেষ এবং তা থেকে স্পন্দন ক্রমাগতই বিচ্ছুরিত হয়। একজনের স্পন্দনের সঙ্গে অপরের স্পন্দনের কোনদিনই সংঘর্ষ বা বিরোধ হয় না। মৃত্যুর পর জীবাত্মা তার স্পন্দনাত্মক সংস্কারগুলিকে নিজের লোকে (স্তরে) বহন ক'রে নিয়ে যায় এবং যতদিন না গাঢ় নিদ্রার কোলে অভিভূত হ'য়ে পড়ে ততদিন কিছুদিনের জন্যে সে সেই স্তরেই বাস করে। পৃথিবীলোকে অবিশ্রান্ত দৈহিক পরিশ্রমের পর প্রেতলোকে তার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় এবং তখনকার গভীর নিদ্রাই তার পক্ষে শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম। গাঢ় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লে সেই অজ্ঞাত রাজ্যে কেউ আর তাকে জাগ্রত করে না, এমনকি ঈশ্বরও সুষুপ্ত প্রেতাত্মার নিদ্রাভঙ্গ করেন না। কিন্তু এই পৃথিবীলোক থেকে যারা দারুণ উদ্বেগ, মনস্তাপ, বাসনা ও দুঃখকষ্ট নিয়ে প্রেতলোকে যায়, তাদের মোটেই নিদ্রা-শান্তি পূর্ণ হয় না, নিদ্রার শান্তি তাদের পুনঃ পুনঃ ব্যাহত হয়, কেননা স্বপ্নলোকের মধ্যে থেকেও পৃথিবীলোকের প্রতি তার আসক্তি ও আকর্ষণের জন্যে তারা মানসনেত্রে দেখে যে তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন সকলেই

৫ *Life Beyond Death* (1944), pp. 232-234.

শোক ও দুঃখ করছে। প্রেতলোকেই নিদ্রাচরের মতন তাই তারা সর্বদা চলাফেরা করে অথবা আত্মীয়স্বজনের প্রতি আকর্ষণের জন্যে তাদের পুনরায় পৃথিবীলোকে নেমে আসতে হয়। নিদ্রার অবস্থায় বিদেহী আত্মারা অনেক সময় তাদের ভাই-বন্ধু, মাতাপিতা বা সন্তানের কাছে ছুটে এসে তাদের সাহায্য করতে ও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের চেষ্টা বা ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তারা নিজেরা মোটেই সচেতন থাকে না, অর্থাৎ তারা যে কি করছে সে-সম্বন্ধে মোটেই জানতে পারে না। অনেক প্রেতাত্মা আছে—যারা মৃত্যুর পরও চেতনা হারায় না, পৃথিবীলোকের সকল জ্ঞানই তাদের জাগ্রত থাকে, কিন্তু তবু তারা জানতে পারে না যে স্থূলশরীর তাদের নষ্ট হয়ে গেছে। মৃত্যুর কথাও অনেক সময় তারা জানতে পারে না। সে সময়ে যেন তারা ধাঁধার মধ্যে পড়ে যায়। সত্যি-কারের অবস্থা, অর্থাৎ তারা সত্যিই যে ম'রে গেছে একথা বোঝার জন্যে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, আর তাই পৃথিবীলোকের মায়া-মমতার মধ্যে তারা কিছুক্ষণ বা কিছুদিন আবদ্ধ হ'য়ে থাকে। পৃথিবীতে কাকেও যদি তারা অত্যন্ত ভালবেসে থাকে, কিংবা কোন আত্মীয়স্বজনের উপর যদি তাদের প্রবল আকর্ষণ থাকে তবে প্রেতশরীর নিয়েই সেই প্রিয়জন বা আত্মীয়স্বজনদের চারপাশে তারা ঘুরে বেড়ায় এতটুকু মাত্র সমবেদনা ও সান্ত্বনা পাবার জন্যে। কিন্তু যখনি বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনেরা তাদের কোন সম্ভাষণ না জানায় বা তাদের চিনতে না পারে তখনি তারা অত্যন্ত দুঃখিত ও বিচলিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক আতিবাহিক জীবাত্মা নিজের নিজের উপযোগী পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি করে এবং এই সৃষ্টির কারণ বা অবলম্বন স্বরূপ হয় তাদের চিন্তা ও পৃথিবীলোকে কৃতকর্ম"।

যে-সব জীবাত্মা মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করে, তাদের জন্মের উপযোগী সৃষ্টি করেন বাবা-মা নিজেরাই। তাঁরাই আসলে সন্তানদের পরিবেশ সৃষ্টি পরিবেশ করবার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকার অংশ গ্রহণ করেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী নতুন সূক্ষ্মশরীরধারী জীবাত্মাদের ইচ্ছাযুক্ত প্রকৃতি বা মনোবৃত্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাদের ক্ষেত্রের উপযোগী পিতামাতাকে নির্বাচন করে এবং তাঁদের অবলম্বন ক'রেই তারা আবার পৃথিবীতে জন্ম নেয়। ভারতীয় দর্শনে এই সমগ্র জন্মগ্রহণের নিয়মনীতিকে 'পুনর্জন্মবাদ' বলে। বেদান্ত দর্শন

বলে 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'—অর্থাৎ যা কোনদিনই উৎপন্ন হয় না, তা কখনও 'আছে' হ'তে পারে না, আর যা সৎ বা চিরদিন আছে তা কখনো অসৎ বা 'নেই' হতে পারে না। আমাদের সকলের মধ্যেই সংস্কার আছে। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক সবরকমের শক্তি কোনটিই নষ্ট হয় না। উপরন্তু কোন-না কোন ভাবে আমাদের মধ্যে তারা বিরাজিত। আমাদের দেহের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু দৈহিক কোন শক্তি, কর্ম অথবা সংস্কার এবং যে সব পদার্থের উপাদানে আমাদের দেহ গঠিত হয়েছে সেই সব অব্যক্ত আকারে আমাদের মধ্যেই থাকবে। কোনদিনই তার ধ্বংস হবে না। বিজ্ঞান একথা সমর্থন করে। বিজ্ঞানে আমরা একথাও জানতে পারি, যা অব্যক্ত অর্থাৎ বীজাকারে থাকে, তা কোন-না-কোনদিন ব্যক্ত বা কার্যের আকারে প্রকাশিত হবে। তাই অভেদানন্দ বলেন,[৬]

'একটি শরীর ধ্বংস হ'য়ে গেলে শীঘ্রই হোক, বা বিলম্বেই হোক অন্য একটি শরীর আমরা পুনরায় গ্রহণ করবো,।

গীতায় এর সম্বন্ধে সুন্দর কথা আছে।

'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতী নবানি দেহী।'

—গীতা ২।২২

—মানুষ যেমন জীর্ন বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, প্রাণীদের আত্মাও তেমনি জীর্ণ পুরাতন দেহ ত্যাগ ক'রে অন্য নতুন দেহ আবার ধারণ করে।

কেমন ক'রে তা সম্ভব। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন জীবাত্মা যখন বায়ুর আকারে (?) প্রাণীর স্থূলদেহ থেকে বিনির্গত হয় তখন তার আলোকচিত্র তোলা যায়। স্বামী অভেদানন্দ নিজেও ছবি তুলেছেন এবং অন্যান্যদের তোলা ছবিও সংগ্রহ করেছেন। কৌতূহলী পাঠকদের স্বামী অভেদানন্দের লেখা 'Life Beyond Death' (মরণের পারে) গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যেহেতু ঐ গ্রন্থে এ বিষয়ে বহু আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বামীজী বলেছেন যে ক্যামেরা দিয়ে এই সব আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয় তার কলাকৌশল অতি নিপুণ ও সূক্ষ্ম। আমেরিকাতে প্রেততত্ত্ব অনুশীলনী

৬ পুনর্জন্মবাদ, ৩য় সং, পৃ ৩০

সমিতির ব্যবস্থাপনায় পরলোকগামী আত্মাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি প্রেতশরীর তথা বায়বীয় সূক্ষ্মদেহী আত্মাকে ওজন করবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রও সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই পরিমাপ বিজ্ঞান সম্মত কিনা। আগেই বলেছি এই বিজ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞান এক নয়। যাই হোক, অভেদানন্দ বলেছেন মৃত আত্মার আলোকচিত্র গ্রহণের সময় দেখা গেছে, তা জ্যোতির্ময়—যেন তেজঃ পদার্থ। তিনি একে বলেছেন 'এক্টোপ্লাজম্'। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,[৭]

> 'This Ectoplasm is a substance which contains finer matter in vibration, and this finer matter forms the undergarment of the soul, and the gross physical body is the outer garment.'

এক্টোপ্লাজম প্রত্যেকের দেহ থেকে নির্গত হয়। অভেদানন্দ বলেছেন যখন কোন মিডিয়ম বা মাধ্যম সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকে তখন তার দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে এই পদার্থ বেরোয়। তিনি নিজে এ বস্তুটি স্পর্শ করেছেন একথা বলেছেন, কাজেই তাঁর বক্তব্য পুনরায় উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে। তাঁর নিজস্ব ভাষায়, [৮]

> 'I have handled it. There is the particular feeling when we feel Ectoplasm. It can not be described. But when it takes a definite shape, it becomes almost like solid, like flesh of our own body. It can take any form.'

অভেদানন্দ বলেন পুনর্জন্মবাদ বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সকল রকম প্রাকৃতিক সত্য ও নিয়মকে গ্রহণ ক'রে যথাযথ ও যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে প্রকাশ করে। পুনর্জন্মতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ক্রমবিকাশ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পুনর্জন্ম বলতে কোন একটি জীবাণুর নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ ও তার মধ্যে যে সব শক্তি ও তেজ অব্যক্ত আকারে আছে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে তাদেরই পুনঃপ্রকাশ বা পুনরাভিব্যক্তি বোঝায়।

তাছাড়া পুনর্জন্মবাদ 'কার্য-কারণ' নিয়মের উপরও প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি

---

৭ ***Life Beyond Death*** **(1944), p. 42**

৮ **ibid p. 41-42**

থেকে আমরা জানতে পারি যে কারণ কখনও কার্যের বাইরে থাকতে পারে না তা সব সময়তেই কার্যের মধ্যেই থাকে।

আত্মা অকস্মাৎ শূন্য থেকে এসেছে বা তার সৃষ্টি এই প্রথম হয়েছে—এ ধারণা পুনর্জন্মবাদে নেই। পুনর্জন্মবাদে এ কথাই জানা যায় আত্মার অস্তিত্ব অনন্তকাল ধরে ছিল এবং বর্তমানের ধারা বেয়ে অনাগত ভবিষ্যতেও অনন্তকাল ধরে চলবে। যে কোন প্রাণী সুখ বা দুঃখ পায়—তা তার কৃতকর্ম অনুসারে বর্তমান জীবনে আমাদের কৃতকর্ম ভবিষ্যৎ জীবনে ফলরূপে দেখা দেয় অতএব বর্তমান জীবনে আমরা যে কাজই করে থাকি না কেন তার কোনটিই নষ্ট হবে না। স্বামী অভেদানন্দ বলেন,[৯]

'আপনারা একথা মনে করবেন না যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আমাদের জীবনের সমস্ত চিন্তাশক্তি নিঃশেষিত বা নষ্ট হ'য়ে যাবে। না, তা একেবারেই অসম্ভব। একটি জীবনের সমগ্র চিন্তাশক্তি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কখনও নষ্ট হয় না। পরন্তু তারা একটি কারণকেন্দ্রে অব্যক্ত আকারে সঞ্চিত থাকে, অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশ পেলে আবার তা ব্যক্ত আকারে প্রকাশ পায়। কাজেই প্রত্যেক মানুষের আত্মাকে তার সমগ্র চিন্তাশক্তি একটি কেন্দ্রমাত্ররূপে বর্ণনা করতে পারি। এই কেন্দ্রের নাম সূক্ষ্মশরীর এই সূক্ষ্মজীবাণু বা অতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য চিন্তাশক্তিকেন্দ্র বিকাশোন্মুখ সূ শক্তিসমূহকে প্রকাশ করবার মাধ্যম একটি জড়শরীর সৃষ্টি করে। যতদি পর্যন্ত না জীবাণু তার সূক্ষ্মশরীরে কুণ্ডলী আকারে নিহিত সর্বপ্রকা শক্তিসমূহ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে, ততদিন এই সৃষ্টিপ্রবাহ চলতে থাকে'।

অধ্যাপক হাক্সলি পুনর্জন্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্রমবিকাশতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। তিনি বলেছেন,[১০]

'In the theory of evolution, the tendency of a germ to develo according to a certain specific type, e.g. of the Kidney-bea seed to grow into a plant having all characters of 'phaseolu vulgaris', is its 'karma'. It is the 'last inheritor and th

---

৯ পুনর্জন্মবাদ, ২য় সং, পৃ ১০৪-১০৫

১০ *Evolution and Ethics*, p. 95

last result' of all the conditions that have affected a line of ancestry which goes back for many millions years to the time when life first appeared on the earth. The moiety B of the substance of the bean plant is the last link in a once continuous chain extending from the primitive living substance ; and the characters of the successive species to which it has given rise are the manifestations of its gradually modified karma.'

আরও সুন্দর কথা বলেছেন অধ্যাপক রাই ডেভিস (Prof. Rhys Dav's) তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায়,[১১]

'the snowdrop is a snowdrop and not an oak, and just that kind of snow-drop, because it is the outcome of the karma of an endless series of past existences.

মানুষই ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। মানুষ ছাড়া জগতে অন্য কোন উন্নততর বিকাশ সম্পন্ন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় না। কাজেই একথা যদি আমরা বলি যে, দৈহিক বিকাশের চরম উদ্দেশ্য জৈব বা প্রাণী-শরীরের পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করা তাহলে এমন কথা বলা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। সমস্ত বিশ্বে প্রকৃতির নিয়মের উদ্দেশ্য ও প্রণালী যদি একই রকমের হয় তাহলে বৌদ্ধিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হবে যখন এগুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। বুদ্ধির চরমবিকাশ হ'লো বৌদ্ধিক পরিপূর্ণতার। তা যদি হয় তাহলে মানুষের মন শুদ্ধ হতে থাকে।

মানুষের যখন আধ্যাত্মিকভাবের স্ফুরণ হয় এবং সেই ভাবে সে উদ্বুদ্ধ হয় তখন তার পশুপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে দুর্বল ও পরে নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়। উন্নত প্রবৃত্তিগুলি বিকাশের পর নিম্ন-প্রবৃত্তিগুলি সংকুচিত হয়। সেই শক্তির রূপান্তর ঘটে। পরে সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়, আর কখনও তারা বিকশিত বা ব্যক্ত হয় না এবং তখনই মানুষ সমস্ত নীচ বা পশুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্তিলাভ করে। প্রাণীদের আত্মা বিভিন্ন স্তরে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়। পশুশরীরের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হ'লে আত্মায় পশুপ্রবৃত্তির বিকাশ হয়।

১১ *Hibbert Lecturers*, p. 114.

অথবা সূক্ষ্ম মানবদেহে প্রকাশ পেলে তাতে মানবীয় সূক্ষ্ম শক্তি সমূহের বিকাশ ঘটে। প্রাণীদের সূক্ষ্মশরীর পশুপ্রবৃত্তি থেকে ক্রমান্বয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভূমিতে প্রকাশিত হবার পর তারা দিব্যভাবের অধিকারী হয়। কাজেই একথা সত্য যে সূক্ষ্মশরীরের বিভিন্ন প্রকার বিকার বা পরিবর্তন হয়। অতএব যে কোনও একটি জন্মে বা শরীরে যখন পাশবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক এই সব স্তরের বিকাশ সম্ভবপর নয় তখন 'পুনর্জন্ম' নীতি স্বীকার ক'রে নিতেই হয়—একথা বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ।

বিদেহী আত্মা কি আবার দেহধারণ করতে পারে—এ প্রশ্নের উত্তরে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,[১২]

'পারে। বিদেহী প্রেতাত্মাদের সূক্ষ্মাবরণ বা সূক্ষ্মদেহ মিডিয়মের শরীর থেকে বায়বীয় আকারের এক্টোপ্লাজম্-রূপ উপাদান আহরণ ক'রে জড়দেহ ধারণ করতে পারে। তবে ঐ যে প্রাণশক্তি আহরণ করে সেটা মিডিয়ম যখন অচেতন অবস্থায় থাকে তখন। তারা আত্মপ্রকাশ করে ছায়ার আকারে। কখনও কখনও তারা চলাফেরা করে, কথা কয় প্রভৃতি। যে-সব লোকের মনের শক্তি খুব বেশি তারা ঐ ভৌতিক ছায়া-শরীরটা দেখতে পায়'।

প্রেতাত্মারা কি আবার পৃথিবীতে জন্মায় এ প্রশ্নের উত্তরে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,[১৩]

'হ্যাঁ, জন্মায় বৈ কি। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার বাসনা-কামনার বাঁধন ছিঁড়তে বা জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে অতিক্রম করতে পারে ততক্ষণ তাকে বার বার পৃথিবীতে জন্মাতেই হবে। অল্প বা বেশিক্ষণ পরেই হোক বিদেহী আত্মারা নূতন জীবন নিয়ে পৃথিবীতে জন্মাবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করে। অতৃপ্ত বাসনার বীজ তাদের বাধ্য করে পৃথিবীতে আবার জন্মাবার জন্য। কাজেই জন্মাবার আগে তাদের মন বা ভাবের অনুযায়ী তারা মাতাপিতা, পরিবেশ ও আবেষ্টনী নির্বাচন করে। আবার তারা অচেতন অবস্থায় উপনীত হয়, তাদের সূক্ষ্মদেহের মৃত্যু হয় যেমন জড়দেহের মৃত্যু হয়েছিল পৃথিবীর উপর। সৃষ্টি ও বিনাশের প্রবাহে প'ড়ে তারা আংশিক

১২ মরণের পারে (পরিবর্ধিত ২য় সং) ১৯৬১, পৃ ১৬৯

১৩ ঐ পৃ ১৬৯-১৭০

তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে এসে ধীরে ধীরে তাদের পূর্বেকার ঘুমের অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে থাকে'।

আত্মাকে ঈশ্বর বা অপর কোন দেবতা সৃষ্টি করেন একথা হিন্দুরা মানেন না। তাহলে আত্মা কি? তা হ'লো অজ অর্থাৎ জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত। হিন্দুরা নে করেন মৃত্যুতে আত্মার ধ্বংস হয় না, তাঁরা মনে করেন মৃত্যু মানে দেহান্তর াপ্তি। এই মৃত্যু জীবনের নিত্য সহচর। পার্থিব জীবনে পরিবর্তন অথবা ূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। প্রতিদিনই কোন না কোন রকমের পরিবর্তন বা 'মরণ' চ্ছেই। যেমনি দেহ কোষের কথা। রক্ত কণিকার কথা। তারা জন্মাচ্ছে াবং মরেও যাচ্ছে। আবার সেখানে নতুনের সৃষ্টি হচ্ছে।

বজ্ঞানীপ্রবর অধ্যাপক টমাস হাক্সলি বলেছেন,[১৪]

> 'শারীরতত্ত্ব মানুষের জীবন সম্বন্ধে যে কথা বলে তার অর্থ সুগভীর এবং তার তুলনায় রোমীয় কবির ব্যাখ্যায় দৈন্য দেখা যায়। জীবন ছত্রাক কি মহীরুহ, পতঙ্গ কি মানুষ যে-কোন রূপই নিক না কেন, তার আদিরূপকে শুধু যে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হতেই হয়, এর খনিজ এবং প্রাণহীন উপাদানগুলির মধ্যে মিশে যেতে হয় তাই নয়। একে সর্বদাই মরতে হয়। কথাটা বিপরীত শোনাবে—যদিও তবু বলতে হয় যে, না মরা পর্যন্ত জীবন বাঁচতে পারে না'।

াহলে দেখা যাচ্ছে দেহের প্রত্যেকটি কণিকার পরিবর্তন হ'লেও আমরা বেঁচে । আমাদের জীবনধারায় কোন বিচ্ছেদ আনে না। শৈশব থেকে বার্ধক্য আমাদের আমিত্ব বোধ অথবা স্বরূপত্বের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। ামিত্ব-বোধের' যে অবিচ্ছিন্নতার কথা বলা হ'লো তাকে পদার্থবিদ্যা বা ায়নশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানে আমরা পড়ি থেকেই গতির সৃষ্টি। তাহলে একথা ধ'রে নেয়া যেতে পারে দেহের বিক গতি যে চৈতন্য সৃষ্টি করে তা নিশ্চয় কোন উচ্চতর শক্তির প্রভাবে। শক্তিকে 'আত্মা' বলা যেতে পারে। দেহে যে সব পরিবর্তন ঘটে তার কোন াব আত্মার উপর পড়ে না। আত্মার কোন রূপান্তর বা মৃত্যু নেই। এই ত্মাকেই চেতনার অবিচ্ছিন্নতা ও ব্যক্তিত্ব বোধের মূল রূপে ধরা হয়েছে। ই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে দেহের কোষ বা কণিকার—যখন পরিবর্তন

[১৪] *Evolution and Ethics.*

ঘটে তখনও আমরা ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকি এবং বলাবাহুল্য তার অন্তিম রূপান্তরের পরেও ঐ ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবো। গীতায় আছে—

'দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ (২।১৩)

—জীবিত কালে শৈশব, যৌবন ও পরিণত দেহের রূপান্তরের পরও আমরা যেমন বেঁচে থাকি আমাদের বিশিষ্ট সত্তা নিয়ে, মরণের পরও তেমনি অনন্তকাল বেঁচে থাকব আমাদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে।

আত্মার পুনর্জন্ম হ'তে হ'লে তার আগে তার একটা চৈতন্যময় সত্তা থাকা চাই। এই সত্তা স্থূল দেহ থেকে স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানীরা বলেন একটি জীবন-কণিকা তথা প্রাণপঙ্ক বিবর্তিত হয়ে মানুষের রূপ ধারণ করে। একথা যদি মেনে নেয়া যায় তাহলে মনে করতে হবে সেই জীবন-কণিকাটির মধ্যে থাকে অদৃশ্য অতি-সূক্ষ্ম শক্তিকেন্দ্র। তার নিজস্ব কোন রূপ নেই। তা মানুষ, পশু বা যেকোন প্রাণীর রূপ নিতে পারে। 'পুনর্জন্মবাদ' বিবর্তন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অভেদানন্দ বলেন,[১৫]

'সূক্ষ্ম প্রাণবীজ কতকগুলি বাসনা চরিতার্থ ও কর্মের অনুষ্ঠান করবার জন্য দেহ ধারণ করে। মানবীয় আত্মা পশুদেহ ধারণ করে না। বিবর্তনবাদের নিয়ম অনুসারে সে মানবীয় স্তরেই থাকে, তাকে নীচে নামতে হয় না। চেতনার নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তরে জীবাত্মা চলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চ করতে করতে। একথা অবশ্য সত্য যে, উপনিষদে মানবীয় আত্মার অধঃপত ও পশ্চাদ্বর্তনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জীবাত্মাকে পশু দেহ ধারণ করতে হবে। যে আত্মা মানবীয় শক্তি লাভ করেছে, পশুদেহ পছন্দ করবে—এটা কেমন অসংগত কথা ব'লে মনে হয় না কি! একটা ছোট আধারে কি বড় জিনিস ধরে? তবে এই হ'তে পারে যে মানুষের দেহ নিয়েও পশুর মতন জীবাত্মা জীবনযাপন করতে পারে। আত্মার এই যে পশু স্বভাব—এ'হয় অসৎ চিন্তা ও কাজের ফলে। চিন্তা ও কাজের ফল ফলতে বাধ্য। কর্মের ফল অবশ্যই ভোক্তব্য; অপরিহার্য ও অনিবার্য। কিন্তু এই যে পশু স্বভাব জীবাত্মা লাভ করে তাও সাময়িক; এই অবস্থায় থেকে আত্মা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন

১৫ মরণের পারে—'আত্মার পুনর্জন্ম', পৃ ৪২-৪৩

সেই অবস্থা থেকে সে আবার উচ্চস্তরে যায়। ভুলের জন্যই মানুষ অসৎ কর্ম করে, আর অজ্ঞানতা বশতঃ সেই ভুল হয়। ভুল করে না এমন মানুষ জন্মায় না। এই ভুল থেকেই আরো শিক্ষা লাভ হয়। একটা জন্মে সব অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব ব'লে আরো জন্মের দরকার হয়, অবশ্য একথা আমরা বিশ্বাস না ক'রে পারি না। কাজে কাজেই পুনর্জন্মবাদ মানতে হয়'।

নর্জন্মবাদ এবং বংশানুক্রমিতা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। কাজেই বংশানুক্রমিতা বন্ধে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত। যারা বংশানুক্রমিতায় বিশ্বাসী রা মানুষের আত্মাকে স্থূলশরীর থেকে পৃথক একটি সত্তা স্বীকার করতে চায়। তারা বর্তমান জন্মের আগেও আমাদের আত্মার অস্তিত্ব ছিল কিনা অথবা ত্যুর পরেও তার অস্তিত্ব থাকবে কি না এ নিয়ে ভাবে না। স্বামী অভেদানন্দ শানুক্রমিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন[১৬],

'যাঁরা বংশানুক্রমিতায় (heredity) বিশ্বাস করেন তাঁরা স্থূল দেহ, মস্তিষ্ক অথবা স্নায়ুমণ্ডল থেকে আলাদা চৈতন্যময় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মনীষী ডারউইনের হাতে এই মতবাদ সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে। বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে দেখা যায়, কি পশু ও কি মনুষ্যগত— সর্বত্রই সন্তান যে মাতাপিতার অনুরূপ স্বভাব চরিত্র ও শরীর লাভ করবে এমন কোন বাঁধাধরা প্রাকৃতিক নিয়ম নেই, বরং এ সমস্যা আরও জটিল হ'য়ে উঠেছে। কি ভাবে একটি অণুকোষের মধ্যে মাতাপিতার শারীরিক গঠনের যাবতীয় বংশানুক্রমিক প্রবণতা, তাদের প্রকৃতি, মন ও আত্মা নিহিত থাকে তা সত্যিই জানার বিষয়। ডারউইনের মতে জন্মগ্রহণের পরও প্রাণীদের শরীরের প্রত্যেকটি অংশ নূতনভাবে আবার গ'ড়ে ওঠে। শরীরের সমস্ত অণুকোষ থেকে অতিসূক্ষ্ম আকারের পরমাণু সকল ক্রমাগত নির্গত হয়। এই পরমাণুগুলি পুনরুৎপত্তিশীল অণুকোষে সঞ্চিত হয়। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত প্রাণীর শরীর থাকবে ততদিন কোন-না-কোন শারীরিক পরিবর্তন অণুকোষগুলিতে সংক্রমিত হ'তে থাকে। গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসও অনেকটা এই ধরণের মতবাদ সমর্থন করতেন। কিন্তু অধ্যাপক গলটন, রথ, আগাস্ট ওয়াইজম্যান প্রভৃতি মনীষীরা এই

১৬ ***Reincarnation*** (৩য় সং), পৃ ৩৩—৩৫

বংশানুক্রমিক মতবাদ খণ্ডন করেছেন। তাঁরা বলেছেন অর্জিত প্রকৃতি বা সংস্কার একজন থেকে অন্যে সংক্রামিত হয় না। মাতাপিতারা নিজের চেষ্টায় কোন একটি বা একাধিক স্বভাব অর্জন করতে পারেন সত্য, কিন্তু সেই স্বভাব বা স্বভাবগুলিকে তাঁদের সন্তানদের ভিতর কখনও সংক্রামিত করতে পারেন না। আগাষ্ট ওয়াইজম্যানের মতে কোন প্রাণীর অর্জন করার প্রবৃত্তি না থাকলে নূতন কোন জিনিস সে আর জীবনে সঞ্চয় করতে পারে না। ওয়াইজম্যান জীবাণুর ক্রমসংসরণবাদ (continuity of th germ plasm) প্রবর্তিত করেন। মাতাপিতা থেকে উত্তরাধিকার সূ আমরা সব কিছুই পাই, অথবা বংশ পরম্পরাক্রমে মাতাপিতার স্বভাব প্রকৃতি প্রথমতঃ তাদের সন্তানদের ভিতর হয়তো প্রবল হয়, দ্বিতীয়তঃ পিতামহের প্রকৃতি ও সংস্কার, তৃতীয়তঃ—মাতামহীর, চতুর্থতঃ- প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রমাতামহের প্রকৃতি বা স্বভাব হয়তো সন্তানদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়—এই ধরণের প্রাচীন মতবাদ ওয়াইজম্যান সমর্থন করেন না। তিনি বরং প্রাণ বা জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন। ওয়াইজম্যান বলেছেন, যখনি রাসায়নিক ও সর্বোপরি আণবিক গঠনের সাথে এক ধরণের পদার্থ কোন একটি বংশ (generation) থেকে অন্য বংশে সংক্রামিত হয় তখনি বংশানুক্রমিতারূপ ধারার ঠিক ঠিক ভাবে উৎপত্তি হয়। তিনি এই পদার্থটির নাম দিয়েছেন জীবাণু বা প্রাণপঙ্ক। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন ওয়াইজম্যানের মতানুসারে কোন একটি প্রাণীর মধ্যে যে সব প্রকৃতি বিকশিত হয় তাদের সব বৈশিষ্টই ঐ জীবাণুর মধ্যে থাকে প্রাণপঙ্কের অনুগুলি ভিতরে বিকশিত ও বর্ধিত হয়। জীবাণগুলি একটি বংশ থেকে অন্য বংশে সংক্রমিত হয়, আর তাদের মধ্যে একই রকমের পারমাণবিক বা আণবিক গঠন থাকার জন্যে নির্দিষ্ট কোন একটি বিকাশকে অবলম্বন ক'রে তারা অনুরূপ স্তরের মধ্যে দিয়ে যায়। ওয়াইজম্যান বীজাণুদের ধারাবাহিক স্বীকার করেছেন। একারণেই তিনি বলেছেন প্রাণীরা পুনঃপুনঃ জন্মগ্র করে। তিনি বলেছেন, শিশু সন্তানদের প্রকৃতি বা চরিত্রের সবটাই তাদের মা বাবার কাছে ধার করা নয়। কেবল যে-প্রকৃতিগুলি বীজের আকারে তাদে সন্তানদের মধ্যে সুপ্ত থাকে সেগুলিই বংশানুক্রমে সংক্রামিত হতে ওয়াইজম্যানের যুক্তি থেকে একথা সহজেই অনুমেয় মা-বাবা কোনদি

াণপঙ্ক সৃষ্টি করতে পারেন না। প্রাণবীজগুলি শাশ্বত, তারা মা-বাবার ন্ম-মৃত্যুর আগে এবং পরেও বিশাল প্রকৃতির গর্ভে লীন থাকে, কদাপি নষ্ট য় না।

ওয়াইজম্যান বলেছেন,—[১৭]

'...It follows that the transmission of acquired characters is an impossibility, for if the germ-plasm is not formed a new in each individual, but is derived from that which preceded it, its structure, and above all, its molecular constitution, can not depend upon the individual in which it happens to occur, but such an individual only forms, as it were, the nutritive soil at the expense of which the germ-plasm grows while the latter possessed its characteristic structure from the begining viz before the commencement of growth. But the tendencies of heridity of which the germ-plasm grows, while the latter possessed its characteristic structure from the beginning, viz. before the commencement of growth. But the tendencies of heredity, of which the germ-plasm is the bearer, depend upon this very molecular structure, and hence only those characters can be transmitted through successive generations which have been previously inherited, viz those characters which were potentially contained in the structure of the germ-plasm. It also follows that in those other characters which have been acquired by the influence of special external conditions, during the life-time of the parent, cannot be transmitted at all.'

মহর্ষি পতঞ্জলি পুনর্জন্মবাদ স্বীকার ক'রে বলেছেন, 'সংস্কারসাক্ষাৎ করণাৎ ূর্বজাতিজ্ঞানম্'। আমাদের অবচেতন মনে সঞ্চিত সুপ্ত সংস্কারগুলিতে াদি মনঃসংযোগ করা যায় তাহলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয় এমন দৃষ্টান্ত আমাদের

১৭ *Heridity*, Vol I. P. 273

দেশে বিরল নয়। সংবাদপত্রে আমরা জাতিস্মরের সংবাদ পেয়ে থাকি। বহু রকমের পরীক্ষা ক'রে জাতিস্মরদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন বহুজনে। এছাড়া ভারতীয় যোগীরা অবচেতন মন বা স্মৃতির উপর মনঃসংযোগ ক'রে বহু বহু আগেকার জীবনের সকল ঘটনা জানতে পারতেন তার নজিরও আছে। যদি এসব ঘটনাকে সত্য ব'লে মেনে নেয়া যায় তাহলে পুনর্জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের স্পৃহা একেবারেই হ্রাস পাবে।

জন্মান্তর-সম্পর্কে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫।১১, ১২) সুন্দর বক্তব্য আছে

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ (৫।১১)

এবং— স্থূলানি সূক্ষ্মানি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ (৫।১২)

এর মূল কথা হলো আত্মার জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে। কর্ম অনুসারে দেহ পর পর নানারূপ গ্রহণ করে অনেক স্থানে স্থূল সূক্ষ্ম বহুরূপই দেহী বরণ ক নেয় আপন স্বভাবগুণে।

জন্ম-জন্মান্তরের ধারা বেয়ে জীবাত্মা রূপ থেকে রূপান্তরে আবর্তিত হ অবশেষে 'মানবসুলভ ব্যক্ত চেতনার ভূমিতে আবির্ভূত হয়েছে মানবোত্ত উর্ধ্বপরিণামের সম্মুখে এগিয়ে যাবার প্রেরণা নিয়ে একথা আমরা উপলা করতে পারি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতিকে নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করলে আমরা সহজেই দেখতে পাই পর্বে পর্বে এগিয়ে চলেছে প্রকৃতি-পরিণা এবং তার প্রত্যেক পর্বে অতীতের সমাহরণ ও রূপান্তরণের সাহায্যে সৃষ্ট হ অভিনব পর্বের সূচনা। মানুষের বেলাতেও এ নিয়মের অন্যথা ঘটে f যেহেতু মানুষ এই মহা-বিশ্বপ্রকৃতির আত্মজ মাত্র। পৃথিবীর বিবর্তনধার সমগ্র ইতিহাস স্বাক্ষরিত মানুষের মধ্যে। জন্মান্তর প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ চমৎ কথা বলেছেন[১৮],

১৮ দিব্য-জীবন, ২য় খণ্ড, পৃ ৫০৯-৫১০ (অনুঃ—অনির্বাণ)

'অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মধ্যে আত্মৈষণার আকৃতি না থেকে শুধু যদি থাকত লীলাসম্ভোগের অফুরন্ত উল্লাস, তাহলে চিৎ-পরিণাম ও জন্মান্তরের বিধান হত অনাবশ্যক। অবশ্য চিৎ-স্বভাবের পরমকোটিতে এমন নিরঙ্কুশ রসোল্লাসও যে নেই, তা নয়। কিন্তু এ-জগতে তাঁর অদ্বৈতভাব সংবৃত হয়েছে বিভজ্যবৃত্ত মনের লীলায়, আত্মবিস্মৃতির অতল গভীরে হারিয়ে গেছে তাঁর অবিকল্পিত একত্বের ধ্রুবা স্মৃতি, বিবিক্ত ভেদভাবনার লীলাই উদগ্র হয়ে ফুটেছে সকল বিভূতির পুরোভাগে—যদিও এ ভেদভাব প্রাতিভাসিক, কেননা ভেদে অভেদের তত্ত্বভাব অখণ্ডিত মহিমায় নিগূঢ় হয়ে আছে তারি অন্তরালে। এই ভেদের লীলা চরমে উঠেছে মনঃকল্পিত খণ্ডতাবোধে, যখন বিভজ্যবৃত্ত মন দেহকে আশ্রয় করে সহসা জেগে উঠেছে বিবিক্ত-অহংএর চেতনা নিয়ে'।

জড় সমাধির সূত্রে বিশ্বের যে বিসৃষ্টি, তার মধ্যে বিবিক্ত বিগ্রহকে আশ্রয় ক'রে সুরু হয় প্রাণের লীলা। একারণেই 'জড়ের জগতে পরমপুরুষের সঙ্গে বিশ্বযোগের সম্বন্ধে যুক্ত হতে ব্যষ্টি-পুরুষকে আশ্রয় করতে হয় একটা বিবিক্ত বিগ্রহ অর্থাৎ তাকে জন্মাতে হয় শরীরী হয়ে। দেহকে ভিত্তি করে, তারি আশ্রয়ে এ-জগতে সুরু হয় তার প্রাণ মন ও চেতনার প্রগতি সাধনা'। অতএব মর্ত্যভূমিতে আসতে গেলে পুরুষের আর কোনও উপায় নেই দেহ-পরিগ্রহ ছাড়া।

একথা হয়তো মেনে নিতে বাধা নেই যে, পৃথিবীতে মানুষের জন্ম একটা সুদূরাগত জন্ম-পরম্পরার অনিঃশেষিত শেষ পর্ব। এই জড়বিশ্বে প্রাণের সুতো দিয়ে গাঁথা হয়েছে যে জড় বিগ্রহের মালা, তার প্রতিটি ফুল ছুঁয়ে আসতে হয়েছে জীবাত্মাকে। এখানে দুটি প্রশ্ন সনাতন। তার অবতারণা আগেও করেছি। মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবার পরও কি জন্মান্তর প্রবাহ চলতে থাকে ? যদি বা চলে তাহলে তার ধারা কোন দিকে। এ ছাড়া আরও একটি প্রশ্ন স্বতঃই জেগে ওঠে। একবার মানবভূমিতে আসার পরও কি জীবাত্মা ফিরে যেতে পারে পশু যোনিতে। এ সম্বন্ধে অভেদানন্দ যা বলেছেন তার আলোচনা করা হয়েছে। পশুযোনি থেকে মনুষ্য যোনিতে উত্তীর্ণ হবার সময় জীবচেতনার এমন একটা জাত্যন্তর-পরিণাম ঘটে যার ফলে তার পক্ষে পুণরায় পশুযোনিতে ফিরে যাওয়া সহজসাধ্য নয়, বরং অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু যদি এমন

হয় কোন মানবাত্মায় 'জাত্যন্তর পরিণাম' হয়তো সুদৃঢ় মূল হয় নি, অর্থাৎ তার মধ্যে মানব-চেতনা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নি, তাহলে ? তখন হয়তো বা মানুষের পক্ষে আবার পশুযোনিতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব না-ও হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন[১৯],

'কোনও কোনও মানুষের মধ্যে কোনও—একটা পশুপ্রবৃত্তি এতই উদ্দাম যে, তার বিশিষ্ট তর্পণের জন্য একটা পৃথক আধারের প্রয়োজন হয়। তখন মানুষ হবার পরেও দু-একবারের জন্য তার পশুজন্ম হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু তবু সে—জন্মান্তর তার প্রগতির সরল পথে ক্ষণেকের একটা আবর্তমাত্র।···মোটকথা প্রকৃতি-পরিণামের ধারা এতই জটিল, যে, এ-সম্পর্কে আমাদের কোনও মতুয়ার-বুদ্ধি পোষণ করা মোটেই উচিত নয়। সুতরাং মানুষের পক্ষে পশুযোনিতে ফিরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব না-ও হতে পারে; কিন্তু তা বলে মনুষ্যলোকে উত্তীর্ণ জীবাত্মার যে অতি তুচ্ছ কারণে হামেশাই পশু জন্ম হচ্ছে মানুষ জন্মের মত, লোক প্রবাদের এই অতিরঞ্জনকে মেনে নেওয়া কঠিন। মানুষের পশুজন্ম সম্ভব হোক্ বা না হোক্, একবার যদি জীবাত্মা মানুষের ভূমিতে পৌঁছতে পারে, তাহলে তার পক্ষে আবার নতুন করে মানুষ হয়েই জন্মানোটাই মনে হয় স্বভাবের বিধান'।

জন্মের সঙ্গেই একান্ত আবশ্যক জন্মান্তরের। তা যদি না হয় তাহলে জন্ম হবে পরিণামের ইঙ্গিতহীন একটা সূচনামাত্র—যেন সুদীর্ঘ পথযাত্রার দিকে অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যাবার মত। জন্মান্তর আছে বলেই অপূর্ণ জীবের দেহ-পরিগ্রহেরও একটা সুদূরপ্রসারী সার্থকতা আছে।

১৯ দিব্য-জীবন, ২য় খণ্ড, পৃ ৫১৫-৫১৬ (অনুঃ—অনির্বাণ)

ছয়

অভেদানন্দের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব ও আধুনিক বিজ্ঞান

মহাবিশ্বের অভিব্যক্তি অথবা ক্রমবিকাশতত্ত্ব যেমনি সাধারণ মানুষের কাছে, তেমনি বিজ্ঞানীদের কাছেও বিস্ময়কর অধ্যায়। বহু যুগ ধরে এ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলে এসেছে, কত সমীকরণ, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মালা গেঁথে ভারী হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গ্যালিলিও থেকে সুরু ক'রে আধুনিক কালের বন্ডি, গোল্ড, হয়েল, ম্যাক্‌ক্রিয়া পর্যন্ত সকলেই বহু তত্ত্ব উপস্থাপনা করেছেন, আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যের সম্ভার সাময়িকভাবে বিজ্ঞানী সমাজে আলোড়ন এনেছে, কিন্তু তা বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী এবং অনেকগুলি ক্ষণ-জীবিও। প্রাচীন ভারতে কতিপয় বিজ্ঞানী-দার্শনিক ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব নিয়ে গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করেছেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব হয়তো অতীত স্মৃতি রূপেই বিরাজিত। যেহেতু তা বিদেশের কষ্টিপাথরে যাচাই হবার সুযোগ পেয়ে চিহ্নিত হতে পারেনি। এ ত্রুটি কাদের জানিনে। তবুও সৌভাগ্যের কথা ভারতের অন্ততঃ দুজন মনীষী বিজ্ঞানী-দার্শনিক কপিলের ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বটিকে বিদেশের জ্ঞানী-গুণী সমাবেশে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তান—স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ।

সৃষ্টি সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ সাংখ্য ও বেদান্তের মতকেই একরকম অনুসরণ করেছেন বলা চলে। সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব উপনিষদের ধারা থেকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক, একারণে সাংখ্যের মতকে গ্রহণ করলেও আধুনিক বিজ্ঞান ও ক্রমবিকাশতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী সাহায্যেই তাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য[১]—

'Our mother earth was formed out of a portion of the substance of solar system millions and millions of years ago, and now it is habitable. By this theory of evolution we can

১ *Evolution and Religion* : *Attitude of Vedanta towards Religion*, p. 103

also explain the origin and growth of all human beings step by step.'

অভেদানন্দ মনে করতেন বহু হাজার বছর আগে কপিলের সময়েও বিজ্ঞানের এই ধারা অব্যাহত ছিল। এক প্রকৃতি থেকে সমগ্র জগতের সৃষ্টি হয়েছে, বেদান্তে এই প্রকৃতিকে বলা হয়েছে 'অব্যক্ত'। বেদান্তের মতে এই 'অব্যক্তে' সমগ্র জীবের অদৃষ্ট সংস্কার বা বীজের আকারে সঞ্চিত থাকে। এই ধারণা থেকে অভেদানন্দের মত পৃথক এবং বলা বাহুল্য তা বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয় নি, ক্রমবিকাশের সিঁড়ি বেয়ে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর এই কলেবর এবং তা এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে। সমগ্র সৃষ্টিকার্য নানা বৈচিত্র্যে ভরা।

মুণ্ডকোপনিষদে জগৎ সৃষ্টির ভাষ্য আছে—

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সার্বেন্দ্রিয়ানি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী'॥ (মুণ্ডকো, ২।১।৩)

—এই পুরুষ থেকে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়।

ভাবতে অবাক লাগে বহু হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদ দার্শনিকেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে মন, চিন্তা, মনীষা এবং ইথার এই চারটি এক অবিভাজ্য শক্তিপুঞ্জ থেকে উদ্‌গত হয়েছে বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে। এক উপনিষদেও আছে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। স্বামী অভেদানন্দের কথায়, 'The whole universe, before the evolution of name and from began, remained potentially in that unmanifested cusal state.' এই 'Causal Energy'কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন 'অব্যক্তম্' কেউ বা 'প্রকৃতি' অথবা 'মায়া'।

সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মতবাদ-ই উল্লেখযোগ্য। যেহেতু উভয় দর্শনেই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে স্বীকার করেন। জৈমিনির মতে (পূর্বমীমাংসা) জগতের উৎপত্তি নেই, অতএব বিনাশও নেই। এখন যে অবস্থায় বা নিয়মে জগৎ চলছে, অতীত কালেও এই নিয়মে চলে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। 'ন কদাচিদনীদৃশম্'—কদাচ এর অন্যরূপ নয়। অনাদি অনন্ত কাল ধরে এবং অনাদি ভবিষ্যৎ কাল ব্যাপী জগৎ একভাবে

ও এক নিয়মে চলতে থাকবে। জৈমিনির এই মতবাদ আধুনিক কালের এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের মতের অনুরূপ। আধুনিক বিজ্ঞানের 'স্থির তত্ত্ব' অনুসরণ করলে জৈমিনির মতের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

'তৈত্তিরীয় উপনিষদে' সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যো হন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।' (২।১।৩)

—উক্ত এই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হলো, আকাশ থেকে বায়ু। বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসমূহ, ওষধি থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে পুরুষ (অর্থাৎ মানুষ) উৎপন্ন হ'লো।

সাংখ্যকার 'পঞ্চবিংশতি' তত্ত্ব অবলম্বনে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ক্রমিক ধারা নির্ণয় করেছেন।

'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্
মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং

তন্মাত্রেভ্যং স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চ বিংশতির্গণঃ'।। (সাংখ্যসূত্র ১।৬১)অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি ; প্রকৃতি থেকে মহান, মহান থেকে পঞ্চতন্মাত্রা ও দুই ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রা থেকে পঞ্চস্থূলভূত।

প্রকৃতি কি? সাংখ্যের মতে প্রকৃতি হ'লো জগতের মূলবস্তু। জগতের অব্যক্ত অবস্থা বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা এবং প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা হ'লো জগৎ। প্রকৃতি ত্রিগুণ সম্পন্না-সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এদের বলা হয় প্রকৃতির অঙ্গ, ভাব বা অবয়ব।

পুরুষ বা আত্মার (universal self) সন্নিধিবশতঃ তার তুরীয় (transcendental) প্রভাবে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। তখনই মহাজাগতিক অভিব্যক্তি বা সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে তিনগুণের নির্বিশেষ সংমিশ্রণ ভেঙে হয় সবিশেষ (heterogeneous)। সমষ্টিগতভাবে পরিণামের কোন ব্যতিক্রম হয় না। গুণের পারস্পরিক রূপান্তর হতে পারে। কিন্তু তার বিনাশ ঘটে না।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম, বিকাশ বা বিকার ঘটে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে। তার

ফলে মহত্ত্বের উদ্ভব হয়। একে চেতনার উন্মেষ বলা যেতে পারে। 'প্রকৃতির মধ্যে জগতের প্রথম প্রস্ফুরণ'। প্রকৃতির দ্বিতীয় বিকার হ'লো অহংবৃত্তি। অহংতত্ত্ব আবার দু'রকমের। রাজসিক বা অস্মিতা (empirical ego) এবং তামসিক অহংকার বা তন্মাত্রা (সূক্ষ্মভূত)
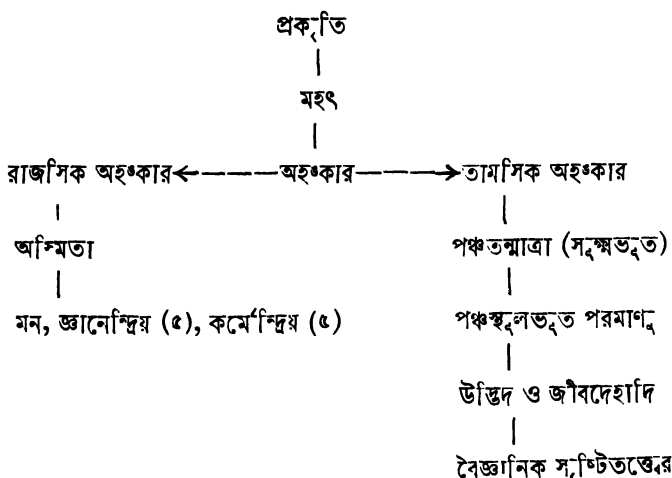
বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের তুলনা করলে সাংখ্য পাতঞ্জল তত্ত্বের উৎকর্ষ বেশ অনুভব করা যায়। সাংখ্যকার কপিল বলেন অবস্তু থেকে বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি বলেন কারণের মধ্যে তার কার্য বা ফল নিহিত। অর্থাৎ 'কারণ' হলো সুপ্ত অবস্থা, যখন ব্যক্ত হলো তখন হ'লো কার্য।

তিনি মনে করতেন ধ্বংস মানে পুণরায় সেই কারণাবস্থায় ফিরে যাওয়া। 'নাশঃ কারণালয়ঃ' (সাংখ্যসূত্র ১, ১১৯)। আধুনিক কালে 'বিগ্ ব্যাং থিয়োরী'র মূলকথা এটি-ই। কপিল বলেছেন প্রকৃতির নিয়ম (law) সর্বত্র একরকম এবং নিয়মিত (regular)। স্থূলেও যা, সূক্ষ্মেও তা একই। মহাজাগতিক শক্তি যাকে প্রকৃতি বলা হয়। তার থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। কপিল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ তত্ত্ব ভালভাবে জানতেন এবং এই তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিনাশে কার্যকরী তা তিনি বলেছেন।

সাংখ্য মতানুযায়ী সৃষ্টি প্রণালীতে সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশ ও প্রলয় বা ক্রম-সংকোচ উভয়টিই স্বীকৃত। সমস্তটাই সেই অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রমবিকাশে উৎপন্ন, আবার ঐ সমস্ত ক্রমসংকুচিত হয়ে অব্যক্তভাব ধারণ করে। সাংখ্য মতে

এমন কোন জড় বা ভৌতিক বস্তু থাকতে পারে না, মহত তত্ত্বের অংশবিশেষ যার উপাদান নয়।

প্রাণের বারবার আঘাতে আকাশ থেকে বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা হয়। এ থেকে বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তি। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে শীতল হতে থাকে, তখন ঐ বাষ্পীয় পদার্থ তরলভাব ধারণ করে, তাকে 'অপ্' বলি। অবশেষে তা কঠিনাকার প্রাপ্ত হলে তাকে বলা হয় 'ক্ষিতি' বা পৃথিবী। সর্বপ্রথমে আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা, তারপর উত্তাপ, তারপর তা তরল হয়ে যায়, আর যখন আরো ঘনীভূত হবে, তখন তা কঠিন জড়পদার্থের আকার ধারণ করবে। ঠিক এর বিপরীতক্রমে সব কিছু অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 'কঠিন বস্তু সকল তরল পদার্থে পরিণত হইবে। তরল পদার্থ কেবল উত্তাপ বা তেজোরাশিতে পরিণত হইবে, তাহা আবার ধীরে ধীরে বাষ্পীয় ভাব ধারণ করিবে, পরে পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হয় এবং সর্বশেষে সমুদয় শক্তির সামঞ্জস্য অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন স্পন্দন বন্ধ হয়। এইরূপে কল্পান্ত হয়। আমরা আধুনিক জ্যোতিষ (জ্যোতির্বিদ্যা) হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের এই পৃথিবী ও সূর্যের সেই অবস্থা পরিবর্তন চলিয়াছে, শেষে এই কঠিনাকার পৃথিবী গলিয়া গিয়া তরলাকার এবং অবশেষে বাষ্পাকার ধারণ করিবে।২

সাংখ্যকার কপিল বলেন এই জগৎ সৃষ্ট হয় নি, তার স্রষ্টা কেউ নেই। জগতের ক্রমবিকাশ হয়েছে। তিনি বলেছেন প্রকৃতি ই এই জগতের কারণ।

'মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্' (সাংখ্যদর্শন ১।৬।৭)

—প্রকৃতিই সকলের মূল, তার মূলে কেউ নেই। কোন এক পরম পুরুষ জগতের সৃষ্টি কর্তা—এমনি যে প্রবাদ আছে তার সম্বন্ধে কপিল বলেছেন,

'প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতানেষ্যাং কার্যত্বশ্রুতে' (সাংখ্যদর্শন ৬।৩২) অর্থাৎ 'প্রকৃতিই হচ্ছে আসল সৃষ্টিকর্তা, পুরুষেতে তার আরোপ হয় মাত্র'। জগতের ক্রমবিকাশ হয় প্রকৃতি থেকেই।

'নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ' (সাংখ্য ১।৭৮)—অবস্তু থেকে বস্তুর, অভাব থেকে ভাবের অথবা নিরাকার ব্রহ্ম থেকে সাকার জগতের সৃষ্টি হতে পারে না।

---

২ স্বামী বিবেকানন্দ, সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, (স্বামীজীর বানী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃ ১৭)

অথচ 'শ্রুতি'তে বলা হয়েছে জগতের সৃষ্টিকারী ঈশ্বর। তাহলে তাকে কি ভুল বলবো? এর উত্তরে কপিল বলেছেন, 'মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা-সিদ্ধসব্যা।' (সাংখ্য ১।৯৫)—অর্থাৎ শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে তা মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষের প্রশংসাপত্র মাত্র। সেখানেও যে ঈশ্বরই সৃষ্টি কর্তা এমন কোন উল্লেখ নেই।

সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব থেকে আমরা একটি বিশেষ সত্যে উপনীত হতে পারি। স্বামী অভেদানন্দ এ বিষয়ে তার মত ব্যক্ত করেছেন,৩

'Here we find the first idea of the correlation of forces which manifest in the subjective and objective world. In that state there is no creation, no phenomena. When the balance of these forces is disturbed then begins the process of evolution. This process continues for millions of years and afterwards begins the cosmic involution or dissolution. The process of involution is only the reverse process of evolution. Evolution is followed by involution, and involution is again followed by evolution. The chain of evolution, involution and again evolution, is a circle. It is beginningless and endless'

এই যে ক্রমবিকাশবাদ, ক্রমসঙ্কোচবাদ, বৃত্তাকারে বিবর্তনের কথা অভেদানন্দ বলেছেন তার সমর্থন আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে মেলে। বিজ্ঞানী পিয়ের টেলহার্ড দ্য সার্ডিন বলেন, ৪

'Thus wherever we look on earth, the growth of the 'within' only takes place thanks to a doubly related involution', the coiling up of the molecule upon itself and coiling up of the planet upon itself. The initial quantum of conciousness contained in our terrestrial world is not formed merely of an aggregate of particles caught fortuitously in the same net.'

৩ ***Cosmic Evolution and its Purpose* : *Philosophy and Religion*.** pp. 89-90

৪ ***The Phenomenon of Man*, p. 73-74 : Pierre Teilhard De Chardin**

ৃষ্টি বলতে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন 'পরিবর্তন'। পরিবর্তন বা রূপান্তর
ানেই অভিব্যক্তি বা বিকাশ। এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির
াগে কি ছিল। অভেদানন্দ বলেন, আমরা এসেছি সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মসমুদ্র থেকে
াবার সেখানেই ফিরে যাব। তিনি আরও বলেছেন,

'একেবারে ধ্বংস ব'লে কোন জিনিসই নেই, জগতে ধ্বংস বলতে কার্যেরই
ারণাবস্থায় ফিরে যাওয়া বোঝায়। আমাদের কোনদিনই ধ্বংস হবে না;
াার্থিব শরীর আমাদের নষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু যে পঞ্চভূত বা আদি পঞ্চতন্মাত্র
থকে সৃষ্টি লাভ করেছি, সেখানেই আমরা যাব ফিরে, নতুন বিশ্বের সৃষ্টি
ুবে, আমরাও অনন্তকাল বেঁচে থাকব। পুরাতন এই জড় পৃথিবীটা ধ্বংস
হ'য়ে গেলেও গড়ে উঠবে তার বুকে আবার নতুন পৃথিবী, নতুন পৃথিবীর সংগে
সংগে সৃষ্টি হবে নতুন সৌরজগৎ ও নতুন গ্রহ-উপগ্রহ: এটাই প্রকৃতি বা
সৃষ্টির নিয়ম। এই অনন্ত সৃষ্টি প্রবাহের মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকব। এর
নামই ব্রহ্মের লীলা, লীলার বা স্বেচ্ছায় নিরাসক্ত খেলার ভিতর আমরা নিজের
স্বরূপের কথা ভুলে যাই, আমরা সত্যিকার কি ও কি যে আমরা করছি এসব
কথাই একেবারে বিস্মৃত হয়ে যাই। আমরা খেলা করি শিশুর মতো—শিশুরা
যেমন চোখ বেঁধে খেলে রাস্তার উপর কানামাছি খেলা,[৫]

মোটকথা অবচেতন মন বা অব্যক্ত থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে একথা
অভেদানন্দ স্বীকার করেছেন। এই অব্যক্তের আর এক নাম সগুণব্রহ্ম, যিনি
'কারণাবস্থায় অব্যক্তচৈতন্য ঈশ্বর এবং কার্যাবস্থায় ব্যক্তচৈতন্য হিরণ্যগর্ভ"।
অভেদানন্দ বলেন এই কার্য কারণরূপী ঈশ্বর বা ব্রহ্মাকেই বলা হয় বিশ্বস্রষ্টা।
সৃষ্টি যতক্ষণ থাকবে, স্রষ্টার অস্তিত্বকেও ততক্ষণ মেনে নিতে হবে।

স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্বন্ধে
আলোচনা ক'রে বলেছেন।

'উদাহরণ রূপে স্রষ্টার ধারণা সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক্। স্রষ্টা কি মায়া
নির্মুক্ত শুদ্ধব্রহ্ম না স্রষ্টা সৃষ্টির মুখাপেক্ষী, সৃষ্টিকে অপেক্ষা করেই স্রষ্টার
আসন নির্বাচিত হয়েছে, তাই সৃষ্টির সংগে স্রষ্টার অবিচ্ছেদ্য ও আপেক্ষিক
সম্বন্ধ। সৃষ্টির ধরনা যদি মন থেকে মুছে দেওয়া যায়, তবে স্রষ্টারূপ
ভগবানের অস্তিত্বও আর থাকে না। তাই 'স্রষ্টা' বা 'ঈশ্বর' এক একটি

***Our Relation to the Absolute*, p. 184**

নাম বিশেষ, এই নামের সঙ্গে নামীর থাকে একটি সম্পর্ক, সেই সম্পর্কই বিশেষিত ক'রে নামীকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলে—আসলে তা যাই হোক না কেন। সুতরাং একথা সত্যি যে, বিশ্বস্রষ্টা বা ঈশ্বর মায়ানির্মুক্ত শুদ্ধব্রহ্ম নন।'

কপিল বলেন

প্রকৃতের্মহাংস্ততো অহংকারস্তস্মাদগণশ্চ ষোড়শ কঃ

তস্পাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি। (সাংখ্যকারিকা ২২ শ্লোক)

প্রকৃতি থেকে মহৎ বুদ্ধি, মহৎ থেকে অহংজ্ঞান, অহংজ্ঞান থেকে ষোড়শ তত্ত্ব এবং তার চেয়ে নিকৃষ্ট স্থূল পঞ্চতত্ত্ব থেকে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়েছে। কপিল বলেন মহৎ-ই সমস্ত বিশ্বের কারণ, প্রকৃতির প্রথম ফল। অহংকার থেকেই সকল ভূতের উৎপত্তি।

কপিলের মতে এই জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল। এখানে রূপান্তর হচ্ছে অবিরাম। কোন কিছুই স্থির নেই। বস্তুবাদী দার্শনিক কপিলের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিকদের মতো যান্ত্রিক বলা যেতে পারে। তাঁর যুগে লৌহ নির্মিত বা বাষ্পচালিত যন্ত্রের প্রচলন না থাকলেও কাঠের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। একারণে ঐ যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব কপিলের উপর পড়েছে তা ভাবা অস্বাভাবিক নয়।

অভাব থেকে কোন বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নয় এ কথা মানলেও অভাবের অভাব থেকে তার উৎপত্তি হতে পারে তা কপিল যদিও অস্বীকার করেছেন কিন্তু উপনিষদে তা স্বীকার করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'অথাতো আদেশ নেতি নেতি' এই কথার সাহায্যে অভাবের অভাব বোঝানো হয়েছে। গণিতেও আমরা অনুরূপ বিষয়ের সংস্পর্শে আসি।

এখন সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত কি তা পর্যালোচনা করা যাক। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার ফলে দেখেছেন যে জড়বিশ্বের আদিম উপাদান হ'লো হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন পরমাণুর ঘন সংযোগের ফলে গড়ে উঠেছে অন্যান্য যাবতীয় মৌলের পরমাণু। পরমাণু থেকে সৃষ্টি হয়েছে অণু, যৌগিক অণু এবং তার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুনিচয়—আকাশের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র থেকে সুরু করে পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণা পর্যন্ত। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্ট হয়েছে

প্রোটন ও ইলেকট্রনের মিলনে। প্রশ্ন উঠেছে এই হাইড্রোজেন পরমাণু এসেছে কোথা থেকে? জ্যোতির্বিজ্ঞানী অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে মহাকাশে নীহারিকার অস্তিত্ব নিরূপণ করেছেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, নীহারিকা হ'লো তারকারাজি, গ্রহ, উপগ্রহ ও মেঘরূপী গ্যাসের সমাবেশ। আমাদের পৃথিবী ও সৌরমণ্ডল এমনি একটি চাকতির আকারের নীহারিকার প্রান্তদেশের অতি সামান্য এক অংশ জুড়ে আছে। তাঁরা বলেন ছায়াপথও ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আমাদের নীহারিকার সবচেয়ে কাছে যে নীহারিকা তার নাম হ'লো এ্যাণ্ড্রোমিডা। এর দূরত্ব ৭ লক্ষ আলোক-বৎসর।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, নীহারিকাগুলির মধ্যে তারকারাজির পশ্চাতে হাইড্রোজেন গ্যাস সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে থাকে। যে নীহারিকার অংশ আমাদের সৌর জগৎ সেটিও আদিতে ছিল ঘূর্ণায়মান গ্যাসের সমষ্টি। কোন তারকা তখনও জন্ম নেয় নি। এই গ্যাস ঘনীভূত হয়ে জন্ম দিল তারকার। ঠিক একইভাবে আরো সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর রূপে পরিব্যাপ্ত গ্যাস থেকে মহাশূন্যে ঘটে নীহারিকার উৎপত্তি একথা বিজ্ঞানীরা বলেন। এই প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন নীহারিকা কখনও মহাকাশের নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে বসে থাকে না। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে তারা অবিরত এক স্থান থেকে অন্যস্থানে তড়িৎগতিতে চলে যাচ্ছে। পালিয়ে যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টি সীমানা থেকে। আমাদের অতি নিকটবর্তী যে সব নীহারিকা, তাদের গতিবেগ ঘণ্টায় এক কোটি মাইলেরও বেশি। যারা আরো দূরে তারা আরো বেগে প্রায় ঘণ্টায় কুড়ি কোটি মাইল বেগে ছুটে চলেছে। নীহারিকার দূরত্ব যত বাড়ে, তাদের গতিবেগও তত বেড়ে যায়। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ে। এমন কি কোন কোন নীহারিকার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের চেয়েও বেশি হয়। প্রশ্ন জেগেছে বিজ্ঞানীদের মনে, এই যে আন্তনীহারিকা দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ কি?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের কলেবর অনবরত বেড়ে চলেছে। নীহারিকাগুলি যদি এমনিভাবে অবিরত ছুটে পালায় তাহলে বহু আগেই আমাদের মহাকাশ হতো নীহারিকাশূন্য। একেবারে না হ'লেও অনেকটা তো বটেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে তা হয় নি। মহাকাশ নীহারিকাশূন্য হয় নি। অতএব একথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছেন

যে হারে নীহারিকাসমূহ ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সরে যাচ্ছে, যাচ্ছে দৃষ্টির অগোচরে, তেমনি নীহারিকার অন্তবর্তী প্রদেশের যাবতী হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে জন্ম নিচ্ছে নতুন নীহারিকা। এর পরেও প্রশ্ন উঠ তাই যদি হয়, তাহলে এমন এক সময় নিশ্চয় আসবে যখন মহাকাশ নীহারিকাশূন্য, কারণ সব হাইড্রোজেন গ্যাস কোন না কোনদিন বিলুপ্ত হ'য়ে যাবেই।

কিন্তু তা-ও সত্যি নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একদিকে যেমন ক্রমাগত নীহারিকা সৃষ্টির ফলে হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, তেমনি ক্ষতিপূরণ হচ্ছে নতুন হাইড্রোজেন গ্যাস সৃষ্টিতে। তার ফলে নীহারি সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে হাইড্রোজেনের চাপ বেড়ে যায় এবং নীহারিক একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। বিশ্বের প্রসারণের (cxpansion universe) কারণ মেলে এইখানে। প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সাহায্যে সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন পরমাণুর। সহজেই প্রশ্ন উঠবে প্রোটন ও ইলেকট্রন আস কোথা থেকে। তা আসছে শক্তি কণিকা থেকে। আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ ($E=$শক্তির পরিমাণ, $m=$ভর, $c=$আলোর গতিবেগ) থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শক্তি থেকে বস্তুকণার সৃষ্টি সম্ভব যেতে পারে শক্তিকণিকা। হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে নীহারিকা মেঘ এবং ক্রমান্বয়ে মেঘ থেকে তারকা; পরিশেষে তারকা থেকে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি কালীন সময়ে প্রচুর পরিমাণে শক্তির উদ্ভব হয়। তার থেকে সৃষ্টি হয়ে শক্তি কণিকা। এমনিভাবে সৃষ্টি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে যুগ-যুগ ধ'রে

সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্ত্বের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রিয়দারঞ্জ রায় বলেছেন,

'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের সংগে তুলনা করলে অনেক স্থলে সাংখ্য-পাতঞ্জল তত্ত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। সাংখ্যের নামরূপহীন, অনাদি, অনন্ত, ব্যাপী, অব্যক্ত, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কল্পনা অসাধারণ প্রতিভ পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে চেতনার কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মন, বুদ্ধি ও চেতনা জড়ের ধর্মবিশেষ; অনুকূল তাদের বিকাশ ঘটে। সাংখ্যের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় এরা হয়েছে প্রকৃতি পরিণাম মাত্র। জগতে যা কিছু ব্যক্ত, অব্যক্ত-প্রকৃতি হচ্ছে তাদের

মূল বা বীজ। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে হাইড্রোজেন গ্যাস হচ্ছে সৃষ্টির আদিম উপাদান। তারই ঘনসংযোগে গড়ে উঠেছে বিশ্বজগৎ। মহাশূন্যে এই হাইড্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টি হচ্ছে অহরহ—এটা বিজ্ঞানীদের ধারণা। শক্তিকণা বা ফোটন থেকে আসে হাইড্রোজেন পরমাণুর মালমশলা। প্রকৃতির কল্পনা করে সাংখ্য গেছে একেও ছাড়িয়ে। কেবলমাত্র যুক্তি-বিচার ও সাধারণ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর ক'রে কল্পনার সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা যে সব গভীর তত্ত্বের উদ্ভাবন ক'রে গেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের কল্পনাকে এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু তাতে চেতনা, প্রাণ ও মনের কোন সম্পর্ক নেই। তবে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র নিছক কল্পনা নয়, কারণ তত্ত্ব পরীক্ষা ও প্রমাণসিদ্ধ। এই কারণে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের তত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান তত্ত্ব ও প্রধান ভিত্তি।[৬]

বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের মত তাঁর গুরুভ্রাতা পূর্বসূরী স্বামী বিবেকানন্দও বলেছিলেন, শূন্য থেকে কোন কিছুরই উৎপত্তি হয় না। সব জিনিসই অনন্তকাল ধরে চলে আসছে, আছে এবং থাকবেও। কেবল ঢেউ-এর মতো একবার উঠছে, আবার পড়ছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার লয়, আর একবার স্থূল ব্যক্তভাবে প্রকাশ। সমগ্র প্রকৃতিতেই এই ক্রমসংকোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলছে।

স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই সাংখ্য-পাতঞ্জল-বেদান্ত-তত্ত্বে আস্থাশীল। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-সম্পর্কে উভয়েই সাংখ্য-পাতঞ্জল-তত্ত্ব অনুসরণ করলেও তাঁরা সৃষ্টিকর্তার কল্পনা করেছেন। সে যাই হোক, আধুনিক বিজ্ঞানে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিষয়টি আরো বিশদভাবে আলোচনা করছি।[৭]

'মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল আবিষ্কার করেন যে, বিশ্বের অসংখ্য নক্ষত্র এবং অগণিত নীহারিকা একে অপরের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দূরে চলে যাচ্ছে। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যে বিশ্ব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে।

---

৬ জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ ৪৫-৪৬

৭ ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার, বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা, রূপা, পৃ ৯৬-৯৯

বিশ্বকে একটা বেলুনের সঙ্গে তুলনা করা যাক। মনে করা যাক, বেলুনের গায়ে অনেক বিন্দু চিহ্ন দেওয়া আছে। বেলুন যখন চুপ্সে থাকে, তখন বিন্দুগুলি গায়ে লেগে থাকে। কিন্তু বেলুন যতই ফুলবে, বিন্দুগুলির পারস্পরিক দূরত্বও তত বাড়বে। বিশ্ব-বেলুনের গায়ে বিন্দু চিহ্নগুলি নক্ষত্র-নীহারিকার দল। তফাৎ এই যে, বেলুনের মধ্যে ফাঁপা আছে। বিশ্ব-বেলুনের মধ্যে কোন ফাঁপা নেই। এই পরিকল্পনা মেনে নিলে বিশ্বকে সীমায়িত বলা চলে না যেহেতু বিশ্বের বিস্তার স্তব্ধ হবার সংগত কারণ নেই। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে—সে প্রশ্নটি হচ্ছে—এর আদি কোথায়? নক্ষত্র-নীহারিকার দল একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—তা যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে জিজ্ঞাস্য—যখন থেকে অপসারণক্রিয়া শুরু হ'লো, তার আগে বিশ্বের অবস্থা কি ছিল?

শেষ প্রশ্নটির জবাব দিলেন 'বিগ্ ব্যাং থিয়োরীর সমর্থকেরা—এঁদের মধ্যে আছেন বার্নাড লভেল, মার্টিন রাইল, জর্জ গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মনে করেন—যখন থেকে বিশ্ব বিস্তৃত হ'তে আরম্ভ করলো তার কোটি কোটি বছর আগে বিশ্বের সমগ্র বস্তুনিচয় ঘননিবদ্ধ ছিল—অনেকটা ডিমের মতো তাকে বলা হ'লো 'কস্‌মিক এগ' (Cosmic Egg)। তাঁদের মতে, বহু বছর আগে আকস্মিকভাবে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে তা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। এ'থেকেই এসেছে গ্যালাক্সি ও সূর্যসমূহ। বিস্ফোরণের পরে মহাকর্ষের ফলে খণ্ড কণাগুলি আবার দানা বাঁধতে লাগলো। তা থেকে প্রথমে নীহারিকা ও পরে নক্ষত্রের জন্ম। বিস্ফোরণের ফলে বস্তুকণাগুলির মধ্যে এত অধিক মাত্রায় বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল যে, তার ফলে নীহারিকা এবং নক্ষত্রপুঞ্জ ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন তাঁরা এড়িয়ে গেলেন অপসারণ ক্রিয়া শুরু হবার আগে বিশ্বের বস্তুনিচয়ের অবস্থা কেমন ছিল? তবে তাঁরা একথা বলেন যে, কোটি কোটি বছর আগে যেমন চেহারা ছিল আজ আর তা নেই।

পালসেটিং থিয়োরী বা প্রসারণ-সঙ্কোচনতত্ত্ব আলোচনা করলে জানা যায় বিশ্বের প্রসরণশীলতা ক্রমেই কমে আসছে এবং এক সময়ে তা বন্ধ হয়ে তারপরে শুরু হবে সঙ্কোচনের পালা। অবশেষে বিশ্ব এক ঘননিবদ্ধ পরিণত হবে, তখন হবে আবার এক বিস্ফোরণ। পরেই প্রসারণ-ক্রিয়া

:বে, এবং শেষে পুনরায় সঙ্কোচন। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীরা বলেন যে,
াস্ফোরণের ফলেই জন্ম নিয়েছে তারকাপুঞ্জ। তারপরে তারা মহাকাশে ধাবিত
:তে থাকে। জন্মক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে যায়, তবে তার একটা সীমা
। তার পরেই আবার সঙ্কুচিত হ'য়ে পূর্বেকার ঘনত্বে ফিরে আসে।

কতিপয় জ্যোতির্বিদ মনে করেন যে, সৃষ্টির মুহূর্তে যখন বিশ্ব বস্তু-
পিণ্ডরূপে অথবা অতি ঘননিবদ্ধ অবস্থায় ছিল, তখন তা ছিল শুধু শক্তিপুঞ্জ।
ারপর বিশ্ব যত প্রসারিত হতে লাগলো, তখন শক্তি বস্তুতে পরিণত হতে
ারম্ভ করলো। পূর্বেকার তত্ত্ব অনুসারে একথা ধারণা করা যেতে পারে,
ক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে বস্তুতে পরিণত হবে, তখন তার পরিবর্তনের কোন
ম্ভাবনা থাকবে না। ফলে দেশ ও কাল লুপ্ত হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
স্তু থেকে আবার শক্তির সৃষ্টি হয়।

পালসেটিং থিয়োরী অনুসারে জানা যায় সর্বোত্তম বিস্তৃতির সময়েও
ানেক শক্তি বাড়তে থাকে। তার ফলে গ্যালাক্সিপুঞ্জ (Cluster of Galaxies)
াদের পারস্পরিক আকর্ষণের (গ্র্যাভিটি) সাহায্যে ফের চলতে শুরু করতে
ারে এবং বিপরীত ক্রিয়া বা সঙ্কোচনের পালা আরম্ভ হয়।

স্থির-তত্ত্ব বা স্টেডি-স্টেট থিয়োরীর মূলকথা হচ্ছে বিশ্ব অনন্তকাল ধরেই
ছিল এবং থাকবেও। প্রাচীন নক্ষত্রসমূহ অন্তিম দশা প্রাপ্ত হলে তার জায়গায়
তুন নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে—এই মহাবিশ্বের আদি নেই,
ন্ত নেই। আদিতে যে সংখ্যক নক্ষত্র ছিল, এখনও তাই-ই আছে।

বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল বলেন বিশ্ব বিস্তারশীল তা ঠিক।
স্তু বিস্তারের ফলে আন্তর্নক্ষত্র বা আন্তর্নীহারিকার শূন্যতা বেড়ে যাচ্ছে তা
তিনি মানেন না। তিনি বলেন, নব নব সৃষ্টির ফলে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের
কাতে বিশ্ব বেড়ে চলেছে। যদিও নক্ষত্র এবং নীহারিকাগুলি ক্রমেই দূরে
যাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকা স্থান মুহূর্তে ভর্তি করে দিচ্ছে নতুন বস্তু এসে।

বেলজিয়মের বিজ্ঞানী Albe Lemaitre বলেন যে, মহাকাশ কখনও
গ্যালাক্সি বর্জিত অবস্থায় থাকবে না। হয়তো দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে অনেক
গ্যালাক্সি দেখা যাবে না। কারণ তারা ক্রমে হটে যাচ্ছে। তাদের জায়গা দখল
নিচ্ছে নতুন ব্রহ্মাণ্ড। যে হারে বস্তু সরে যাচ্ছে, ঠিক সেই হারে নতুন
তৈরি হচ্ছে। তবে এই হার খুব কম। বাস করবার ঘরের পরিমিত

স্থানে একটি সম্পূর্ণ নতুন হাইড্রোজেন পরমাণুর সৃষ্টি হতে চার থেকে পাঁ
হাজার বছর লাগে। তবে যেহেতু এই পদ্ধতি অনাদি কাল ধরে চলে আসছে
সেই হেতু প্রায় ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০৫০,০০০,০০০,০০০,০০
(প্রায় পঞ্চাশটি সূর্যের ওজনের সমান) প্রতি সেকেণ্ডে উদ্ভূত হচ্ছে। এ
সৃষ্টির কাজ অতি রহস্যময়। কোন্ শক্তি থেকে এই বস্তুনিচয় সৃষ্টি হচ্ছে
তার পরিচয় আগে দিয়েছি, যদিও সামান্যভাবে।

এই যে অনবরত বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে, তা আসবে কোথা থেকে? ফ্রে
হয়েল বলেন, 'It does not come from anywhere. Material simply appears, it is created'.

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে কিন্তু কোন সঠি
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারেন নি বিজ্ঞানীরা। ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে
নিয়ে নানা যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করা যায়। আদিতে কিছুই ছিল না এম
অবস্থার কল্পনা করা সম্ভব হলেও বিজ্ঞান তার কোন ব্যাখ্যা দিতে অপারগ।

নীহারিকাসমূহ যে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে তা নিয়ে
সন্দেহ উঠেছে বিজ্ঞানী মহলে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা
এমেরিটাস অধ্যাপক বিজ্ঞানী প্রবর হ্যারো স্যাপলে (Harrow Shapley) এ
প্রবন্ধে বলেছেন,[৮]

> 'Accepting the strong evidence of an expansion from a denser conglomeration of matter, we can say that the spe of metagalactic scattering is a linear or nearly linear functio of the distance, and the size is a function of time. The ra is still under investigation.'

প্রশ্ন হতে পারে—'স্থান' বা 'দেশ' কি অসীম? বহু দূরবর্তী স্থানে নীহারি
সমূহের গতিবেগ কি আলোকের গতিবেগকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে?
প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও সঠিকভাবে পাওয়া যায় নি। এ' নিয়ে বিজ্ঞানীদে
মধ্যে অনুসন্ধান চলছে, তবে বিস্ময়ের কথা সকলেই ভিন্ন মত পোষণ কর
বললেই চলে। মহাকাশের সম্বন্ধে গবেষণা চলছে। সৃষ্টির-কর্তার ক

৮ *On the Evidences of Inorganic Evolution* : *Evolution after Darwin*, vol. I

াতে আমাদের চিত্ত এখন দোলায়িত, যেহেতু অনেক কথাই অজ্ঞাত। আগামী
ন বিজ্ঞানের আরো আবিষ্কারে হয়ত এই দ্বিধা দূরীভূত হবে। অভেদানন্দ
লন,[৯]

'বেদান্তে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কেউ আছে এমন কথা বলা হয় না, যেহেতু যখন আমরা ক্রমবিবর্তন তত্ত্বে আস্থাশীল তখন সৃষ্টিকর্তার কল্পনা অসম্ভব। যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষ করি যে বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা বা বস্তু নিচয় সেই চিরন্তন শক্তিপুঞ্জ থেকে উদ্গত হয়েছে, যাকে সংস্কৃতে 'প্রকৃতি' বলা হয়'।

শ্বের ক্রমবিবর্তন-সম্পর্কে অভেদানন্দ গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তিনি
 প্রবন্ধে[১০] লিখেছেন, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু প্রথমে বাষ্পীয়, পরে তরল এবং
মে কঠিন অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যখন শীতল হয়েছে তখনই তা উদ্ভিদ ও
বজন্তুর বাসস্থান হতে পেরেছে। এই প্রক্রিয়া হতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে।

---

৯ *Vedanta Philosophy*, p. 29-30

১০ A large mass of the vegetable substance or whatever it may be called, sses through the gaseous state, liquid state, solid state and when it is cooled, becomes the home of various plants and animals of different kinds. This ocess may take millions of years and then, in course of time, the solid body gins to dissolve and gradually involves into its original nebulous material, ethereal substance. Ascending through the process of evolution, matter adually passes from one form to another until organic life is possible. Every riod of evolution is followed by a cycle of involution or dissolution, as it is lled by some of the scientists. Dissolution means disintegration of the solid iss and the reversion to the primordial condition.

The planetary systems, the suns, moons, stars, together with other cosmic dies, are subject to this evolution and involution....We find here now many inets and flowers, but the time will come when she will grow cold and less and will eventually fall back into the sun. But do you think the basic iterial, the substance of this earth will be destroyed or annihilated ? No, will remain in its premordial condition and in course of time a new form emerge.

Evolution and Religion : *Attitude of Vedanta towards Religion*, p. 103

আবার হয়তো কালক্রমে কঠিন পদার্থ গলিত হয়ে ক্রমান্বয়ে সেই আদি-উষ্ণ নীহারিকার বস্তুকণায় ফিরে যাবে। বিবর্তনের ধাপে ধাপে বস্তু ক্রমশঃ স্তর থেকে অন্য স্তরে যাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত জীবনের আবির্ভাব না ঘটে প্রতিটি উদ্বর্তনের সংগে রয়েছে অনুবর্তন ক্রিয়া। একটি অপরের সংগে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

এই গ্রহ জগৎ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং আরো অগণিত মহাজাগতিক বস্তু সকলকেই এই উদ্বর্তন ও অনুবর্তন ক্রিয়ার চক্রে আবর্তিত হতে হয়

বিজ্ঞানীরা বলেন, কোটি কোটি দলবাঁধা নক্ষত্র নিয়ে রচিত হয়েছে বিশ্ব জগৎ। আমাদের সূর্য তাদেরই অন্তর্গত একটি নক্ষত্র। পৃথিবী আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় নক্ষত্রগুলি স্থির হয়ে আছে। প্রকৃতপ তা নয়। আলোর বর্নালী পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, কোন নক্ষত্র স্থি হয়ে নেই, তারা ক্রমাগত ছুটে চলেছে। একটি নক্ষত্র থেকে আর একটি দূরত্ব বা ব্যবধান কোটি কোটি মাইল। তাই তাদের পক্ষে পরস্পরের কাছে চলে আসা অতি বিরল ঘটনা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার জেমস্ জীনস্ অনু করেন এই বিরল ঘটনা ঘটেছিল প্রায় দু'শো কোটি বছর আগে এবং সৃষ্টি হয়েছিল সৌরজগতের।

একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র ভেসে এসেছিল সূর্যের খুব কাছে। এই বি আকৃতির নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে সূর্যের মধ্যে উত্থিত হলো এক প্রচণ্ড ঢেউ এবং তা জ্বলন্ত বাষ্পের। আগন্তুক নক্ষত্রটি সূর্যের যত কাছাকাছি আসতে লাগলো, ঐ তরংগও তত প্রবল হয়ে উঠলো। ক্রমে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিবাষ্পে টানাসূত্র (filament) সূর্যের পিঠ থেকে বেরিয়ে অগ্রসর হলো আগন্তু দিকে। টানাসূত্রটি অনেকটা পটোলের মতো। মাঝখানে ফোলা আর দু'প অপেক্ষাকৃত সরু। যেমনি আকস্মিক ভাবে নক্ষত্রটি সূর্যের কাছে পড়েছিল, তেমনি হঠাৎ এক সময় দূরে স'রে গেল। কিন্তু অগ্নিময় টানাসূত্রে পক্ষে আর সূর্যদেহে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হলো না। সূর্যের আবর্ত বেগ গ্রহণ ক'রে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা শুরু করলো। ধীরে ধীরে বিশি অগ্নিময় অংশ তেজ হারিয়ে ঘন হতে আরম্ভ করলো। তখন বাষ্পপিণ্ড বিভক্ত হলো ক্ষুদ্রতর অংশে। অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে তাদের যে বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তার সংগে সূর্যের প্রবল আকর্ষনী শক্তির সা

হয়ে যে বেগ থাকলো, তার ফলশ্রুতিতে অংশগুলি ঘুরতে শুরু করলো সূর্যের চারপাশে। ছোট বড়ো টুক্‌রোগুলো এক একটি গ্রহ। আমাদের পৃথিবীও তাদেরই এক শরিক। টুক্‌রোগুলো ক্রমশই তেজ হারিয়ে ঠাণ্ডা হলো। প্রথমে এল জল, যেহেতু বায়বীয় পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে প্রথমে তরলে পরিণত হয়, পরে আরো শীতল হলে কঠিন হয়। যদিও সমস্ত বায়বীয় পদার্থ কঠিন বা তরল হয়, কিছু বায়ব আকারেই থাকে। ধীরে ধীরে পৃথিবী যখন আরো ঠাণ্ডা হলো, তখন বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জমে তরল হয়ে সমস্ত ঢালু জায়গা ভর্তি ক'রে দিল। এর পরে চললো বিবর্তন-ক্রিয়া। ক্রমে জন্ম হলো প্রাণের, জীব জগতের।

বিজ্ঞানীপ্রবর সার জেমস্ জীনস তাঁর বিখ্যাত 'The Dying Sun' প্রবন্ধে বিশ্বের প্রলয়ের অবস্থা যা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ সমগ্র জীবের বিলুপ্তি তার সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের কল্পনার মিল আছে। কিন্তু এ' সবই কল্পনা মাত্র। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পুণরায় শক্তিপুঞ্জে বিলীন হয়ে যাবে।

পদার্থ যদি শক্তির অভিব্যক্তি হয় তাহলে বিশ্বের মূল কি? এবং মধ্যকার পরমাণু, ইলেকট্রন ইত্যাদির নাম করা কেন? কেবলমাত্র শক্তিকেই তো বিশ্বের মূল উপাদান বলা চলে। এর সঙ্গে 'তড়িৎ' যোগ করলেই হলো। এই ব্রহ্মাণ্ড যত বিরাট হোক, যত কল্পনাতীত হোক, তার মূলে মাত্র দুটি কথা—শক্তি আর তড়িৎ। পদার্থ শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র। আবার পদার্থের ধ্বংসে শক্তির উৎপত্তি। শক্তির হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই, তা অবিনশ্বর। প্রশ্ন জাগে শক্তির উৎপত্তির স্থান কোথায়, কত দূরে? ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মেনে নিলাম কিন্তু কোথায় তার উৎপত্তি এই চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তরে বিজ্ঞানী স্যাপলে বলেছেন[১১],

> 'With bold advances in cosmogony we may in future hear less of a Creator and more of such things as 'anti matter', 'minor world', and 'closed space-time'. Finality however, may always clude us. That the whole universe evolves, or from where, or where to—the answers to these questions may be among the unknowable.'

---

১১ Harrow Shapley : *'On the Evidences of Inorganic Evolution.*

যত দিন যাচ্ছে, মানুষ বিশ্ব সম্বন্ধে ততই নতুন নতুন জ্ঞান, গভীরের জ্ঞান আহরণ ক'রে চলেছে বটে, কিন্তু আরো বেশি অজ্ঞানতার অন্ধকার যেন চোখ ধাঁধিযে দিচ্ছে। অনেকদিন আগে নিউটন বলেছিলেন, 'আমি বেলাভূমি থেকে উপলখণ্ড সংকলন করছি মাত্র, জ্ঞান মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রয়েছে'। নিউটনের পর দীর্ঘ দুই শতকের বেশী অতিবাহিত হযেছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত, কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজও নিউটনের সেই আপ্ত বাক্য একইভাবে উচ্চারণ ক'রে চলেছেন।

সাত

আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও অভেদানন্দ

জড়বিজ্ঞানীরা তারস্বরে প্রশ্ন তুলবেন 'মন কি ?' বিষয়টি নিঃসন্দেহে জটিল। মনের সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত। তবে একথা বলা যেতে পারে মন জড় পদার্থ নয়। মনের কোন রূপ নেই। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে পরিমাপ করা যায় না। অথচ ভক্তি, প্রীতি, সুখ দুঃখ, হিংসা-দ্বেষ এগুলি যে আমাদের মধ্যে হচ্ছে তা অনুভব করতে পারি। এগুলি সবই মনোজগতের বিষয়। এগুলি মনের ক্রিয়া মাত্র। তেমনিভাবে বলা যেতে পারে চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা এসবও জড় জগতের বিষয় নয়, তা মনোজগতের। অনুরূপভাবে বিচার বিবেচনা, সংকল্প, অভিনিবেশ সবই মনোজগতের সচেতন ক্রিয়া। তাহলে মনোবিজ্ঞান কি ? বলা বাহুল্য মনোবিজ্ঞানের বিষয় বস্তু হলো 'মন'। এই মনোবিজ্ঞানকে আমরা দুরকম ভাবে ভাগ করতে পারি—বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) এবং তত্ত্বজ্ঞানাত্মক (Metaphysical)।

মনের দু'রকম প্রকাশ। এর প্রধান প্রকাশ হলো অন্তর্জগতে। তবে বহির্জগতেও তার প্রকাশ যথেষ্ট। মনস্তত্ত্ববিদেরা নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মারফতে তাঁদের বক্তব্য বিষয় পেশ করতে সচেষ্ট হন। একারণেই মনোবিজ্ঞান আজ 'বিজ্ঞান' নামের দাবী করতে পারে। তাহলেও পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণি বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। এদের বলা হয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা Natural Science। মনোবিজ্ঞান এ দলে পড়ে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আমরা যা অনুশীলন করি, তা বাইরে থেকেই করি। এই প্রথাকে বহির্দর্শন বলা যেতে পারে। কিন্তু অন্তর্দর্শন সম্ভব নয়। এই অন্তর্দর্শনের স্থানই মনোবিজ্ঞানে সর্বপ্রথম ও প্রধান।

মনোবিজ্ঞান আমাদের মনের সবরকম রহস্যের কথা জানিয়ে দেয়। মনের নানা রকমের বৃত্তি ও বিভূতি রয়েছে। মনোবিজ্ঞানে পাওয়া যায় মনের প্রকৃতির পরিচয় এবং সেই সঙ্গে একথাও জানা যায় তাকে কে নিয়ন্ত্রণ করে। মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র মনোবৃত্তির বিজ্ঞান মাত্র নয়, মনের যথার্থ স্বরূপ এবং আত্মচৈতন্য যে মনের পেছনে থেকে তাকে সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করে সে সম্বন্ধেও

অবহিত করে। হয়ত একারণেই স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'ভারতীয় সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন, পাতঞ্জল দর্শনের মত এমন পূর্ণাঙ্গ মনস্তত্ত্বীয় মনোবিজ্ঞান আর নেই। পাশ্চাত্যের বর্তমান মনোবিজ্ঞানকে যথার্থভাবে মনস্তত্ত্বদর্শন বলা যায় না, যেহেতু এই মনোবিজ্ঞানে মনের অতীত আত্ম-চৈতন্যের কোন স্থান নেই। তাহলে প্রকৃত মনোবিজ্ঞান কেমন হওয়া উচিত ? এ' প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন[১],

> 'যথার্থ মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তিনটি—শরীর, মন ও আত্মা। কিন্তু বর্তমান মনোবিজ্ঞানে মনের কথা নিয়ে আলোচনা করা হলেও সেই মনকে পার্থিব শরীরের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। যথার্থ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জড়শরীর আত্মার বাসস্থান মাত্র। শরীর আত্মারই ইচ্ছার ইঙ্গিতে সৃষ্ট। আত্মা বুদ্ধি ও বোধির উৎসবিশেষ'।

এই নিবন্ধে আমি 'আত্মা' সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করবো না, যেহেতু আমি বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে অভেদানন্দের বক্তব্যের সমীক্ষা করতে বসেছি। আত্মার আলোচনা আমার প্রবন্ধের মধ্যে স্থান না পেলেও কৌতূহলী পাঠককে অনুরোধ করবো স্বামী অভেদানন্দের রচনাবলী এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক রচিত 'অভেদানন্দ-দর্শন' গ্রন্থের 'মনোবিজ্ঞান ও আত্মা' অধ্যায়টি পড়তে। উপরন্তু ভারতীয় দর্শনের গ্রন্থসমূহে এ' বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা আছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে বা হচ্ছে স্বামী অভেদানন্দ সে বিষয়ে বহুদিন আগে কি বলেছিলেন তার অনুসন্ধান করা হয়েছে এখানে।

আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করবার সময়ে স্বামী অভেদানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বস্তুতন্ত্রবাদীর অভিমত নিয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছেন আধুনিক কালের শারীরবিজ্ঞানীরা, শারীরতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসকেরা, অন্যান্য জড়বাদী ও অজ্ঞেয়তাবাদীরা মনে করেন পার্থিব শরীর অথবা জড় পদার্থের সমষ্টি থেকে চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান, মন অথবা আত্মার সৃষ্টি হয়। তাঁরা বলেন চিন্তা, বুদ্ধি বা জ্ঞান সবই মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশেষ মাত্র। তা ছাড়া প্রতিটি বিশেষ চিন্তা বা মননের আকার মস্তিষ্কের বিশেষ কোন এক অংশের ক্রিয়ার পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা সিদ্ধান্ত

১ *Our Relation to the Absolute* (1946), p. 6

যে মস্তিষ্ক থেকেই চিন্তার সৃষ্টি হয়, তাঁদের মতে মন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার পর্যায়ভুক্ত। মস্তিষ্কের ক্রিয়া যদি বন্ধ হয় তবে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান ও মানসিক সকল ক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ হ'য়ে যায়, কাজেই ক্রিয়া ছাড়া আত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, আর সেজন্যে মৃত্যুর পর আত্মা নামে কোন জিনিস থাকে কি না সে বিষয়েও প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

এই 'আত্মা' সম্বন্ধে পার্শিভাল লয়েল (Percival Lowell) বলেছেন, জ্ঞান আত্মা বলতে বুঝি স্নায়ু-দীপ্তি (nerve-glow)। অধ্যাপক ক্লিফোর্ড'ও প্রায় একই ধরণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, চৈতন্য বা আত্মা কতগুলি সংবেদন-রূপ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এই সব মতবাদের বিরুদ্ধে অভেদানন্দ রুখে উঠেছেন এবং তাঁর সমর্থনে জন ষ্টুয়ার্ট মিল, জি. জে. রোমেন্স, ডাঃ শিলার, কান্ট প্রভৃতির যুক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

'মন' সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, মন ও বস্তু বা matter-এ তেমন কোন্ পার্থক্য নেই। একটি থেকে আর একটি লাভ করা যায়। একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে তিনি বিষয়টি পরিষ্কার করেন[২],

'Take a bar of steel and charge it with a force sufficient to cause it to vibrate, and what would happen ? If this were done in a dark room, the first thing you would be aware of would be a sound, a humming sound. Increase the force, and the bar of steel would become luminous ; increase it still more, and the steel will disappear altogether. It would become mind.'

অভেদানন্দ মনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হলো বিষয়ী-মন (subjective mind), আর একটি হলো বিষয়-মন (objective mind)। এই বিভাগ যে সত্য নয় তা নিজেই স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মন হলো একটি। ব্যবহারিক কাজের জন্য তাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। দৃষ্টি দ্রষ্টা, কার্য কর্তা, মনন-মন্তা এই দুটি বিকাশ বা অবস্থা নিয়েই বিষয় ও বিষয়ীভাগের সৃষ্ট। মনের বিষয় ও বিষয়ী-ভাগকে মনের দুটি বিভিন্ন অবস্থা একথাই

২ ***Nature and Man.***

তিনি বলতে চেয়েছেন। একটির সংগে যোগাযোগ থাকে আত্মার সংগে, একটি মস্তিষ্কের সংগে :

'It has a subjective 'state' and an objective 'state'. Th subjective state is in close touch with the soul, and th objective state is in close touch with the brain.'

'সংবেদন' (sensation) নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ তথ্যপূর্ণ আলোচ করেছেন। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যাক। সংবেদ বলতে আমরা বুঝি কতগুলি ইংগিত যেগুলি চোখ, কান, ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে ভিতর দিয়ে বাইরের জগতে আসে। সংবেদনকে তিনভাগে ভাগ করা যে পারে। ইন্দ্রিয়-সংবেদন, দৈহিক সংবেদন ও পেশী-সংবেদন। ইন্দ্রিয়-সংবেদ কথা আগেই বলা হয়েছে। দৈহিক সংবেদনের মূল-উৎস দেহের মধ্যে থাকে। এতে অনুভূতির পরিমাণ বেশী থাকে। পেশী-সংবেদনও ভিতর থেকে জন্ম নেয়। এর থেকে মনে হতে পারে পেশী ও দৈহিক সং দুটিই এক শ্রেণীর। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। দৈহিক সংবেদন অনুভূতি প্রধান আর পেশী-সংবেদন অবগতিপ্রধান। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যেমন বাইরের জগতের কথা জানতে পারি, পেশী সংবেদনের সাহায্যেও তা সম্ভবপর।

পেশী-সংবেদন দুরকমের। একটি সক্রিয়-বোধ, অপরটি নিষ্ক্রিয়-বোধ ইংরেজীতে প্রথমটিকে বলা হয় sensory stimulus or sensation, দ্বিতীয়টি motor sensation।

সংবেদন কিভাবে হয় তার প্রসংগে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,

'আমরা জানি যে, শারীর বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মনোবিজ্ঞান মনে অবস্থা বা বিচিত্র বিকাশ সম্বন্ধেই কেবল আলোচনা করে, তার জ মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সে অধীন। জ্ঞান বা চৈতন্যকেও মস্তিষ্কের কার্য বলে। বর্তমান ব্যবহার বা আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানে (Behaviouristic Psychology) আমরা স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্ক একটি শরীর ব্যবচ্ছেদের বিকাশ বলতে পারি। আচরণবাদীরা মানু মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ ক'রে দেখেছেন শিরা, ধমনী এবং স্নায়ুতন্ত্রীগ মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের (grey matter) বা মস্তিষ্কের চর্মে গিয়ে হয়েছে। এই জায়গাটিকে তাঁরা মনের স্থান ব'লে সিদ্ধান্ত ক'রেছেন

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী মস্তিষ্কে গিয়ে শেষ হয়েছে। আমাদের চামড়ার প্রত্যেকটি অণুকোষে অতিসূক্ষ্ম সুতার মতন এক একটি স্নায়ুতন্ত্রী আছে। সেই তন্ত্রী মেরুদণ্ডে অবস্থিত প্রধান স্নায়ুগুলির সংগে যুক্ত আছে। মস্তিষ্কের ধূসরবর্ণ পদার্থের সংগেও তাদের যোগাযোগ আছে। কাজেই যখনি কোন সংবেদনের সৃষ্টি হয়, তখনি তা এই সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীর ভিতর দিয়ে আসে ও যেকোন উদ্দীপনা পেয়ে স্নায়ুতন্ত্রীগুলি আন্দোলিত হয় ও যতক্ষণ পর্যন্ত না মস্তিষ্কের চর্মকোষগুলিতে পৌঁছায় ততক্ষণ ঐ আন্দোলন বা উদ্দীপনা স্রোতের মতন স্নায়ুতন্ত্রগুলির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়'।

সংবেদন' বলতে আমরা বুঝি কতগুলি ইংগিত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে বাইরের জগতে আসছে। এই ইংগিতগুলি আদিতে জ্ঞান বা চৈতন্যের আকারে প্রকাশ পায় না। প্রথমে তারা থাকে স্নায়ুতন্ত্রী এবং মস্তিষ্কের মধ্যে আণবিক কম্পনের রূপে। তার পরেই আসে সংবেদনের ধারণা। বর্তমান মনোবিজ্ঞানে তাদের নাম প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি (appreciation or perceptions or conceptions)। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় আণবিক কম্পনের পরে। আদিতে তারা গতি বা স্পন্দন ছাড়া কিছুই নয়। এ প্রসংগে অন্তর্বাহী (afferent or sensory) ও বহির্বাহী (efferent or motor) স্নায়ুতন্ত্রীর কথা মনে করতে হবে। অভেদানন্দ স্নায়ুতন্ত্রীদ্বয়ের আলোচনা ক'রে বলেছেন,

'বর্তমান বিজ্ঞানের অনুসারে, যে কোন ভাবের প্রবাহ অন্তর্বাহী স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে মস্তিষ্কে যায়, অর্থাৎ শরীরের উপরে ছড়ানো বাহ্যবস্তুর জ্ঞানবাহী স্নায়ুতন্ত্রীগুলি সংবেদন বহন করে। এই প্রবাহ উদ্দীপনা আঘাত করে। যদি আমরা চামড়ার কোনও জায়গায় চাপ দিই তবে সেই চাপই উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই উদ্দীপনা একধরণের ইংগিত যা স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্যে তরংগের সৃষ্টি করবে এবং সেই তরংগ মস্তিষ্কে নীত হবে'।

এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মস্তিষ্কে অপর একটি প্রবাহ পাঠাবে। এই প্রবাহ যেটি মস্তিষ্কে যায়, সেটি সেখানকার সমস্ত শৃংখলার মধ্যে বিপর্যয় আনে। মস্তিষ্কের কোষগুলি একে অপরের সংগে সূক্ষ্ম সূত্রের সাহায্যে সংযুক্ত। এই সূক্ষ্ম স্নায়ুসূত্রগুলির চলবার পথ আছে। তার ভিতর দিয়ে স্নায়ুপ্রবাহ বয়ে যায়। প্রত্যেকেই পালা ক'রে অপরকে উদ্দীপনা যোগায়। এই সংবেদন যদি মস্তিষ্কের

যে কোন অংশে উপস্থিত হয়, তাহলে সমস্ত অংশে সেই সংবেদন ছড়িয়ে পড়বে। কেমন ক'রে তারা একে অপরের সংগে সংযুক্ত তা বলা যায় না অথবা কেমন ক'রে চিন্তাধারা প্রকাশ পায় তাও বলা শক্ত। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টিকে স্বয়ং-ক্রিয় বা যান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না, যেহেতু তাঁরা সঠিকভাবে জানেন না জীবন্ত মানুষের মস্তিষ্কে কি হচ্ছে। যাই হোক, স্নায়ু-তরঙ্গ প্রবাহ মস্তিষ্কে যায় এবং প্রায় সংগে সংগেই বিপরীতমুখী প্রবাহ বইতে শুরু করে ও মাংসপেশীতে এসে পৌঁছায়। সমস্ত বিষয়টি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই ঘটে। একেই বলে অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। কেবলমাত্র স্নায়বিক উত্তেজনা এর পেছনে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যখনি ঐ প্রবাহ অণুকোষের সূক্ষ্ম-পরমাণুগুলিকে মস্তিষ্কের মধ্যে বয়ে নিয়ে যায়, তখনি তারা এক ধরণের বৈদ্যুতিক বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। এই বিস্ফোরণ থেকেই চৈতন্যের সৃষ্টি হয়। এর পরে আবার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং আর একটি বৈদ্যুতিক অথবা স্নায়বিক প্রবাহ নিজে থেকেই পেশী-গুলিতে উপস্থিত হয়[৩]।

---

৩ 'The ideas of motion are the elements, out of which the mind substance is buitt. I have already described the afferent and the efferent or sensory and motor nerves. Now, these currents, according to modern science, pour into the brains the sensations by the afferent nerves, that is, those sensory and motor nerves that are scattered under the surface of the body, carry the sensations to the brain. Then the currents or stimuli strike. If you press any spot on the skin, that pressure would be the cause of a stimulus, and that stimulus will be a kind of suggestion, which will create a current in the nerves, and that current will be poured into the brain, and, in reaction, the brain will send another current. That current, which pours into the brain, will disturb the arrangements, existing there. The brain cells are connected by fibres, and the fine fibres have a passage, through which the nerve current flows, and they are all connected. Each in turn, excites others. Now, if the sensations comes in one corner of the brain it would be connected with the other corners, or other cells in some way. But they cannot exactly tell how they are connected, and how the association of ideas takes place. They t to explain by the automatic or mechanical theory, but they cannot describ

এতক্ষণ যে তত্ত্বের আলোচনা হলো তা শারীরবিদ্যা বা নরদেহতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আরো প্রশ্ন আছে যা এই তত্ত্বটিকে বানচাল ক'রে স্বামী অভেদানন্দ এই বিষয়টির মীমাংসা করবার জন্যে 'Aphasia' বা বাক্‌শক্তির বিলুপ্তি' রোগের প্রসংগ তুললেন। নিপুণ শারীরতত্ত্ববিদের মতো তিনি ব্যাখ্যা ক'রে চলেছেন তাঁর বক্তব্য বিষয়। তাঁর বর্ণনাভংগী দেখে মনে হয় যেন তিনি দীর্ঘদিন শুধু এই বিদ্যারই অনুশীলন করে এসেছেন। তাঁর চমৎকার বর্ণনাটি তুলে ধরছি।

Aphasia (অ্যাফাসিয়া) হলো এক ধরণের রোগ। জিভ্ বা ঠোঁটের অসাড়তা নয়। এই রোগে বাক্‌শক্তি লোপ পায়। যে লোকের 'মোটর অ্যাফাসিয়া' (Motor Aphasia) রোগ আছে, তাঁর বাক্‌শক্তি লুপ্ত হয়েছে। তিনি হয়ত কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন, কিন্তু ঐ উচ্চারিত শব্দের অর্থ হৃদয়ংগম করবার ক্ষমতা তাদের নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন না, অর্থ সমন্বিত কোন সুসংবদ্ধ কথা বলার তো ক্ষমতা নেই-ই। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই রোগে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বর্ণিত সমস্ত 'যান্ত্রিক তত্ত্ব' বানচাল হয়ে যায়। কিন্তু, কেন? কারণ 'Brocha' মস্তিষ্কের বাক্‌শক্তির কেন্দ্রে অবস্থিত। এই বাক্-কেন্দ্রে মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের হেমিস্‌ফিয়ারের ডান দিকে যারা বাঁ-হাতের ব্যবহার বেশী করেন, যাঁরা ডান

perfectly, because they do not know what is happening in the brain of a living man. Then these currents will explode, as it were, in the brain, and a discharge of downward nerve current will begin, and will reach the muscles. Then the whole process is done automatically. That will be the reflex action. The psychologists say that when these currents will carry these minute atoms of the cells into the brain, they will produce a kind of electrical explosion, and that explosion, there will come what we call consciousness. Then it will begin to react, and send another discharge of electrical or nervous current, which will reach the muscles automatically. This theory has been held so long as the only solution of our mental actions from the physiological and anatomic standpoints.

—Swami Abhedananda: *True Psychology*, The Mind and its Modifications: p. 97-99.

হাতের ব্যবহার বেশী করেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রটি বাঁ-দিকে। এখন হচ্ছে, যদি এই রোগে মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থল আক্রান্ত হয় তাহলে, রোগী তার বাক্‌শক্তি হারাবে। মনে করা যাক্ কোন লোক, যিনি ডানহাত দিয়ে কাজে অভ্যস্ত তাঁর প্যারালিসিস হলো, তাহলে তাঁর বাক্‌শক্তি লুপ্ত হবে, অর্থাৎ অ্যাফাসিয়া রোগ আক্রমণ করেছে। এই ধরণের বিবরণ হামেশাই ডাক্তারী জার্ণালে পাওয়া যায়। যদি এই লোকটিকে তার বাঁ-হাত দিয়ে কাজ করাতে অভ্যস্ত করা যায় তাহলে তার মস্তিষ্কে নতুন ক'রে বাক্-কেন্দ্র সৃষ্ট হবে। এবারে আগেকার বিপরীত দিকে। বলা বাহুল্য এটি সম্ভবপর কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তির বলে তার কথা বলার ক্ষমতা আবার ফিরে আসবে। 'যান্ত্রিক বা স্বয়ংক্রিয় তত্ত্ব' অনুসারে এই ঘটনা কেমন ক'রে ব্যাখ্যা করা যায়? এই তত্ত্ব দিয়ে ধরণের আরো অনেক ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না। এমন একজনের কাহিনী জানা গেছে যিনি দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর মস্তিষ্কের এক-অর্দ্ধ শুকিয়ে মরে গিয়েছেন অথচ তিনি অপরার্দ্ধ সাহায্যে কোনরূপ বিকৃতি ছাড়া সব কাজ ক'রে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে শব-ব্যবচ্ছেদ ক'রে জানা যায় তাঁর অর্দ্ধেকটা মস্তিষ্ক এতদিন কাজ করেছে।

স্বামী অভেদানন্দ যখন নিউইয়র্কে তখন ঐ শহরের রুজভেল্ট হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও শল্যবিদ (স্নায়ুরোগ) ডাঃ টমসন প্রায়ই তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতেন। তিনি তখন বৃদ্ধ। তাঁর কাছ থেকে অভেদানন্দ এই রোগের বিস্তৃত বিবরণ প্রমাণ সহ পেতেন। অতএব অনুমান করা যাচ্ছে যে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বক্তব্য পেশ করবার আগে নানা বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে নিতেন। বিজ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। ডাঃ টমসন (Dr. Thomson) প্রমাণ করেছিলেন যে, মস্তিষ্ক কখনও 'ব্যক্তিত্ব' (personality) সৃষ্টি করতে পারে না, বরং 'ব্যক্তিত্ব বোধ' মস্তিষ্ককে তার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে। তিনি এই ব্যক্তিত্ববোধকে বলতেন 'আত্মা' (soul)। আত্মা এবং মন উভয়েই মস্তিষ্কে ক্রিয়াশীল। যদি মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্র বা অংশ বিনষ্ট হয়, তাহলে উভয়ে মিলে মস্তিষ্কের মধ্যে অনুরূপ একটি কেন্দ্র সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। এই ঘটনা আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের 'স্বয়ংক্রিয় তত্ত্ব'কে আঘাত হেনেছে। এই তত্ত্ব আবেগ, সংস্কার, ইচ্ছা, বাসনা এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

তাহলে আবেগ বা চিত্তবৃত্তি (emotion) কি? মনের এই অবস্থাকে কে অনুভব করে? মস্তিষ্ক কি তা অনুভব করে? না; অথচ ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দ, দুঃখ, ভালবাসা, ঘৃণা, ক্রোধ, ভয়, অহংকার ইত্যাদি অনুভব করেন। এগুলিই হলো চিত্তবৃত্তি। এগুলিকে বলা যেতে পারে মনের নানা অবস্থা। কিন্তু কেমন ক'রে তা সৃষ্ট হয়—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা।

তাঁরা বলেন এগুলি কোন ধরণের অনুভূতির প্রতিক্রিয়া অথবা স্বাভাবিক ক্রিয়া—যা স্নায়ুপ্রবাহের ভিতর দিয়ে আসে এবং গুরু মস্তিষ্কের 'লুপ' দিয়ে একটি আবর্তের (Circuit) রচনা করে। অবশ্য চিত্তবৃত্তির বাহ্যিক প্রকাশও আছে। যে কোন চিত্তবৃত্তি বা আবেগের জন্য বহিরঙ্গও প্রভাবিত হয়। যেমন কোন লোক রেগে গেলে তার চোখ দুটি লাল হয়, মুখ রক্তিম হয়, রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে, রক্ত সঞ্চালনের গতি ও শরীরের তাপ বেড়ে যায়। যদি কোন লোকের মনে ঘৃণার ভাব জাগে তবে তার শরীরে একরকম মারাত্মক বিষের সৃষ্টি হয়। ক্রুদ্ধ মা যদি তাঁর সন্তানকে সেই অবস্থায় স্তন্য পান করান তবে তাঁর সন্তানের শরীরে সেই বিষ সংক্রমিত হয়। কোন লোক ভয় পেলে তার দেহে বিকার হয়, তার হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপতে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত হয়, আবার কখনো কখনো তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এ সবই ভাব তথা আন্তর মানসিক বৃত্তির বাইরেকার প্রকাশ। অভেদানন্দ বলেন আধুনিক বিজ্ঞান এগুলি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

অভেদানন্দ বলেন, সহজাত বুদ্ধিকে (Instinct) আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের বিদ্যা দিয়ে বিচার করতে পারেন না। স্বয়ঞ্চলতাবাদেরও (automatism) তাঁরা ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। সহজাত জ্ঞান বা বুদ্ধি আমরা তাকেই বলবো যা কোনরকম উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি না রেখেও কোন-না-কোন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করে। চিত্তবৃত্তিকে অনুভূতি-ই বলা যায়, কাজেই সহজাত জ্ঞান বলতে বোঝায় ক্রিয়াশক্তি। অর্থাৎ কৃতকর্মের কি ফল হবে সে বিষয়ে না জেনেও কাজ করবার প্রবৃত্তি ও শক্তি। মনোবিজ্ঞানে অনুভূতিকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও চিত্তবৃত্তি (আবেগ) এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূল বা প্রতিকূল বোধের নামই ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর ভাব বা কোন কিছুর ধারণার সংগে অনুভূতির যে সম্পর্ক তাকেই বলা

যেতে পারে ইন্দ্রিয়বৃত্তি। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডুগাল বলেন এই দুটি শব্দ অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে এ দুটি শব্দ সংবেদন বা অনুভূতিকে বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। অভেদানন্দ বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে সহজাত জ্ঞানের সঙ্গে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়, যেহেতু সহজাত জ্ঞানকে তাঁরা মিশ্র স্নায়বিক প্রবৃত্তি বা সুশৃংখল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হিসাবে ধ'রে ভুল করেন।

স্বামী অভেদানন্দ বাসনা বা ইচ্ছা অথবা সংকল্পকে মনের অন্যতম অবস্থা বলেছেন। স্বয়ঞ্চলতাবাদের সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না কেমন ক'রে বাসনা জাগে। বাসনা যে কি তা-ও আমরা বলতে পারি না, অথচ আমরা বলি যে এটি আমাদের বাসনা অথবা এ কাজ করতে আমাদের ইচ্ছা।

এই তিনটি শব্দকে আমরা তিন বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করি। 'বাসনা' বলতে আমরা এমন কাজ বুঝি যা আমাদের আনন্দ দেবে অথবা আরামদায়ক অনুভূতি এনে দেবে। 'ইচ্ছা' বলতে আমরা কোন অনিশ্চিত বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার কথা বুঝি।

'সংকল্প' (Will) কথাটি শারীরিক সঞ্চালনের সঙ্গে সংযুক্ত। যেমন বলা যেতে পারে, আমি আমার হাত নাড়তে ইচ্ছা করি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে আমরা জানি না 'বাসনার' উৎপত্তি কোথায়, কেন আমরা কোন জিনিস ইচ্ছা করি এবং কেনই বা লোকে কোন প্রীতিকর অনুভূতি সৃষ্টির জন্যে 'ইচ্ছা' শব্দের প্রয়োগ করে! এর থেকে আমরা কি লাভ করতে পারি? স্বামী অভেদানন্দ এ সম্বন্ধে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন,[৪]

> 'The utilitarian theory does not explain it. It might increase the life time, or might help in gaining more knowledge, or something of value. The mechanical theory is not also clear about it.'

তিনি বলেন, শারীরবিদ্যার অনুসারী বা অনুগামী মনোবিজ্ঞান মস্তিষ্ককে একটি মেসিনের সঙ্গে তুলনা করেছে। কিন্তু এই যন্ত্রটিকে কে নিয়ন্ত্রিত করে ব কেন করে তার কোন কথা বলে নি। কাজেই আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না।

---

৪ The Mind and its Modifications: *True Psychology*, p. 104.

কিন্তু প্রকৃত মনোবিজ্ঞান (True Psychology) এ' বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা বলে। এই মনোবিজ্ঞান বলে 'বাসনা' আমাদের চেতন। জীবনের গোড়াকার জিনিষ। 'বাসনা' হলো সকলের মূলে এবং এ-ই হলো প্রতি ব্যক্তির সৃজনী-শক্তি। এই বাসনাব ফলে সৃষ্ট হয়েছে নানা ইন্দ্রিয়—বাসনা চরিতার্থের জন্যেই। অর্থাৎ আমাদের যদি দেখার ইচ্ছা না থাকতো তাহলে আমাদের 'চোখ' হয়তো সৃষ্ট হ'তো না। তেমনিভাবে বলা যেতে পারে, শোনবার ইচ্ছা না থাকলে আমাদের কানের এবং সেই সংগে স্নায়ুমণ্ডলীর সৃষ্টি হ'তো না। খাবার বাসনা না থাকলে দাঁত হতো না, পাক-যন্ত্র বা অনুরূপ কোন যন্ত্রের উদ্ভব হ'তো না।

Emotion বা আবেগ-সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বলেন, মন যদি মনের উপর ক্রিয়া করলে যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় তাকে আবেগ বা ভাবাবেগ কিংবা চিত্তবৃত্তি বলা যেতে পারে। অনুভূতি হচ্ছে শরীর মনের উপর ক্রিয়া করলে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা।

অনুভূতির উদ্দীপনা সাধারণতঃ আসে বাইরের জগৎ থেকে। কিন্তু Emotion বা চিত্তবৃত্তির উদ্দীপনা সব সময় বাইরে থেকে আসে না। একথা আমরা জানি যে শরীর উদ্দীপিত না হলে অনুভূতি হয় না, অথচ এ না হলেও ভাবাবেগ বা চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হতে পারে। ইংরেজীতে এ সম্বন্ধে চমৎকার একটি লাইন আছে : 'Feeling is peripherally excited and emotion is centrally excited'। বিশেষজ্ঞরা বলেন ভাব বা Emotion উদ্রেকের পক্ষে চিন্তা হ'লো মূল জিনিস। চিন্তা না করলে আবেগের সৃষ্টি হয় না।

এই আবেগের পরবর্তী অধ্যায়ে আসে শারীরিক প্রকাশ। কোন কারণে আমাদের মনে নানা চিন্তার উদ্ভব হলে চিত্ত আবেগে উদ্বেলিত হয়। এই সংগে মস্তিষ্কও। যেহেতু সব মানসিক ক্রিয়া মস্তিষ্কের মধ্যেই সম্পাদিত হয়। অথচ মস্তিষ্কে আলোড়ন ঘটলে তা সেখান থেকে বহু স্নায়ুপথ বেয়ে শরীরের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আবার আন্দোলিত অংগ-প্রত্যংগ থেকে যে অন্তর্মুখী স্নায়ুসমূহ নিঃসৃত হয়ে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছেচে তাদের মারফতে এই আলোড়নের সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং সেখানে সংবেদনে পরিণত হয়।

অধ্যাপক জেমস এবং লাঁজে, (James and Lange) বলেন, আমাদের দেহে প্রথমে শারীরিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং তারই ফলে Emotion বা আবেগের

সৃষ্টি হয়। জেমস্ বলেন চিন্তা যখন দেহকে আলোড়িত করে, তখন দেহ নির্বিবাদে সেই আক্রমণ সহ্য করে না। অর্থাৎ চিন্তা যেমন দেহের উপর ক্রিয়া করে, দেহও তেমনি চিন্তার উপর প্রতিক্রিয়া ক'রে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় ভাবাবেগের।

মনোবিজ্ঞানের জগতে সমসাময়িক চিন্তার অবদান বিচিত্র। সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানে প্রধাণতঃ দুটি মতবাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সে দুটি হলো গঠনমূলক (structural) এবং ক্রিয়ামূলক (functional)। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে গঠনমূলক মনোবিজ্ঞানে আত্মার আকার, গঠন ও বিষয়বস্তুকে গ্রহণ ক'রে তার গবেষণা করা হয়। ক্রিয়ামূলক মনোবিজ্ঞানে এ'সব বিশ্লেষণী নীতি তো থাকেই। বরং চৈত্যন্যের ক্রিয়া ও বিকাশের দিকেও বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

স্বামী অভেদানন্দ 'বিবেক'কেও মনের একটি বৃত্তি মনে করেছেন। অপরোক্ষতা মানসিক জ্ঞান অনুভূতি শক্তির এক অন্যতম বিকাশ। তাকে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানও বলা চলে। অপরোক্ষ জ্ঞানে কোন সংশয় বা অমীমাংসার ভাব থাকে না। সহজাত ও প্রত্যক্ষজ্ঞান এ দুটিই মনের একটি বিকাশেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। নীচুশ্রেণীর প্রাণীতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নাম সহজাত জ্ঞান (instinct) এবং মানুষের ক্ষেত্রে তা হ'লো অপরোক্ষতা (intuition)। অপরোক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই সংযোগ থাকে স্মৃতি ও বিগত অভিজ্ঞতার। একারণেই অপরোক্ষজ্ঞানের সঙ্গে যদি অতীত বা পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্মৃতি সূত্রবদ্ধ না হয় তাহলে সহজাতজ্ঞান লাভ করার আশা বৃথা।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে দেখি অধ্যাপক জেমস্ সহজাত ক্রিয়াকে (Instinctive Action) এক ধরণের পরাবর্তক ক্রিয়া বলেছেন। তিনি বলেন পরাবর্তক ক্রিয়ার (Reflex Action) সব লক্ষণই সহজাত ক্রিয়ায় আছে। পরাবর্তক ক্রিয়ার মতো সহজাত ক্রিয়াতেও বাইরে থেকে উদ্দীপনা আছে। উভয় ক্রিয়াতেই মনের সম্পর্ক আছে।

সহজাত প্রবৃত্তি মানেই জন্মগত প্রবৃত্তি। কিন্তু প্রতিটি জন্মগত প্রবৃত্তিকেই সহজাত প্রবৃত্তি বলা উচিত নয়। তাহলে সহজ্যত প্রবৃত্তির সঙ্গে চিত্তবৃত্তি বা ভাবাবেগের পার্থক্য কোথায়? Stout বলেন চিত্তবৃত্তি (Emotion)

আমাদের সহজাতপ্রবৃত্তির পরগাছা মাত্র। সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) থেকে পেয়ে তা আমাদের মানসিক জীবনে পল্লবিত হয়ে ওঠে। ম্যাকডুগাল (McDougal) বলেন Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তি যেখানে আছে সেখানে কোন-না কোন Emotion-ও (চিত্তবৃত্তি) বর্তমান আছে। তিনি বলেন যে কোন সহজাত-প্রবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করা যাক্ না কেন, তার মধ্যে আমরা অবশ্যই কোন চিত্তবৃত্তির সন্ধান পাবো। যেহেতু চিত্তবৃত্তিই হ'লো তার অন্তরতম উপাদান। ইংরেজীতে বলা যেতে পারে: 'Emotion is an integral part of Instinct'। তবে একথাও সত্যি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে ভাবাবেগ জড়িত আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি ভাবাবেগের সঙ্গে সহজাত বৃত্তি জড়িত নেই। যেমন ধরা যেতে পারে—ভগবানে চিন্তা ক'রে বা সত্য ও সুন্দরের কল্পনা ক'রে আমাদের মনে যে শান্ত ও মধুরভাবের উদ্রেক হয় যাকে নৈর্ব্যক্তিক আবেগ (Impersonal Emotion) বলা যেতে পারে তার সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) জড়িত থাকতে পারে না। মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থে এই ধরণের ব্যাখ্যা দেখা হলেও একটা জিনিস আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি সহজাত প্রবৃত্তি না থাকলে ঈশ্বরানুরাগ সম্ভব নয়। একথা যদিও বলেন সাধকেরা, তথাপি আমরাও এই বক্তব্যের যথার্থ অনুধাবণ করতে পারি।

আচরণবাদে সহজাত প্রবৃত্তিকে জন্মগত আচরণ-ছাঁদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা প্রথমে অব্যক্ত থাকে, পরে উপযুক্ত পরিবেশের সংস্পর্শে ব্যক্ত হতে থাকে। মনোবাদীরা একে বংশগত 'অভিজ্ঞতাচিহ্নের জট' ব'লে মনে করেন। তাঁরা বলেন কোনো সুদূর অতীতে সহজাত-প্রবৃত্তিরূপ জট কোন শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে সৃষ্ট হয়েছিল, তারপর সেই জীব-শ্রেণী বংশ-পরম্পরায় সেই সব জট সহজাত-প্রবৃত্তি রূপে বয়ে নিয়ে আসছে। ধৃতি-শক্তির সাহায্যে জীব-সম্প্রদায় সেই সুদূর অতীতকালের জটগুলিকে শ্রেণীগতভাবেই ধরে রেখেছে। যেহেতু পরিবেশ চিরকাল একই থাকে না, তাই সহজাত প্রবৃত্তি সমূহ একইভাবে অবশ্যই নেই। ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যও নানাভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং তা ক্রমেই বাড়ছে।

সহজাত প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও সংখ্যা নিয়ে নানা মত আছে। কেউ কেউ মনে করেন দৈহিক ব্যাখ্যা দিলেই কাজ শেষ হ'লো। আবার অনেকে বলেন দৈহিক ব্যাখ্যা অসম্ভব। যাই হোক এর একটি তালিকা তুলে ধরছি। পলায়ন

(instinct of flight), যোধন (combat), বিকর্ষণ (repulsion), সন্তান-রক্ষণ (paternal instinct), আবেদন (instinct of appeal), মৈথুন (instinct of mating) কৌতূহল (curiosity), আত্মনমন (submission), আত্মসংস্থাপন (self-assertion), যূথ-চরণ (gregarius instinct), খাদ্যান্বেষণ (foodseeking), অধিকরণ (acquisition), সৃজন (construcetion) ও হাস্য (laughter)। বিশেষজ্ঞরা বলেন সহজাত প্রবৃত্তির নির্দিষ্ট ভাবাবেগ আছে। যখনই কোন সহজাত প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়েছে বলি তখনই বুঝতে হবে সংগী ভাবাবেগও উদ্দীপিত হয়েছে, তা নইলে সেই জীব আচরণশীল হ'তো না। চোদ্দটি সহজ-প্রবৃত্তির চিত্তবৃত্তি সমূহ হলো যথাক্রমে ভীতি (fear), ক্রোধ (anger), ঘৃণা (disgust), বাৎসল্য (tender emotion), বেদনা (distress), কাম (lust), বিস্ময় (wonder), নতিভাব (negative selı-feeling), অহংভাব (posifive self-feeling), নিঃসংগ-ভাব (feeling of loneliness), লোভ (gusto), অধিকারীভাব (feeling of ownership), স্রষ্টাভাব (feeling of creativeness), আমোদ (amusement)।

আত্ম-সংস্থাপন (self-assertion) সাধারণ সহজ-প্রবৃত্তি নয়। যদিও তা মূল সহজ-প্রবৃত্তি। তাকে বলা যেতে পারে জীবনেরই নামান্তর। সহজাত প্রবৃত্তি এবং ভাবাবেগ জীবনের কাঁচা মাটি। এগুলিকে নিয়েই গড়ে তুলতে হবে জীবনের পূর্ণাংগ পুতুল। এদের নিয়ন্ত্রিত ক'রে, সঠিকভাবে পরিচালিত করে তাদের উদ্‌গতি (sublimation) করা হলো শিক্ষার মূল সমস্যা। অভেদানন্দ বলেন প্রতিটি সহজাতজ্ঞানের পেছনে থাকে ইচ্ছাকৃত চেষ্টা এবং এমন কিছু থাকে বলা যেতে পারে পূর্ব' প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়' বা pre-established harmony। প্রত্যক্ষজ্ঞানকে আমরা শক্তি' বলতে পারি। তারই সাহায্যে বিষয়ী-মন কোন বিচার না ক'রে, কোন প্রশ্ন না তুলেও পরিণতিকে লক্ষ্য করে। যুক্তি-বিচারের কোন বালাই নেই। তাই অপরোক্ষ জ্ঞানে কোন 'কারণ' জিজ্ঞাসা থাকে না। একে যেমন যুক্তিবিচারের নেতিবাচক প্রণালী বলা যেতে পারে, তেমনি এটিই যে জ্ঞানের কারণ সে সম্পর্কে'ও সচেতন হ'তে হবে। স্বামী অভেদানন্দ বলেন এই জ্ঞান অবশ্যই আসবে। তিনি অপরোক্ষ জ্ঞান (intuition) কথাটিকে ঔপনিষদিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন, ব্যবহার করেছেন, কারণ তাঁর অপরোক্ষজ্ঞানে সন্দেহের বা যুক্তিতর্কের

বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অথচ তাকে তিনি মনেরই এক বিশেষ বৃত্তি রূপে দেখেছেন। তিনি বলেছেন,[৫]

'Intuition is another modification of the power of the mind. It is a direct perception. The word is derived from the verb 'intuit', which means 'to look upon.' Intuition is never doubtful nor undecided. We can not argue it.'

উপনিষদে অপরোক্ষতা হলো দিব্যজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। দার্শনিক কান্ট এই অপরোক্ষতা সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'Pure intuition exists a priori in the mind, as a mere form of sensibility and without any real object of the senses or any sensation'। দার্শনিক প্রবর বার্গসোঁ বলেছেন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো সত্যবস্তুর প্রতি বৌদ্ধির সহানুভূতি। অর্থাৎ কোন প্রণালীর মাধ্যমে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি অখণ্ডভাবে এবং সত্যবস্তুর অন্তরতম এলাকার সংগেই আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় করে। তাঁর নিজের ভাষায়[৬]—

'It is a kind of 'intellectual sympathy'—a direct approach to integral experience of reality which enables us to enter into the core of it. This intellectual appreciation is the only inexpressible medium through which we can enter into the citadel of the unique absolute Reality, and for want of it we can only move round the Reality, but cannot touch or penetrate its region.'

উপনিষদে বলা হয়েছে, 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়া' :—অর্থাৎ হৃদয়ের সবগ্রন্থি ভেদ ও সব সংশয় ছিন্ন না হ'লে দিব্যজ্ঞান হয় না। কাজেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মনোবিজ্ঞানীরা যে সাদামাঠা কথাতে পরোক্ষ জ্ঞান কথাটার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তা ততটা সহজ নয়। অভেদানন্দ একারণেই বলেছেন অপরোক্ষ জ্ঞানে কোন যুক্তি, কোন তর্কের স্থান থাকে না।

মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় স্বামী অভেদানন্দ চৈতন্য (consciousness), জ্ঞান (knowledge), ধারণাশক্তি (understanding), অধ্যাস (illusion), ভ্রান্তি

৫ *True Psychology*
৬ *Introduction to Metaphysics.*

(hallucination) প্রভৃতির প্রসঙ্গ এনেছেন এবং এদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিজের প্রজ্ঞালোকের সাহায্যে। প্রথমেই চৈতন্য (consciousness) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

মস্তিষ্কের কোষের কার্যকলাপের জন্যেই চৈতন্যের সঞ্চার হয়। একথা বলে আধুনিক মনোবিজ্ঞান, যার অন্য নাম শারীরতত্ত্বীয় মনোবিজ্ঞান। আধুনিক কালে স্কুল-কলেজের অধ্যাপকেরা, চিকিৎসাবিদেরা, বিজ্ঞানী, নরদেহতত্ত্ববিদ এবং বায়োলজিস্টরা বলে থাকেন মন, চিন্তা, বুদ্ধি এবং চৈতন্য বা বিবেক একই জিনিসের বিভিন্ন টার্ম মাত্র। যেসব বস্তুকণার সাহায্যে আমাদের স্নায়ুসংস্থা গতি বা মস্তিষ্ক সৃষ্ট হয়েছে তাদেরই সংযোগ সাধনের ফলে এই বিশেষ বৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে। যখন আমরা কোন কিছু দেখি তখন মস্তিষ্কের 'পার্শ্বকপাল ভাগ' (temporal lobe) কার্যকরী হয়। এমনি ভাবে আরো নানা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যাঁরা শারীরতত্ত্বীয় মনোবিজ্ঞানে আস্থাশীল তাঁরা যে তত্ত্বে বিশ্বাসী তার নাম হলো 'production theory.'

এই তত্ত্বে জানা যায় যে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। যদি মস্তিষ্ক অকেজো হয় তাহলে মনও অকেজো হয়। শুধু তাই নয়, মন, চৈতন্য, বোধি এবং সবকিছুই বিপর্যস্ত হয়। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীদের অনেকে একে রহস্যময় বলে বর্ণনা করেছেন। আর এই রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা পৃথক পৃথক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এক মতবাদে আছে 'সংবেদন' মস্তিষ্কে পৌঁছে চিন্তা ও ধারণায় রূপান্তরিত হয়, ঠিক যেমনি খাদ্যবস্তু পাকযন্ত্রে পৌঁছবার পর নানা রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। কিন্তু এই তত্ত্ব মন বা মানসিক ক্রিয়ার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। আমরা আমাদের জীবনে নানা ধরণের "সাইকিক ঘটনার" মুখোমুখি হই যার হিসেব রাখেন ঐ বিষয়ের গবেষকমণ্ডলী। সাইকিক্ (psychic) কথাটি এসেছে 'সাইকি' (psyche) থেকে। এর মানে আত্মা। অর্থাৎ সাধারণ কথায় বলা যেতে পারে দৈবিক বা অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর কোন ব্যাখ্যা আধুনিক মনোবিজ্ঞান দিতে পারে না। অভেদানন্দ বলেন,[৭] সত্যি কথা বলতে মস্তিষ্ক 'চৈতন্য' সৃষ্টি

৭ 'Truly speaking, the brain does not produce consciousness, as it is something absolutely different from the activity of the brain.'—*True Psychology* ('The consciousness') p. 25.

পারে না, কারণ এ হ'লো মস্তিষ্কের কার্যকলাপের থেকে স্বতন্ত্র
ায়ের।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা 'সাইকোলজি' কথার মানে যে 'আত্মার বিজ্ঞান'
ience of the soul) তা কখনো বলবেন না। যেহেতু 'আত্মা' ইন্দ্রিয়-
নর নাগালের বাইরে। তাঁরা এমনকি একে 'মনের বিজ্ঞানও' বলতে কুণ্ঠিত,
হতু 'মন' বলতে আমরা এক অবিচ্ছিন্ন বস্তু বুঝি। তাঁরা এই বিজ্ঞান বলতে
করেন চেতনার (?) বিভিন্ন অবস্থার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা। সত্যি কথা বলতে
, এই চেতনা অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তার কোন স্থায়ী ভিত্তি নেই।
তেমনি চৈতন্যের কোন বিচ্ছিন্নতা নেই। ব্যক্তিগত চেতনা এক
াচ্ছিন্ন প্রবাহ। যদিও আমাদের চেতনার মধ্যে পরিবর্তন আছে তথাপি
রা অনুভব করতে পারি যে তার মধ্যেও যে ঐক্য আছে, যেন ঐ চৈতন্যেরই
হ অন্তঃসলিল হয়ে চলেছে। অভেদানন্দ বলেন এই চিরপ্রবহমানতা মৃত্যুর
ও বিচ্ছিন্ন হয় না। প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের মতে এই প্রবাহ কদাপি ভঙ্গ
তাহলে আমরা কিছুতেই ভাবতে পারি না, চৈতন্য শূন্যে মিলিয়ে
। যদি 'চেতনা' "কোন কিছু" হয়, তবে নিয়ম অনুসারে বলা যায় চেতনা
ন্য' থেকে আসেনি বা 'শূন্যে' মিলিয়ে যাবে না। যদি মস্তিষ্কে কোন
শন পদার্থের সংযোগের জন্য চেতনার সঞ্চার হয় এমন কথা ভাবা যায় তাহলে
শ্যই মনে করতে হবে সেই পদার্থগুলি 'চেতনাযুক্ত'।

স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদ করলে 'আত্মা'র হদিস পাওয়া
না। চেতনা কিংবা মনেরও কোন স্থান নেই। একারণেই তিনি এসব
বীকারা করেছেন। অভেদানন্দ বলেন এই অস্বীকারোক্তির মধ্যে রয়েছে
কারোক্তি[৮]। যদি বলা হয়, 'না এ কখনো থাকতে পারে না' তাহলে মনে
তে হবে চৈতন্যাবস্থার পূর্বাবস্থা স্বীকার করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানীপ্রবর জি. জে. রোমানেস্ (O. J. Romanes) বলেছেন,

'We cannot think any of the facts of external nature with-
presupposing the existence of a mind which thinks them,

'But the very fact of denying the existence of soul, consciousness or
nd presupposes another mind which is denying.'—*True Psychology* (Cons-
usness), p. 33.

and therefore, so far at least as we are concerned, mind necessarily prior to everything else. It is for us the on mode of existence which is real in its own right, and to as to a standard, all other modes of existence which may inferred must be referred. Therefore, if we say that mi is a function of motion, we are only saying, in somewh confused terminology, that mind is a function of itself. Su then I take to be a general refutation of materialism.'

অভেদানন্দ বলছেন, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে 'মন' হলো সর্বাগে অতএব যখন আমরা আমাদের চেতনার স্তর সম্পর্কে আলোচনা করি ত বাস্তবিকপক্ষে আমরা চেতনার এক নতুন স্তরে থাকি। আমরা চেতনার স্তরগু অতিক্রম ক'রে যেতে পারি না। কারণ, স্বামী অভেদানন্দ বলেন, আম চেতনার (চৈতন্য) উৎস খুঁজে পাই না, যেহেতু এই চেতনা আমাদের সঙ্গে আছে, আমরা তাকে পরিত্যাগ করতে পারিনা[৯]। চেতনার স্তর পেরিয়ে যে পারলে তার উৎস পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাতো সম্ভব নয়, কারণ অচৈতন্যে সাগরে ডুব দিয়ে চেতনার উৎস দেখা যায় না।

'চেতনা' বলতে কি বুঝি? একে কি 'প্রত্যভিজ্ঞান' বলা যেতে পারে অভেদানন্দ নানা উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে শেষ পর্যন্ত বলেছেন চৈতন্য ও জ্ঞ এক নয়। তাহলে চেতনা কি? জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপ হচ্ছে 'চেতনা'[১০]। এ জিনিস স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি বলেন কোন জিনি সম্পর্কে সচেতন হতে গেলে আমাদের চিন্তা করতে হয় না বা গণনার প্রয়ো নেই। এ হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত। আমেরিকার বস্তুবাদীদের মতে চৈতন্য হলো 'not any distinct subjective existence, but only a particul grouping of objects, defined by the specific response of t nervous system.'

৯ 'We cannot find the source of consciousness, because we have we cannot leave it ; we are one with it.'—*True Psychology*, p. 34.

১০ Consciousness means the establishment of relations between subj and object. It is instantaneous.'—Ibid, p. 36.

হোল্ট (Prof. Holt) বলেন,

'Consciousness is the cross-section of the universe defined by the 'specific response' or behaviour of the nervous organism.'

ুনিক মনোবিজ্ঞান বা শারীরতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল মনোবিজ্ঞানে চেতনাকে াযোগের' (attention) সংগে অনেকটা জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

চৈতন্য এবং 'জানা' (understanding) এক নয়। ভ্রান্তি, ভ্রম, মায়া লিও চৈতন্য নয়। 'চৈতন্য' গতি নয়। অভেদানন্দ বলেন,

'Consciousness is that which gives us the knowledge of motion.'

ভদানন্দ বলেন, 'জ্ঞান বা জানা বলতে বোঝায় প্রত্যভিজ্ঞান বা পুনরায় জানা' nowledge or awareness recognition)। মানুষ কোন একটি য়ের জ্ঞান লাভ করে, তার কারণ সেই মানুষের আন্তর চেতনা বিষয়-চৈতন্যের গ একীভূত হয় এবং এই অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ আমাদের বিষয়ের বাস্তব ভূতির ক্ষেত্রে চেতনা আনে। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, বিষয়ী বিষয়কে জানে, যেহেতু বিষয়ী কর্তা বিষয়রূপ কার্য থেকে স্বতন্ত্র নয়। জানার য়টি যতক্ষণ না আমাদের মনের কোণে আসন পেতে না বসছে, ততক্ষণ তার া হয় না মোটেই। তাঁর মতে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আন্তর বা মনের জিনিস।

হোয়াইটহেড এই বিষয়-জ্ঞানের নাম দিয়েছেন 'রেকগ্‌নিশান্‌ বা ্যভিজ্ঞান'। এই প্রত্যভিজ্ঞান ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান নয়। একে বলা যেতে পারে য়র জ্ঞান।

ঞানী হোয়াইটহেড এ' প্রসংগে বলেছেন,[১১]

'কোন বিষয়কে জানা একটা প্রণালীবিশেষ বা অবস্থামাত্র। তাকে বলা যেতে পারে প্রত্যভিজ্ঞান। তার আর এক নাম একত্ববিজ্ঞান।'

ভদানন্দের মতামত অনেকটা একই ধরণের সেকথা বলা হয়েছে। তিনি ন জ্ঞান মানে প্রত্যভিজ্ঞান—(consciousness means recognition)।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হ'লো—অভেদানন্দ এর মধ্যে বৌদ্ধিক সম্পর্কের ntellectual relation) কথা স্বীকার করেছেন, হোয়াইটহেড কেবলমাত্র

[১১] 'I use recognition for the non-intellectual relation of sense-awareness ich connects, the mind with a factor of nature without passage.'—Prof. N. Whitehead : *The Concept of Nature,* p. 143.

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কথা ধ'রে নিয়েছেন। মনোবিদ্ ডঃ সি, জে, ইয়ুং ও জ্ঞানর .ক্রিয়ার মধ্যে 'জানা' ও 'প্রত্যভিজ্ঞান' এই দুয়ের বিকাশের কথা স্বীব করেছেন। অভেদানন্দ যেখানে 'প্রত্যভিজ্ঞান' বলতে 'চৈতন্য' বোঝা চেয়েছেন সেখানে আবার প্রত্যভিজ্ঞানকে বলেছেন প্রাথমিক জ্ঞান। তার স বৌদ্ধিক জ্ঞানের সম্পর্ক নেই।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান চেতনার কোন সংজ্ঞা দিতে পারে নি। ত বলেছে এর কোন যুক্তিগত সম্ভব নয়, যেহেতু চেতনা হলো মানব-জীব এক মৌল অবস্থা। আর চেতনা অর্থে তাঁরা মনে করেছেন 'বোধ'। অথ তা ইন্দ্রিয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। বিভিন্ন চেতন অবস্থার কথা বলা হয়ে যেমন চিন্তা (thinking), অনুভূতি (feeling) এবং ইচ্ছা (willing ল্যাড (Ladd) বলেন,[১২] 'চেতনা হচ্ছে সেই অবস্থা, যখন আমরা সম্পূর্ণ জাগ্র তার বিপরীত অবস্থা হচ্ছে যখন গভীর, শান্ত ও সম্পূর্ণ স্বপ্নহীন ঘুমে হই...।'

আগেই বলেছি মনোবিজ্ঞানীরা চেতনার সংজ্ঞা দিতে পারেন নি। (উইলি জেমস্ কতগুলি চেতনার কতগুলি বিশেষ লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য স্বামী অভেদানন্দ সম্পর্কে উইলিয়ম জেমস্ অত্যন্ত শ্র ছিলেন)।

ক. চেতনা সর্বদাই কোন ব্যক্তিজীবনের অঙ্গ।

খ. চেতনা হলো কোন বস্তু বা অবস্থা সম্বন্ধে বোধ। এবং বস্তুর পরিব হলে চেতনার পরিবর্তন ঘটে। অতএব চেতনা ব্যক্তিসাপেক্ষ ও ব সাপেক্ষ।

গ. চেতনাকে বলা যেতে পারে স্রোতের মত অবিচ্ছিন্ন ধারা অর্থ it is a stream of consciousness.

এই স্রোতধারার দুটি দিক আছে—একটি হলোঅবিচ্ছিন্নতা (continuity আর একটি হচ্ছে নিয়ত পরিবর্তন (constant change)। চেতনা যদি গতিশীল, তথাপি তার গতির বেগ সর্বত্র সমান নয়। কখনও বা দ্রুত, কখ বা শ্লথ। আবার কখনও বা সমাহিত। এ বিরতির স্তরগুলির ব্যাখ্যা ক জেমস বলেছেন—substantive stages।

১২ Ladd : *Psychology, Descriptive and Explanatory*, p. 30.

চেতনা প্রবহমান, অবিচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলেছে। কিন্তু তা চির-উৎসুক। কান ব্যক্তির পরিবেশের সমগ্র চেতনার ধরা না-ও পড়তে পারে। পরিবেশ থেকে দ্রব্য বা বস্তু পছন্দ ক'রে বেছে নেয়। এই দ্রব্য বা বস্তুতে যখন চেতনা কন্দ্রীভূত হয় তখন আমাদের সেই সম্পর্কে স্পষ্টবোধ জাগে। অর্থাৎ চেতনার মালোয় সব সজীব হয়ে ওঠে। চেতনার এই ধর্মকে লক্ষ্য ক'রে জেমস মন্তব্য করেছেন,[১৩] 'consciousness is selective'। তাহলে চেতনার ক্ষেত্র কাকে বলবো? পরিবেশের যে অংশ চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত তাকে বলা যেতে পারে চেতনার ক্ষেত্র বা field of consciousness। চেতনা চিরপ্রবহমান। কিন্তু তার ক্ষেত্রেরও নিয়ত পরিবর্তন আছে। একারনেই 'চেতনার ক্ষেত্রের' সমস্ত অংশটাই সমান উজ্জ্বল নয়। তাই এই ক্ষেত্রের এক মধ্যবিন্দু আছে। এখানে চেতনা কেন্দ্রীভূত। চৈতন্যলোক তীব্রতম এখানে। একে বলা যেতে পারে focus of consciousness। এই আলোক বৃত্তের চারপাশে রয়েছে বৃহত্তর উপান্তমণ্ডল। অস্পষ্ট, স্তিমিত আলোকে ম্রিয়মান। এ যেন সেই কথা মনে করিয়ে দেয় অন্ধকারের পরেই আলো। এই ছায়াচ্ছন্ন পট-ভূমিকাকে বলা হয় fringe of consciousness। বলা বাহুল্য চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশের বিস্তৃতি অল্প নয়। তা দীর্ঘস্থান জুড়ে ব্যাপৃত। অন্ততঃ জেমস্ ব্যাপক অর্থেই এই কথাটিকে ব্যবহার করেছেন। মনোবিজ্ঞানী স্টাউটের ভাষায়,[১৪]

> '...the field of consciousness normally embraces a central area of clearly apprehended objects and a marginal zone of objects which are apprehended indistinctly.'

বস্তুতন্ত্রবাদী ও অনেক বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী বলেছেন চৈতন্যের উৎপত্তি জড় পদার্থ থেকে। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীরাও বহু আলোচনা করেছেন। কেউ বলেছেন গতি বা কম্পন থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি, কেউ বা বলেন মন থেকে। অভেদানন্দ এর উত্তরে বলেছেন[১৫],

১৩ Willium James: *Principles of Psychology*, vol I, chap IX, p. 224.

১৪ Stout: *Manual of Psychology*, p. 161.

১ 'Suppose you say that matter has produced consciousness. But that you would be an idea or a conception, and that means it would be a state of

'ধরে নিলাম যে, তুমি বলছো জড় পদার্থই চৈতন্যকে সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তা অনুমান বা প্রত্যয় মাত্র অর্থাৎ এটি চৈতন্যের বিকাশরূপ মনের অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। তার মানে এই নয় যে, চৈতন্যকে বাদ দিয়ে তুমি তারই কারণ অনুসন্ধান করছো। অপর কোন জিনিসের পেছনে খোঁজ ক'রে তার কারণ জানা যায়, কিন্তু চৈতন্যের পেছনে গিয়ে কিংবা তার বিকাশকে বাদ দিয়ে তার কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। যেহেতু 'কারণের' অনুসন্ধান করবার প্রবৃত্তি তো চৈতন্যের একটি বিকাশ। কাজেই তার বিকাশের বাইরে আমরা কোনদিনই যেতে পারি না। অপিচ, চৈতন্যকে ছেড়ে তার কারণ নির্ণয় করাও বৃথা, যেহেতু চৈতন্য তো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, তাকে কখনও আমরা ছাড়তে পারি না, চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের সত্তা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত'।

অভেদানন্দের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাংক এবং বিজ্ঞানী দার্শনিক লর্ড হ্যালডেনের মন্তব্যে। প্লাংক বলেছেন[১৬],

'Consciousness, I regard as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind conciousness. Everything that we talk about, everything that we regard as existing, postulates consciousness'.

চৈতন্যকে তিনি মূলতত্ত্ব ব'লে ধরে নিয়েছেন। তিনি মনে করেন জড়পদার্থ চৈতন্য থেকে উদ্ভূত। চৈতন্যকে আমরা অতিক্রম করতে পারি না, তাকে বাদ দিতে পারি না। যে কোন বিষয় সম্বন্ধে যখন আমরা কথা বলি, বলি কোন জিনিস 'আছে' তখন সে সবই 'চৈতন্য' বোঝায়। লর্ড হ্যালডেন এ সম্বন্ধে বলেছেন পরম সত্য জ্ঞানরূপ অধিষ্ঠানের মধ্যে নিহিত থাকে এবং দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় তার পার্থক্যও অখণ্ডতার অন্তর্ভুক্ত, কারণ দ্রষ্টা ও দৃষ্টির বিষয় ইত্যাদি জ্ঞানের পরিধির মধ্যেই পড়ে[১৭]।

consciousness or a state of your mind. It does not say that you have gone behind consciousness to find out its source. We can only find out the source of a thing, by going beyond it, by transcending it, and by going behind it. But can we go behind the state of conciousness ?—*True Psychology*, p. 42

১৬ Observer, Jan. 25, 1931.

১৭ 'Reality lies in the foundational character of knowledge, and in the

ডঃ ইয়ুং (Dr. Jung) চৈতন্যকে তুলনা করেছেন দিনের আলোর সঙ্গে, অচৈতন্যকে রাত্রির সঙ্গে। এই অচৈতন্যকে অবচেতন মনও বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন[১৮],

'We may call consciousness the daylight realm of human psyche, and contrast it with the nocturnal realm of unconsciousness psychic activity which we apprehend as dream like fantasy...'

'এখানে অবশ্য চৈতন্যকে মনের চেতন স্তর বললেই ভাল হয়। অভেদানন্দ চৈতন্যকে বলেছেন—জ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থায় তা পার্থিব বিকাশ রূপে অনুভূত হয়। ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্তের কারণ-জ্ঞানের নাম নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং কার্য-জ্ঞানের নাম সবিকল্পক জ্ঞান। স্বামী অভেদানন্দ চৈতন্যকে (consciousness) নির্বিকল্পক ও পার্থিব জ্ঞানকে (knowledge) সবিকল্পক বলতে চেয়েছেন'।[১৯]

এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে শারীরতত্ত্ব-অনুসৃত মনোবিজ্ঞান যে চেতনার কথা বলে তার সঙ্গে অভেদানন্দের 'চৈতন্যে'র তফাৎ আছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বলা হয় জড়ের যেমন ব্যাপ্তি, তেমনি মনের ধর্ম হলো চেতনা। কিন্তু মন কি সব সময়েই সচেতন থাকে। আমরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছি তা থাকে না। তাহলে দেখতে পাচ্ছি চেতনার বিভিন্ন স্তর আছে। অভেদানন্দ যাকে চেতনার বিকাশ বলেছেন।

এক. চেতনার পূর্ণ-আলোকিত ঊর্ধ্বতন স্তর।

দুই. অস্পষ্ট চেতনার বৃহত্তর পরিমণ্ডল।

তিন. প্রাক্-চেতনার স্তর।

আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলে তিনটি স্তরের নাম দেয়া যায়, পূর্ণ-চেতনার

distinction between perceiver and perceived, knower and known, as being distinctions falling inside the entirety of that foundational character, in as much as they are made by and with knowledge itself.'—'Reign of Relativity.' p. 27.

১৮ Jung : *Modern Man in Search of a Soul* (1945), p. 13.

১৯ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : 'অভেদানন্দ-দর্শন', পৃ ১১৯

স্তর (Conscious Level), অবচেতন স্তর (Subconscious Level), অচেতন বা মগ্নচেতন স্তর (Unconscious Level)।

যখন আমরা জেগে আছি ও আমরা বিষয়-সম্পর্কে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছি, তখন স্পষ্ট জাগ্রত চৈতন্যের অবস্থা। এই পূর্ণ-চেতনাকে আবেষ্টন ক'রে থাকে অস্পষ্ট চেতনার মণ্ডল। তাকে বলা যেতে পারে অর্ধচেতন (subconscious) স্তর। চেতনার যে স্তর পূর্ণ আলোকিত, এই স্তর তার থেকে অনেক বিস্তৃত। আর একটি স্তর হচ্ছে 'অচেতন'। এই স্তরের ব্যাপ্তি আরো অনেক। এই অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন স্তরগুলিকে নিয়ে পূর্ণ-চৈতন্যের বেসাতি।

বিংশ শতকের প্রথম দশকের পর থেকে ফ্রয়েড ও তাঁর শিষ্যরা চেতনার আর একটি গভীরতর স্তরের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, জীবনের অধিকাংশ অভিজ্ঞতা বিস্মৃতির রাজ্যে গিয়ে পাড়ি জমায়। মন যেন অতীতের সেই বোঝা ফেলে দিয়ে হাল্কা হয়ে অগ্রসর হয়। এই বিস্মৃতির গহ্বর থেকে আমরা অনেক ঘটনাকেই স্মৃতির আলোকিত দ্বারে, ফিরিয়ে আনতে পারি সেইহেতু একথা সহজেই অনুমেয় এগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এই বিস্মৃতির তলকে ফ্রয়েডের ভাষায় বলা হয় প্রাক্ চেতনার স্তর বা pre-conscious stage। এ' সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানী ড্রেভার বলেছেন[১৯],

> 'Preconscious used by psycho-analysis with reference to material which though at the moment unconscious, is available, and ready to become conscious ; also topographically of a region, as it were, in the mind, intermediate between consciousness and the unconscious, as such.

এর পরেও কথা আছে। এখান থেকে ও গভীরতর স্তরের অস্তিত্বের টের পেয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলেন, এ' স্তরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। অথচ সমুদ্রগর্ভে ভাসমান বিরাট হিমশৈলের অধিকাংশই যেমনি জলের তলায় থাকে, তেমনি চেতনারও অন্ধকার, গভীরতম, অনেকদূর বিস্তৃত তল আছে। তা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। এবং ঐভাবে থেকেই মানুষের সমগ্র চেতন জীবনকে প্রভাবিত করছে অলক্ষ্যে থেকে। শুধু তাই নয় পরিচালিত করছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এই তলেই লুকিয়ে রয়েছে সমগ্র

১৯ Drever : *Dictionary of Psychology*, p. 215.

ক্তিত্বের চাবিকাঠি। এই আদিম আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের স্তরকে ফ্রয়েড নাম য়েছেন unconscious stage বা অচেতন স্তর।

ই স্তরের অস্তিত্ব সচরাচর ধরা পড়ে না। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই স্তর দ চেতনার গভীরতম প্রদেশ হয় তাহলে এই স্তরকে অচেতন বলা হবে কেন? রীরতত্ত্ব অনুসৃত মনোবিজ্ঞানে বলে মৃত্যুতেই ব্যক্তি-চেতনার অবসান ঘটে। তএব এই স্তরের নাম মগ্ন-চৈতন্য বললে বোধ হয় ভাল হয়। আমাদের জৈব কৃতির মূল অবিকৃত শক্তি—Id ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে Ego এবং uper-Ego তে মার্জিত ও পরিমার্জিত হয়েছে একথা ফ্রয়েড পন্থীরা বলেন। d অন্ধ কামপ্রবৃত্তি, সে নির্লজ্জভাবে আত্মতৃপ্তি খোঁজে। কিন্তু বাধা দেয় স্তব জগৎ, বাধা দেয় সভ্যজীবনের সমাজ বুদ্ধি। তাই এই তৃপ্তির পথে বাধা াসে। এই শাসনের ফলে অসামাজিক অসভ্য আকাঙ্ক্ষাগুলি আলোকিত তন জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে, অন্ধকার অবচেতনায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু াদের অবলুপ্তি ঘটে না। তারা অন্ধকার কক্ষে শৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকে। গ্ন-চৈতন্যের স্তর থেকে মাঝে মাঝে জোর করে ধাক্কা দিয়ে চেতন জীবনকে ভাবিত করতে চেষ্টা করে। অথচ ফ্রয়েড বলেন, মানুষের বিবেক তার মগ্ন-চতন্য থেকেই উদ্ভূত। যাকে আমরা বিচার-বুদ্ধি চালিত বিশ্বাস ব'লে মনে রি তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জৈব-আকাঙ্ক্ষা পূরণের অন্য রূপ। এ 'সম্বন্ধে রিস ফোর্ড সম্পাদিত 'দি মডার্ণ এজ'[২০] গ্রন্থে আছে'

> 'Rooted in a theory of biological instincts, Freud's view of the developing psychic placed a great emphasis on the power of the unconscious to affect conduct; intellectual convictions seemed to be rationalisations of emotional needs'.

অভেদানন্দ চৈতন্যের চার ধরণের বিকাশের কথা বলেছেন। একটি হ'লো অবচেতন (Subconscious), চেতন (Conscious), পরচেতন (Super-Conscious) ও ব্রহ্মচেতন (Godconscious)। ফ্রয়েডের সংগে স্বামী অভেদানন্দের পার্থক্য হচ্ছে এই, ফ্রয়েড অবচেতন স্তরকে পঙ্কিল ক'রে তুলেছেন. তিনি বলেছেন এই স্তর কাম-প্রবৃত্তির কেন্দ্র। সেকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আর অভেদানন্দ বলেন, এটি হলো সৃষ্টি-রূপিনী

২০ Boris Ford (Ed): *The Modern Age*, p. 19.

বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি। ফ্রয়েড়-শিষ্য ডাঃ ইয়ুং অনেকটা অভেদানন্দের মত বললেও অবচেতন স্তরে দিব্যশক্তির কেন্দ্র বিরাজিত সেকথা বলাবাহুল্য বলেন নি। স্বামী অভেদানন্দ পরচেতন জ্ঞান বা অবস্থাকে কখনো কখনো ব্রহ্মচেতনের সঙ্গে সমান এমন কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়,

'He was in a trance-like condition, in superconscious state, and he was communing with God then.'

একথা অনস্বীকার্য যে পরচেতন জ্ঞান বা অবস্থাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দও এই দুটিকে এক বলেন নি। স্বামী অভেদানন্দ 'গড্-কন্সাস্-নেসের' গড্ বলতে ব্রহ্মকেই বুঝিয়েছেন, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বলেন নি।

'অবচেতন' জ্ঞানকে ফ্রয়েড অচৈতন্যের পর্যায়ে ফেললেও মোটেই তা নয়। এই স্তর জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছার অফুরন্ত ভাণ্ডার। অভেদানন্দ এই স্তর সম্বন্ধে বলেছেন, 'It is the vast field', আবার একস্থানে মন্তব্য করেছেন, 'this subconscious realm is a vast realm'। স্বামী বিবেকানন্দ একে বলেছেন 'great boundless occan of subjective mind।' শ্রীঅরবিন্দ এই স্তরকেই বলেছেন সুপারমাইণ্ড।

Desire, wish, will ইংরেজীর এই তিনটি শব্দকেই আমরা বাংলায় 'ইচ্ছা' বলে থাকি। বলাবাহুল্য তিনটি এক নয়। 'Desire' কথাটির মধ্যে বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষণিক মোহ বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় না। এর মধ্যে সমগ্র ব্যক্তিত্বের যোগ আছে। তাতে বিচার বিবেচনার পরিচালনা আছে। তাহলে 'wish' বলতে কি বুঝবো? বিচার বিবেচনার দ্বারা যে 'ইচ্ছা'কে গ্রহণযোগ্য মনে করি তাকে 'wish' বলা যেতে পারে। এজন্যেই Mackenzie বলেছেন, 'a wish is an effective desire'। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিচার-বুদ্ধি অনুসারে যাকে ভাল মনে ক'রে 'ইচ্ছা' (wish) করছি তা অনেকটা বাস্তব-নিরপেক্ষ। এ কারণেই এমন হতে পারে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে ঐ 'ইচ্ছাকে' কার্যকর না করাতেও পারি। ম্যাকেঞ্জি বলেছেন,[২১]

'Wish is often of an abstract character, without reference to the accompanying circumstance'.

'Will' শব্দটির মধ্যে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা আছে। কোন কাজে অনেক বাধাবিপত্তি

২১ Mackenzie : A *Manual of Ethics*, p. 40.

াছে জেনেও যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই তা করবার জন্যে তখন তা 'will'। অর্থাৎ কবলমাত্র কল্পনা করেই ক্ষান্ত হই নি, বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে সচেষ্ট। লাভ না হলেও যে মানসিক অবস্থা এই উদ্যমের পেছনে ক্রিয়া করছে তাকে will' বলা যেতে পারে। ম্যাকডুগাল 'will' শব্দের ছোট্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন মনিভাবে—'character in action'[২২]।

এর সংগে স্বামী অভেদানন্দের বক্তব্য মিলিয়ে নিলেই বিষয়টি পরিষ্কার বে। আগে এ' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অভেদানন্দ বলেছেন,

'Will is another name for desire or *vasana*.'

তাই তাঁর মতে 'will'কে 'desire' থেকে পৃথক করা যায় না। তিনি বলেন desire', 'will' এর চেয়ে অনেক বড়ো কথা। তাঁর ভাষায়,[২৩]

'Will is a force that operates externally, and desire is the positive pole of all mental actions, and has always connection with pleasure. We do not desire anything that gives pain.'

Will' শব্দে যে ইচ্ছা প্রকাশ পায় তা দৃঢ়তা মাখানো আগেই বলেছি। অভেদানন্দ বলেন এই ইচ্ছা হলো এক শক্তি। তা বাইরে থেকে কাজ করে। বাসনা' (desire) হ'লো মানসিক ক্রিয়ার সুমেরু আর তার সংগে সর্বদাই জড়িত থাকে আনন্দ। আমরা এমন কিছুই কামনা করি না যা দুঃখ দেয়। থাটি সত্য, কিন্তু 'will' (ইচ্ছা)-এর মধ্যে সর্বদাই কি বেদনার সংমিশ্রণ কে? হতে পারে বাসনা আনন্দদায়ক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় কিন্তু সেই বাসনাকে বতী করবার জন্যে কি একান্তভাবে প্রয়োজনীয় নয় দৃঢ় সংকল্পের? এবং াসনা যে সব সময়তেই অপরের অহিতসাধন করবে না এমন নিশ্চিন্ততা কোথায়?

'Will'কে চেষ্টিত ক্রিয়া বলা যেতে পারে। তবে তার পেছনে জটিল নসিক অবস্থা ক্রিয়াশীল। কোন চেষ্টিত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবার আগে থাকবে ান অভাব বোধজনিত অস্বস্তি এবং যা পেলে সেই অবস্থার পরিবর্তন হতে ারে তার সম্বন্ধে ধারণা। তা পাবার জন্যে বাস্তব আকাঙ্ক্ষা। বিভিন্ন কাঙ্ক্ষার মধ্যে সংঘর্ষ বা প্রতিযোগিতা, **প্রতিজ্ঞা ও বাস্তব কর্মোদ্যম**। Vill' হ'লো ব্যক্তি চরিত্রের দ্যোতক।

[২২] Mcdougall : *Outline of Psychology* p. 442.

[২৩] *True Psychology*, 7th New Edn. p. 107.

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বলা হয় desire হচ্ছে কোন অভাবজনিত অস্বস্তিক বা বেদনাদায়ক অবস্থা দূর করবার জন্যে কোন দ্রব্য বা অবস্থান্তরের জন্য তী আকাঙ্ক্ষা। মনোবিজ্ঞানী সালী (Sully) বলেছেন,[২৪]

'a desire...is a striving towards the fruition or realizatio of the object. It is a longing or striving towards actio and therefore the incipient phase of activity.'

মানুষের সত্তা (individuality) এবং ব্যক্তিত্ব (personality) নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ' দুটি শব্দে আমরা প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি। উভয়েরই মূলে আছে আত্ম প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা। আমাদের সকলের মধ্যে দুটি সত্তা বা ব্যক্তিত্বে পরিচয় পাই। একটি হ'লো 'আমি', অপরটি 'আমাকে'। এই দু সত্তা মানুষের ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে তোলে। 'আমাকে' বলতে কোন একটা বি যা আমি জানি এবং 'আমি' হচ্ছে একটি জিনিস যা 'আমাকে' জানে। কাজে 'আমাকে' ও 'আমি' বাস্তবিকপক্ষে আংশিক বিষয় ও বিষয়ী। এই বিষয় বিষয়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে ব্যক্তিত্বের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হ'লো মানু চেহারা, স্বাস্থ্য, কথা বলার ভঙ্গি, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষ, গুণ সব মিলিয়ে ত ব্যক্তিত্ব, তার বিশেষত্ব। আর কোন মানুষের মধ্যে ঠিক ঠিক এ জিনিস আর পাওয়া যায় না। 'ব্যক্তিত্ব' বলতে যদি মনে করি কেবলমাত্র দোষ, গু শক্তি, সম্ভাবনার সমষ্টিমাত্র তাহলে ভুল করবো। এর মধ্যে আছে এ অখণ্ডতা। তার মধ্যে রয়েছে এক জীবন্ত ঐক্য[২৫]। এ সম্বন্ধে অলপো (Allport) এর মন্তব্য উদ্ধৃতির যোগ্য। তিনি বলেছেন[২৬],

'Personality is the dynamic organisation within the indi dual, of those psychological systems, that determine l unique adjustment to his environment.'

তিনি বলেন, 'ব্যক্তিত্ব' হ'লো ব্যক্তির সক্রিয় জীবন্ত মানসিক ঐক্য। '

২৪ Sully : *Outlines of Psychology*, p. 389.

২৫ N. L. Munn : *Psychology*, p. 455.

২৬ 'Personality'—*A Psychological Interpretation*, p. 48.

সাহায্যে তার পরিবেশের সংগে তার 'বিশেষ' খাপ খাওয়ানো সম্ভব। অলপোর্ট একথা আরো সংক্ষিপ্ত ভাবে বলেছেন, মানুষের ব্যক্তিত্ব হ'লো মানুষ যা তাই[২৭]। অভেদানন্দ বলেছেন, বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, স্বজন পরিজন এঁরা সকলেই এক একজন আমাদের ব্যক্তিত্বের অংশ বিশেষ। সমাজের দিক থেকে প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানও ব্যক্তিত্বের অংশ বলে বিবেচিত। ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকও আছে। আমাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য, বুদ্ধি শক্তি, নৈতিক গুণ, চরিত্র, অধ্যাত্মভাব, ভগবান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণাই আমাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বকে গ'ড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বেরও পরিবর্তন সম্ভব এবং তা প্রতিমুহূর্তেই ঘটছে। দেহের পক্ষেও তাই। তিনি বলেছেন দেহের তো বটেই, মস্তিষ্কের বিকাশও আজ যেভাবে আছে, দশবছর বাদে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে একই কথা।

ব্যক্তিত্বকে সংবেদন, চিন্তা এবং ভাবের সমষ্টি বলা যেতে পারে। এই সমষ্টিকে অনেক জলস্রোতের মত মনে করা যায়। এই ধারা চিরপরিবর্তনশীল অথচ এই পরিবর্তনের পশ্চাতে যে একটি অপরিবর্তনীয় বস্তু আছে যার মর্যাদা মনোবিজ্ঞান এখনও সঠিকভাবে দিতে পারে নি। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী এই সংবেদন, চিন্তা ও ভাবধারকেই মানুষের আত্মা ব'লে মনে করেন। এঁরা আবার মননকারী ও মনন, দ্রষ্টা ও দৃষ্টিকে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন। অস্তিত্ব (existence) ও তার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নিয়ে স্বামী অভেদানন্দ গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। বিভিন্ন অবস্থা বা বিজ্ঞান সততই পরিবর্তনশীল কিন্তু অস্তিত্বের বিকার নেই এবং সত্তার রূপ অভিন্ন। অভেদানন্দ অস্তিত্বকে একারণে আত্মা বা ব্রহ্মের সংগে তুলনা করেছেন। সত্যিকারের অস্তিত্ব বা সত্তা কোন আপেক্ষিকতা ও সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না। তা স্বাধীন নিরপেক্ষ এবং শাশ্বত। তবে একথাও সত্য যে দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে তার বিকাশ চিরকালই বিচিত্র এবং আপেক্ষিক, এইহেতু অনিত্য।

২৭ 'Personality is what a man really is.'—Allport : (*Personality*)

আট

॥ অতীত স্মৃতিচারণে অভেদানন্দ ঃ ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা ॥

দীর্ঘকাল বৃটিশ-শাসণের নিষ্পেষণে থেকে ভারতীযদের মনেও বোধহয এমনি ধারণা জন্মেছিল, ভারত বৃটিশ সূর্যের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বিমুক্ত হযেছে। বছবের পর বছর ধরে ইংরেজ এ কথাই প্রচার করে এসেছে। আজও তার রেশ রযেছে সমগ্র বিশ্বে। যেহেতু আমাদের অতীত কর্মতালিকার কথা প্রকাশ কিংবা সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে নিজেদেব এই শোচনীয আত্মিক ও পার্থিব অধঃপতন থেকে উত্থিত করবার বীর্যমযী চেতনার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেছে। শুধু পদলেহন, পরনির্ভরশীলতার নিবীর্যতার আমবা নিমজ্জিত। বিদেশীবা ভেবেছিল পরাধীন, অবজ্ঞাত প্রাচ্যজাতিকে 'প্রাণ' দিযেছে তাবা। এদেশেব প্রাচীন সভ্যতার, সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পবিত্রতাকে তারা কোনদিনই স্বীকার করতে চায নি। হযতো মুষ্টিমেয় 'বডো ইংরেজ' করেছেন, কিন্তু তাঁদের বক্তব্যকেও মেনে নেয নি মদান্ধ ইংবেজ। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্যেব বদ্ধমূল ধারণায কবেছেন কুঠারাঘাত। তাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তাঁরা হযেছিলেন সোচ্চাব। তাঁদের তথ্য ও প্রমাণেব সামনে দাঁডাতে পারেনি সেদিনকার বিদেশী সমাজ। লাঞ্ছিত ভারতকে সম্মান জানাতে বাধ্য হযেছিল তারা। স্বামী বিবেকানন্দেব মতবাদ আলোচনা করেছি এক গ্রন্থে।[১]

আমেরিকার ব্রুকলিন ইন্স্টিটিউটে (Brooklyn Institute of Art and Science) স্বামী অভেদানন্দ তাঁর তেজোদৃপ্ত দুটি বক্তৃতায তুলে ধরেছিলেন প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, দর্শন, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয বিদেশীদের সামনে। বক্তৃতার পূর্বাভাষে তিনি বলেছিলেন,

'My main object has been to give an impartial account of the fact from the standpoint of unbiased historian, an

১ ডঃ অমিয়কুমাব মজুমদার: 'বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা' (রূপা), ১৩৭৪,পৃ ১৩৬-
(বিবেকানন্দের নৃতাত্ত্বিক মতবাদ দ্র

to remove all *misunderstandings* which prevail among the Americans concerning India and her people.[১]

ভারতের গৌরব এবং বৈশিষ্ট্য সপ্রমাণ করার জন্যে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি আমেরিকাবাসীদের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ভারতের সব-কিছুর সুস্পষ্ট প্রমাণ পঞ্জীর নজিরে পাশ্চাত্যের হীন ও বিসদৃশ ধারণা মোচন করা। অভেদানন্দ বলেছেন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাইরে থেকে আসেনি, ভারতবর্ষ হলো বিশ্বসভ্যতার আদিভূমি। প্রাচীন কাল্দিয়া, ফিনিসিয়া, মেসোপটেমিয়া, বাবিলোন বা পারস্যবাসীদের বহু আগে ভারতের অধিবাসীরাই যথার্থভাবে বিশ্বরহস্যের কারণ অনুসন্ধান করতে পেরেছিলেন।

মাটির নীচে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবার আগে ভারতের ইতিহাস একদল আদিম অধিবাসী নিয়ে শুরু হয়। তাদের গায়ের রঙ ছিল কালো, চুল কোঁকড়ানো, নাক চ্যাপ্টা ও শরীর বেঁটে। এদের পরাজিত ক'রে আবার একদল কটাচুল, কটাচোখের শ্বেতকায় অশ্বারোহী মানুষ সিন্ধু উপত্যকায় বাস করতে আরম্ভ করে। দু'দলের মধ্যে অবিশ্রান্ত কলহ ও সংগ্রামের পর একদিন শান্তির সূচনা হয়।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তুপ খননের পর থেকে বিদেশীয় ঐতিহাসিকদের এদেশ সম্বন্ধে মত-পরিবর্তনের সূচনা আরম্ভ হয়। আরিয়ানদের (আর্য) ভারতে আসার কয়েক হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকায় কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন সুসভ্য জাতি বাস করতো তার হদিস পাওয়া গেল। ***India & Her People*** গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'Prehistoric Indus Civilization' নিবন্ধে[২] দেখি আর্যরা প্রকৃতপক্ষে ২০০০-১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ভারতে আসে এবং সিন্ধু উপত্যকার ঐ সব আদিম অধিবাসীদের হয় দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে না হয় সমূলে উচ্ছেদ ক'রে শস্য শ্যামলা সিন্ধু-উপত্যকায় বাস করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজস্ব কোনরকম সভ্যতা ছিল না। তারা যে দেশে যেত, সেই দেশের সভ্যতাকেই গ্রহণ করতো। সেই প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতার রচনা যারা করেছিল তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তারা যে আর্য নয় এ বিষয়ে কারো মতভেদ নেই।

---

২ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত

তাহলে এরা কারা? স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা পণ্ডিতপ্রবর বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নর-করোটি পরীক্ষা ক'রে বলেন যে, সিন্ধু উপত্যকায় ভূমধ্যসাগরীয় লোকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। কাজেই আর্যভাষাভাষী লোকেরা যে সিন্ধু সভ্যতায় ছিল না একথা বলা চলে না। ডক্টর দত্ত বলেছেন, অন্যান্য বিচিত্র জাতির লোকের সঙ্গে আর্য ভাষাভাষী লোকেরও অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সীমান্ত নগরী, সেইহেতু এখানে বিভিন্ন জাতীয় লোকের সমাবেশ হওয়া স্বাভাবিক। ডক্টর দত্ত সিন্ধু-উপত্যকার নাগরিকদের শব-সৎকার-প্রথারও আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই নগরীসমূহের অধিবাসীরা তিনটি বিভিন্ন প্রথায় শব-সৎকার করতো।

এক, সম্পূর্ণ সমাধি, দুই,-অর্ধদগ্ধ ক'রে সমাধি, তিন,-দগ্ধ ক'রে সমাধি। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঋগ্বেদ, শতপথব্রাহ্মণ, অথর্ববেদ, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র প্রভৃতি থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে বলেছেন এই তিন রকম প্রথা বৈদিক আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি এক স্থানে বলেছেন,[৩]

'In going through the Vedic literature we find principally two modes of the disposal of the dead : Anagnidagdha (without cremation) and Agnidagdha (with cremation). As regards the former one it was the custom of complete burial that was in vouge in Rigvedic period (RV X. 18. 11). In the Brahmana period of the Vedic age the same custom was in practice, we find reference of each in Satapatha Brahmana (B. 8. 1-9).'

নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ্দের অনেকে মনে করেন সিন্ধু সভ্যতায় বৈদিক প্রভাব সুস্পষ্ট। অনেকে এই সভ্যতাকে দ্রাবিড় সভ্যতা বলতে চান।[৪]

যারা দ্রাবিড়দের সভ্যতা বলে মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতাকে প্রমাণ করতে চান,

৩ Forward to *The Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus*, vol. p. XXVI

৪ 'The Social Status of the Indian People' (*India and Her People*, New Edn. p. 89-

তাঁরা ভুলে যান যে, দ্রাবিড়েরা বিশ্বামিত্রের বংশসম্ভূত। তাদের আর এক নাম 'দস্যু'। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে ও মনুসংহিতায় এদের উল্লেখ আছে। তাছাড়া 'দ্রবদিড়ম্ সাম' গান যাঁরা করতেন, তাঁরাই কালক্রমে 'দ্রাবিড়ম্' হয়েছেন বলে অনুমান করা যায়। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ্র আবার 'পণি' বা বৈদিক 'অসুর'কে অবৈদিক জাতি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে 'পণি'-রা বৈদিক সমাজেরই লোক। 'পণি'-রাই সমাজের বৈশ্যশ্রেণী এবং তারাই বর্তমানে 'বণিক্' নামে পরিচিত। 'পণি'-র 'প' স্থানে 'ব' আদেশ হয়ে 'বণিক্' হয়েছে। এখনও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় পণ্য 'পণ', 'আপণ্', 'আপণিক', 'বিপণি' ও 'কার্ষাপণ' প্রভৃতি শব্দ 'পণি' ও 'বণিক' শব্দ দুটির একত্ব প্রমাণ করছে।

'প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা'-সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সেখানকার টাউন-প্ল্যানিং বা শহর-পরিকল্পনার এক সুন্দর ছবি উপস্থিত করেন। তৎকালীন কলা, ধর্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, লিপি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা ক'রে তুলে ধরেছিলেন বিদেশীদের সামনে।

তবে ভারতের সমাজ ও জাতি-সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ নিষ্ঠাবান সমাজ-বিজ্ঞানী ও নিপুণ নৃতত্ত্ববিদের মত বর্ণনা দিয়েছেন। ভারতীয় আর্যরা মানুষের ধর্মবিশ্বাস ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সেই কোন তমসাচ্ছন্ন অতীত কাল থেকেই তাঁরা প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতের উপর সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। ভারতের সমগ্র ইতিহাসে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর হিন্দুদের কোন নির্যাতন বা অত্যাচারের বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। একথা সত্য যে, মুসলমান ও খৃস্টানেরা হিন্দুদের ঘৃণা করে থাকেন, তথাপি হিন্দুরা তাঁদের প্রতি কোনরকম শত্রুভাব পোষণ করেন না। ধর্মবিষয়ে উদারতা থাকলেও সামাজিক ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ বর্তমান। অভেদানন্দ বলেন, বহু শতাব্দী ধ'রে বিদেশীদের আক্রমণ, উপদ্রব ও লুণ্ঠন ইত্যাদির ফলে হিন্দুদের সামাজিক ব্যাপারে এই রক্ষণশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। ৩২৫ খৃস্টপূর্বাব্দে প্রথম গ্রীকজাতি ভারত আক্রমণ করে, তারপর একে একে শক, মঙ্গোল, তাতার, মুসলমান, হূণ, এবং শেষে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতি ভারতকে বারবার আক্রমণ করে। শক্তিশালী বৈদেশিক জাতিরা মহাপ্রচণ্ডবেগে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার ধনসম্পদ কতবার লুণ্ঠন করেছে, আর্যজাতির কীর্তি-

কলাপ—নানা মন্দির, মঠ, রাজপ্রাসাদ, জনপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস ক'রে ভারতকে বিপর্যস্ত করেছে। এই বৈদেশিকরা দস্যু-তস্করের মতো ভারতে এসেছে, কোন বিষয়ে হিন্দুদের সাহায্য করবার কথা মনেই করেনি, বরং যথাসর্স্ব লুঠ ক'রে নেবার পাশবিক উল্লাসে প্রমত্ত ছিল। তারপরে দীর্ঘদিন ধ'রে চলে মোগলদের শাসন। হিন্দু সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবার জন্যে মোগল বাদশাহের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না—ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এই দুর্যোগের ভিতর দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে হিন্দুরা তাঁদের সামাজিক বিধিনিষেধ কঠোর করেছিলেন। তা না হলে অবিশ্রান্ত বৈদেশিক আক্রমণ তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। যেমনি অবস্থা হয়েছিল মিশরীয় ও পারসীকদের। তারা বৈদেশিক আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি, ফলে কালক্রমে তারা বিলুপ্তপ্রায়। সংকটের সময় রক্ষণশীলতা হিন্দুদের বাঁচিয়ে রাখেনি শুধু, আর্যশোণিত ও আর্য সাহিত্যের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পেরেছে। জগতের কাছে এটি নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয় বিষয়।

এ' সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মর্মস্পর্শী ভাষায় নিজেদের বক্তব্য রেখে-ছিলেন। হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধের কঠোরতাকে সমর্থন ক'রে বিদেশীদের সামনে যে ভাষায় বলেছিলেন তা ছিল তীক্ষ্ণ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে। উপরন্তু তাঁর ভাষা 'সাহিত্য' হয়ে উঠেছিল। তাঁর বক্তৃতার এই অংশ তুলে ধরছি :

'No foreign power can demolish the social structure of the Hindus. It has stood for ages firm like the gigantic peaks of the Himalayas, defying the strength of all hostile forces, because its foundation was laid—not upon the quick sand of commercialism, not upon the quagmire of greed for territorial possessions, but upon the solid rock of the moral and spiritual laws which eternally govern earthly existence. The ancient founders of Hindu society were not like the robber-barons or ambitious political leaders of mediaeval Europe; but they were sages and Seers of Truth, who sacrificed their personal interest, their ambition and desire for

power and position upon the altar of disinterested love for humanity.

The Hindus of modern times trace their descent from these great sages, saints and Rishis of prehistoric ages, and consider themselves blessed on account of such exalted lineage. They glory in the names of their forefathers, and feel an unconquerable pride because of the purity, unselfishness, spirituality, and God-consciousness of their holy ancestors. This noble pride has prevented the members of different communities from holding free intercourse and from intermarrying with foreigners and invading nations, and has thus kept the Aryan blood pure and unadulterated. If they had not possessed that tremendous national pride and had mixed freely with all people by whom they were over run, we should not find in India to-day the full-blooded descendants of the pure Aryan family.

এই রক্ষণশীলতা আছে দেখেই কোন বৈদেশিক শক্তি হিন্দুর সমাজ-সৌধকে আজও ধ্বংস করতে পারে নি। হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখরমালার মতো হিন্দু-সমাজ বৈদেশিক শত্রুদের আক্রমণ বার বার অগ্রাহ্য করেছে এবং যুগ-যুগান্তর থেকে আজও অচল অটল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তার কারণ, হিন্দুসমাজের ভিত্তি বাণিজ্যিক অস্থায়ী চোরাবালির স্তূপের উপর অথবা সাম্রাজ্যলিপ্সার জলাভূমির উপর স্থাপন করা হয় নি। তারপর, একথাও সত্য যে, হিন্দু সমাজের আদি প্রতিষ্ঠাতাগণ মধ্যযুগের পরস্ব লুণ্ঠনকারী ইয়োরোপীয় ব্যারনদের মতো অথবা পরদেশ-লোলুপ পাশ্চাত্য রাজনৈতিক নেতাদের মতো ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। বিশ্বপ্রেমের বেদীমূলে ব্যক্তিগত স্বার্থ, উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যাবতীয় বাসনা তাঁরা বলি দিয়েছিলেন। ভারতের বর্তমান হিন্দুরা সেই সুদূর প্রাচীন যুগের এই মহাপ্রাণ মুনিঋষিদের বংশ বলে নিজেদের ধন্য মনে করেন এবং তাঁদের নামে পরিচিত হতে গৌরব বোধ করেন। সেই ধর্মাত্মা পূর্বপুরুষদের পবিত্রতা,

স্বার্থহীনতা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ঈশ্বরোপলব্ধি প্রকৃতই হিন্দুদের অসীম গৌরব ও গর্বের কারণ। এই জাতীয় গৌরব বোধই অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের প্রথা রুখে দিয়ে হিন্দুদের পবিত্র আর্য রক্ত কলুষিত হতে দেয় নি। হিন্দুরা যদি বাস্তবিকই নিজেদের এই জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে সচেতন না থাকতেন বা সামাজিক ব্যাপারে বৈদেশিকদের সঙ্গে অবাধে মিশে যেতেন তাহলে পবিত্র আর্যকুলের বিশুদ্ধ রক্ত-গঠিত তাঁদের বংশধরদের অস্তিত্ব আজ বর্তমান ভারত থেকে নিঃসন্দেহে লুপ্ত হ'তো।

হিন্দুসমাজ অনেক ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায় আবার অনেক গোষ্ঠী ও শাখা সম্প্রদায়ে গঠিত। সব গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই আচার ও ব্যবহারের বিভিন্নতা আছে। অনেক পরিবার, কুল বা বংশের সমষ্টি নিয়ে এই গোষ্ঠী। অভেদানন্দ বলেন হিন্দু সমাজের এই গোষ্ঠী বা শাখা সম্প্রদায়গুলি সংস্কৃত ভাষায় 'গোত্র' নামে পরিচিত। এর মূল অং হ'লো বংশ। যে কোন এক পূর্বপুরুষের সব বংশধর একই সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে গোত্রের অধিপতি বা গোত্রের স্রষ্টা প্রায় চব্বিশজন ঋষি ছিলেন। তাঁরা সকলেই বৈদিক যুগের দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ তাঁদের কাছ থেকেই এসেছিল বৈদিক মন্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ। তাঁরা যেমন জনসমাজের নেতা, তেমনি ছিলেন গোষ্ঠীপতি। আমরা সকলেই এই সব মহান ঋষির বংশধর।

অভেদানন্দ বলেছেন, হিন্দুদের সামাজিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নেই মর্যাদার ক্ষেত্রে। সকলেই সমান। এবং প্রত্যেকটি সম্প্রদায় যেন এক একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। হিন্দু সমাজ নীতির উদ্দেশ্য গোত্র বা গোষ্ঠীগুলিকে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা ক'রে তাদের মধ্যেকার লোকদের আর্যরক্ত যথা সম্ভব বিশুদ্ধ ও অব্যাহত রেখে প্রতিটি নরনারীকে উচ্চপর্যায়ের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শে জীবন যাপন করানো।

ভারতের সমস্ত জাতি আবার বৃহত্তর একটি শ্রেণীর অংশ বা বিভাগ ইংরেজীতে তাকে বলা হয় caste। অভেদানন্দ বলেছেন,[৫]

'The word 'caste' has become most mischievous and mis-leading, and the less we use it the better we shall be able to

[৫] *India and Her People*, 7th New Edn, p. 101.

understand the social conditions of the people of ancient and modern India.'

[এই caste শব্দটিই ভারতের একটি অনিষ্টের কারণ এবং ভ্রমাত্মক। এই শব্দটিকে যত কম ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল। আর তাহলেই আমরা প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দুদের সামাজিক অবস্থা ভাল ক'রে বুঝতে পারবো।]

অভেদানন্দ তাঁর বক্তৃতায় প্রাঞ্জল ক'রে বুঝিয়েছেন 'caste' শব্দের ব্যুৎপত্তি। তিনি বলেছেন এই শব্দটি পর্তুগীজ 'casta' শব্দের রূপান্তর। এর মানে 'জন্মগত শ্রেণী'। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বর্বর পর্তুগীজ নাবিকেরা ভারতে এসে এখানকার সমাজের কতগুলি শ্রেণী সম্বন্ধে এই শব্দটি ব্যবহার করতে থাকে। সে সময় এই শব্দের অর্থ ছিল 'পবিত্র ও অবিমিশ্ররক্ত সম্পন্ন বংশ'। তবে সংস্কৃতে এই শব্দের কোন প্রতিরূপ নেই। তিনি একথাও বলেছেন caste বলতে যা বোঝায় এমন কোন ভাবদ্যোতক শব্দ বেদ, মনুসংহিতা এমন কি কোন পুরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। পরবর্তী অধ্যায় caste শব্দের দ্বারা সংস্কৃতের 'বর্ণ' শব্দকে বোঝানো হ'তো। ক্রমে বর্ণগত পার্থক্য থেকে আর্যদের মধ্যে জাতি বিভাগের উৎপত্তি। ভগবদ্গীতায় দেখা যায় গুণ ও কর্ম অনুসারে মানুষজাতিকে চার বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। আর্যদের মধ্যে যাঁদের গায়ের রঙ সাদা, তাঁরা হলেন 'ব্রাহ্মণ', যাঁদের রক্তবর্ণ বা লোহিত তাঁরা ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ যাঁদের তাঁরা বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ যাঁরা তাঁরা শূদ্র। স্বভাবজাত গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদের কর্মবিভাগ আছে সে কথা আমরা সকলেই কমবেশি জানি।

গীতার ১৮।৪১-৪৫ শ্লোকে এই বিভাগ সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা আছে। কৌতূহলী পাঠকদের সামনে তা তুলে ধরছি।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥
কৃষি গৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্বকর্ম স্বভাবজম্।

পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥

হিন্দুসমাজে এই শ্রমবিভাগ খুব সম্ভবতঃ বৈদিকযুগে বা তার আগে থেকে শুরু হয়েছিল। বেদে এর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে শ্রেণী পরিবর্ত চলতো। যেমন, কোন ব্রাহ্মণ যোদ্ধার কাজও করতেন। আবার ক্ষত্রিয়দে অনেকে ব্রাহ্মণদের ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়েছেন এমন ঘটনার বহু উল্লে আছে। অভেদানন্দ বলেন ভারতবর্ষের যে সব দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি তার অধিকাংশই ক্ষত্রিয়দের অবদান— ব্রাহ্মণদের নয়। সেইকালে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা অবাধে পরস্পর মেলামে করতেন। ক্ষত্রিয় প্রকৃতির গুণ বা নৈপুণ্য দেখালে তিনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণোচি গুণপণা দেখালে তিনি ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত হতেন। স্বামী অভেদান এখানে একটি বিশেষ মন্তব্য করেছেন যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছে ভারতে আবির্ভূত ঈশ্বরাবতারের মধ্যে বেশী সংখ্যকই ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ-বংশজা অবতারদের সংখ্যা অল্প।

জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতে অন্যরকম বর্ণনা আছে। শান্তি পর্বের ১৮৮-১৮৯ অধ্যায়ে ভরদ্বাজ মুনি মহর্ষি ভৃগুকে প্রশ্ন করছেন,

চাতুর্বর্ণস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ ॥
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে ॥
স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং সশোণিতম্
তনুঃ ক্ষরতি সর্বেষাং কস্মাদ্বর্ণো বিভজ্যতে।
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৮৮ অধ্যায়।

'যদি চারটে জাতির বিভাগ শুধু বর্ণের পার্থক্য থেকে উদ্ভূত হয় তাহলে প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবার নানা বর্ণের লোক দেখা যায় কেন? কাম, ক্রোধ ভয়, লোভ, শোক, উদ্বেগ, ক্ষুধা, এবং ক্লান্তি সকলেরই উপর প্রভাব বি

ক'রে থাকে, তাহলে জাতি বিভাগের সার্থকতা কোথায়? স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদির মধ্যেও অসংখ্য শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যেই বা জাতি-বিভাগ কেমন ক'রে হ'তে পারে?'

এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজ ঋষিকে বলেছিলেন, ৫ জাতিবিভাগ বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তখন সকলেই ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ছিল। পরে কর্মের পার্থক্যের জন্য জাতির উৎপত্তি হয়েছে মানুষের মধ্যে। যে সব দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ ভোগ বাসনার তৃপ্তি সাধনে রত হলেন, যাঁরা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ ও নির্ভয়ে উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্প, স্বধর্মত্যাগী ও যাদের চামড়ার রং লাল তাঁরাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হলেন। যে সব, ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ গোজাতির সেবা অবলম্বন করেছেন ও কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন, যাঁদের দেহবর্ণ পীত, স্বধর্মচ্যুত তাঁরাই বৈশ্য উপাধি পেয়েছেন। যে সব দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হিংসাপরায়ণ; লোভী, মিথ্যাবাদী, সর্বপ্রকার শ্রমসাধ্য কর্ম করে, অর্থাৎ যাদের কোন নির্দিষ্ট জীবিকা নেই, যারা শুচিহীন ও কৃষ্ণকায় তারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এই সব কর্মের পার্থক্য থেকেই জাতিভেদের উৎপত্তি। অভেদানন্দ বলেন বৈদিকযুগে ভারতীয় আর্যরা নিজেদের গায়ের রঙ্ এবং কর্ম অনুসারে এই চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে মানুষের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উন্নত বা অবনত হওয়ার এই উদার নীতি ক্রমশঃ বংশগত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লো।

৫ ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতঃ।
গোভ্যোঃ বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণা শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৮৮ অধ্যায় ১০-১৪

যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় দু'শো বছর আগে এ প্রথার সৃষ্টি হয়। এই সময়ে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি জাতিভেদ ও সামাজিক ভেদনীতির প্রথাকে তীব্র কষাঘাত ক'রে গেছেন। বুদ্ধ পুরোহিত-প্রথা ও অনুদার অযৌক্তিক সামাজিক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করলেন। ফলে বংশগত জাতিভেদের সাহায্যে একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের কুপ্রথা লোপ পেল। বুদ্ধের তথা বৌদ্ধযুগের আগে ব্রাহ্মণের ছেলে অবশ্যই ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী, ক্ষত্রিয়ের ছেলে অবশ্যই যোদ্ধার কাজ করবে। এই প্রথা প্রথমে প্রত্যেক প্রকার কার্য-বিভাগের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্যেই প্রবর্তিত হয়েছিল। অভেদানন্দ বলেন, 'প্রাচীন মনীষী ও সমাজপতিরা বংশগত গুণানুবৃত্তির তত্ত্ব (law of heredity) এমন সুন্দরভাবে বুঝতেন যে, তাঁরা বংশানুক্রমিক সংক্রমণের দ্বারা সর্বোচ্চ গুণগুলির বিকাশ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। যাহোক বুদ্ধদেব হিন্দুদের সমাজকে আবার সেই আগেকার নমনীয় উদারভাবে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন।

বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণত্ব বর্তায় না একথা বুদ্ধদেব বলতেন। তিনি যে কোন বংশের কোন ব্যক্তির মধ্যে সংযম, পবিত্রতা, জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা, প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণ দেখলেই তিনি ঐ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করতেন। যে লোক শান্ত স্বভাব, সংযত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, ভক্তিমান, সর্বজীবে দয়াশীল ও দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন, তিনিই বুদ্ধদেবের কাছে ব্রাহ্মণের মর্যাদা লাভ করতেন :

> যসস্ কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং।
> সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং ॥
> ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো ॥
> যম্হি সচ্চং চ ধম্মো চ সো সুখী চ ব্রাহ্মণো ॥'

—ধম্মপদ, ২৬ অধ্যায়, ব্রাহ্মণবগ্গো, ৯, ১১

অর্থাৎ যাঁর কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা কৃত পাপ নেই, যিনি এই ত্রিবি স্থানে সংযত, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলবো। জটা গোত্র অথবা জাতি দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যাঁর মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিরাজিত তিনিই সুখী এব তিনিই ব্রাহ্মণ।

প্রায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গ্লানির ফলে বৌদ্ধধর্ম নানাধরণের বিকৃতি

অবিচার দেখা দিতে শুরু করে। এই সুযোগে অনুদার মতাবলম্বী গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা আবার বংশগত জাতিভেদ প্রথাকে সমাজে চালাতে আরম্ভ করলেন। এর পর মুসলমানের ভারত আক্রমণ ও বিজয়। প্রায় দু'শো বছর ধরে মুসলমানেরা নানাধরণের বলপ্রয়োগ, নির্যাতন করে হিন্দুদের সমাজসৌধকে ভেঙে ফেলতে লাগলো।

প্রাচীন ভারতের সমাজতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে একই বংশে বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তি থাকত। উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ঋগ্বেদে (৯।১১২।৩) ব্রাহ্মণ ঋষি বামদেবের (ঋষি শিশুর) কথা বলছি। বামদেব ঋষি বলেছেন, 'দেখ, আমি স্তোত্রকার, আমার পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যবভর্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিতেছি।' ঋক্‌সংহিতা ৯।১১২।১ মন্ত্রেও একই ধরণের কথা বলা হয়েছে। 'হে সোম, সকল ব্যক্তির কার্য এক প্রকার নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। আমাদিগেরও কার্য নানাবিধ। দেখ, তক্ষক (ছুতার) কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য লোকের রোগ প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞ কর্তাকে চাহে।' এ' থেকে বোঝা যায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ঋগ্বৈদিক যুগেও বর্তমান ছিল। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদের অভিমত এই যে, জাতি বা বর্ণবিভাগ তখনও সমাজে ঠিক ঠিক হয়নি, বিভিন্ন কর্ম বা ব্যবসায় মাত্রেই বিভাগ ছিল। পরে এই ব্যবসায় ও কর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে জাতি ও বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল।

হিন্দু-সমাজে অনুদারতা প্রবল হওয়াতে বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও অনৈক্য বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কুসংস্কার ও ভেদনীতি লৌহপ্রাচীর দিয়ে এক সম্প্রদায়কে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কশূন্য ক'রে রাখার প্রচেষ্টা আজ নিন্দিত। যাতে সমাজের প্রতিটি লোক বর্ণ, জাতি গোত্র বা সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীতে র আবদ্ধ না থেকে নিজেদের ভারতীয় আর্যজাতির এক অখণ্ড পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব'লে মনে করতে পারে তার জন্যে প্রচেষ্টা চলেছে অনেকদিন ধরে। অভেদানন্দ এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন, 'এই সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে বটে, কিন্তু সমাজকে সমস্ত সংকীর্ণভাব থেকে মুক্ত ক'রে সাফল্যলাভ করতে এখনও দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ'।

অভেদানন্দ বলেছেন, আজকের ভারতবাসীরা একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি

করেছে যে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত পুরোহিতপ্রথা থেকে ব্রাহ্মণ্য যুগে ভারতবর্ষ যথেষ্ট দুর্গতি ভোগ করেছে, তারা আর নতুন ক'রে অন্য কোন দুর্গতি ভোগ করতে চায় না। বর্তমান দিনে হিন্দু ভারতবাসী চায় সমাজের পুনর্গঠন, পুনরুজ্জীবন। মুসলমানদের মত খৃষ্টানরাও হিন্দু-সমাজরূপ সমুদ্রে অকল্যাণকর ভাবরাশি ঢেলে দেওয়াতে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এখন সেখানে আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার-কার্যের তরঙ্গ উঠছে। আধুনিক হিন্দুদের সমাজে পরিবর্তনশীলতায় প্রচণ্ড ঝড় দেখা দিয়েছে। এখন এমন এক অবস্থা এসে পড়েছে যে, পাশ্চাত্য জাতিদের যা কিছু গ্রহণীয় ও হিতকর সেই সমস্তকে হিন্দুদের নিজস্ব ক'রে ফেলতে হবে এবং নিজেদের উদার বিশ্বজনীন ভাবের উপর ভিত্তি স্থাপন ক'রে সমাজকে আবার গড়তে হবে। অভেদানন্দের মতে বেদান্ত এই কাজে সাহায্য করতে পারবে। তিনি বলেন,

'হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান অথবা ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল যে কোন জাতিই হউক না কেন, মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব নিহিত রহিয়াছে—জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বেদান্ত এই আদর্শই শিক্ষা দেয়। ইহাই হিন্দুর বর্তমান সামাজিক দোষ, ত্রুটি ও অন্য সমস্ত অহিতকে দূর করিবে ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির একতার ভিত্তি বেদান্তের এই সার্বভৌমিক নীতির দ্বারাই সুদৃঢ় হইবে। তাহার ফলেই সমগ্র জগতের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে হিন্দু জাতি আপনার—সভ্যতা বিস্তার করিয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবে এবং পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে।'[৬]

৬ ভারতীয় সংস্কৃতি (৩য় সং) পৃ ১২৩

নয়

॥ বিজ্ঞান-পরিবেষনে স্বামী অভেদানন্দ ॥

এক : জ্যোতির্বিজ্ঞান

াক সন্ধ্যায় স্বামী অভেদানন্দ বক্তৃতা দিয়েছিলেন গ্রহ ও তার প্রভাব সম্পর্কে। ক্তৃতার বিষয় 'Planets aud Planetary Influence.'১। এই বক্তৃতায় বামীজীর জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান প্রত্যক্ষ ক'রে বিস্মিত হয়েছিলেন বজ্ঞান শিক্ষিত আমেরিকাবাসী। সূচনায় তিনি বলেছিলেন : 'আজ সন্ধ্যায় মামরা গ্রহ সমূহ ও পার্থিব জীবনের উপর তাদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা রবো'। এই গ্রহসমূহ যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের সৌরমণ্ডল াদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। ভিতরের ও বাইরের। অর্থাৎ আমি লতে চাই সূর্যকে যদি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্ররূপে ধরা হয়, তাহলে আমাদের ৃথিবী কেন্দ্র থেকে তিন নম্বর গ্রহ। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে দুটি গ্রহ আছে াবং বাকী সব পৃথিবীর বাইরের দিকে। যে অনুশাসনের বলে সৃষ্টি হয়েছে ৃথিবী, সেই নিয়মেই জন্ম নিয়েছে অন্যান্য গ্রহ যারা সকলেই ঐ প্রকাণ্ড চুম্বক ূপী সূর্যের চারপাশে ঘোরে। সূর্যকে সৌরমণ্ডলের জনক বলা যেতে পারে জনক সূর্য সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং অন্যান্য গ্রহ সকল, আমাদের ৃথিবী সমেত, এই জনকের সন্তানের ন্যায় একই পরিবারভুক্ত।

'সর্বসমেত আটটি গ্রহ আছে। এবং আরো আছে কয়েক শত ক্ষুদ্রাকার গ্রহ (প্ল্যানেটয়েড)—এরা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। বস্তুতপক্ষে এরা সকলেই (জড়গ্রহ সমেত) ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী ভাবে চলতে থাকে।

'আটটি গ্রহকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—একটিকে বলা হয় নিম্নতর শ্রেণী (বা Inferior group)—যেমন বুধ, শুক্র। এদের কক্ষপথ পৃথিবীর

১ এ বক্তৃতাংশ "A Study of Heliocentric Science"-গ্রন্থের। তিনি আমেরিকার বিদ্বদ্ সমাজে জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাঁচটি বক্তৃতা দিয়ে ছিলেন। এটি তারই অংশ। সমগ্র বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছে।

কক্ষপথের আওতার মধ্যে। আর উচ্চতর শ্রেণীদের যেমন মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো[২] এবং অন্যান্য অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথের এলাকার বাইরে নিজস্ব আবর্তন পথ রচনা ক'রে আছে।'

স্বামী অভেদানন্দ এর পরে বুধ ও সূর্যের মাঝখানে এক বা একাধিক গ্রহের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। তৎকালে এই ধরণের চিন্তাধারা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তিনি বলেছেন, 'বুধ ও সূর্যের মধ্যস্থলে এক বা অধিক গ্রহ থাকতে পারে। কিন্তু তারা আমাদের অজ্ঞাত। বহু পর্যবেক্ষক শ্রম সহকারে আন্ত-বুধ গ্রহ আবিষ্কারে সচেষ্টিত এবং অনেকে এরই মধ্যে তার নাম রেখেছেন ভলকান। কিন্তু এ সবই আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষা রাখে'। স্বামী অভেদানন্দের এই বক্তৃতার মূল পাণ্ডুলিপিকে তাঁর নিজহাতে লেখা এই মন্তব্যটি আছে—

'Between Mercury and the sun may exist one or more planets, but they are unknown to us. Various observers are diligently engaged in watching to discover intra-mercurial planet and some have already given its name Vulcan. But it remains to be discovered'.

যদি সত্যিই তেমন কোন গ্রহ থেকে থাকে তাহলে তা সূর্যের অতি সন্নিকটে। হয়ত সূর্যের প্রখর আলোকের জন্য তা দেখা হয় না। অভেদানন্দের ভাষায়, 'The dazzling light of the sun makes it invisible.' কিন্তু এই গ্রহ আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা এর অস্তিত্বে আস্থাশীল নন[৩]।

২ স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতাকালীন সময়ে প্লুটোর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় নি। অভেদানন্দের ব্যাখ্যা অনুসারে প্লুটো গ্রহ ও উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত। সেইহেতু এটির নামও দেওয়া হলো। সর্বসমেত ন'টি গ্রহের নাম জানা গেছে। —লেখক

৩ 'The name Vulcan was assigned, in advance of its discovery, to a planet that was for a time believed to be located in an orbit very close to the sun.

'During the nineteenth century a good deal of excitement was caused from time to time when claims to have seen vulcan in transit across the sun's disk
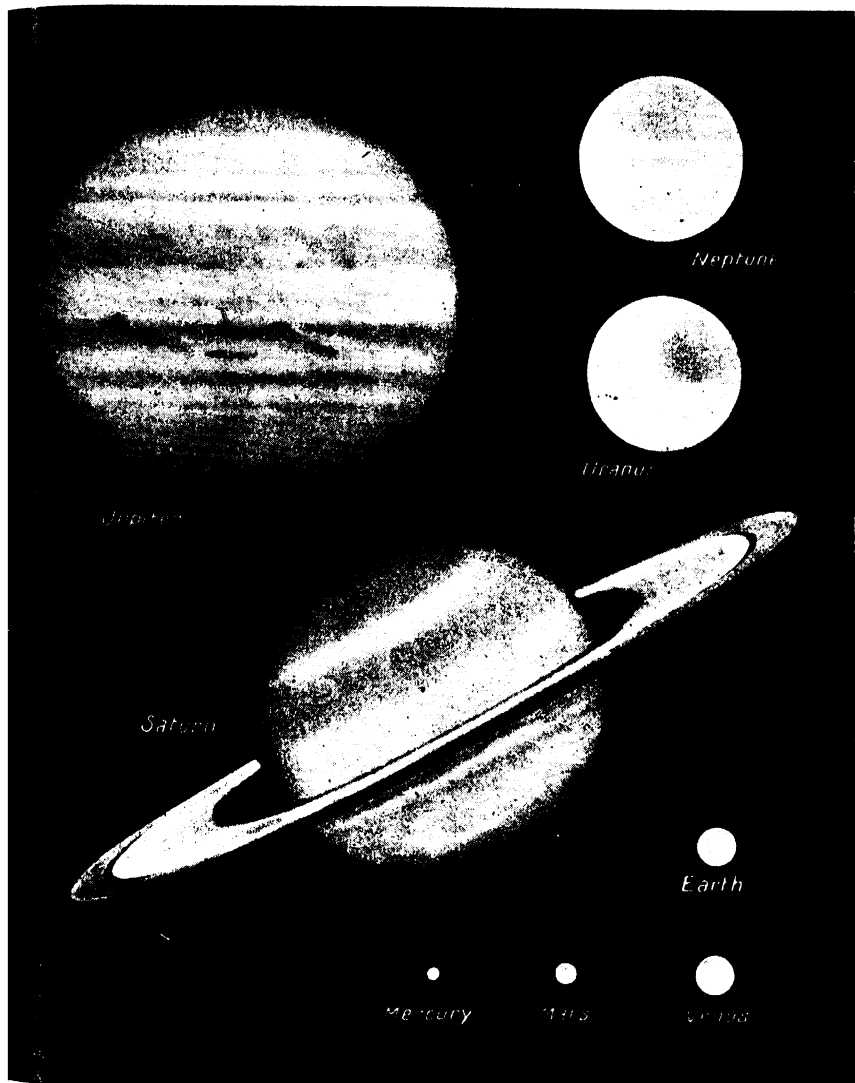
Jupiter, Neptune, Uranus, Saturn, Earth, Mercury, Mars and Venus.

Photo taken from Larousse Encyclopaedia of Astronomy.

বুধ গ্রহের পরেই শুক্রের স্থান। ইংরেজী নাম 'ভেনাস'। সৌন্দর্যের রাণী। কখনও কখনও তার আলো এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে প্রকাশ্য দিবালোকে খালি চোখে তাকে দেখা যায়। কথিত আছে সম্রাট নেপোলিয়ন যখন ইটালী বিজয় ক'রে লাক্সেমবুর্গ প্রাসাদে ফিরে এলেন তখন তাঁর প্রধান অমাত্যরা আগে থেকেই দেশবাসীকে সম্বর্ধনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু জনতা তাতে কান দেয় নি। তারা প্রাসাদের উপরে আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এদিকে নেপোলিয়নের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে তিনি স্বভাবতঃই প্রশ্ন করেছিলেন জনতার দৃষ্টি তাঁর দিকে নয় কেন? পরে নেপোলিয়ন নিজেই দেখলেন বেলা দ্বিপ্রহরে আকাশ জুড়ে যেন শুক্র গ্রহ শোভা পাচ্ছে। যেন তাঁর বিজয়বার্তা ঘোষণা করবার জন্যেই। স্বামী অভেদানন্দ বলেন—

'The most ancient observation of Venus was in the Babylonian record in 685 B. C. It was known in India in Vedic age.'

এমনিভাবে স্বামী অভেদানন্দ প্রতিটি গ্রহের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেছেন জ্যোতির্বিদের মতো। তিনি নেপচুন পর্যন্ত বলেছেন তখন। যেহেতু তখন নেপচুন সৌরমণ্ডলীর শেষ গ্রহ রূপে বিবেচিত হতো, তিনিও সেইভাবে বলেছেন। তিনি আরো নিবিড়ভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন,[৪]

were made. None of them was ever verified and the search has been abandoned for a long time. The belief in the planet's existence arose owing to the motion of the perihelion of Mercury, which it was felt could be explained by the perturbing effect of another planet so close to the sun that would be observed only in transit. It seems quite certain that claims to have seen it were the result of wrongly identifying very small round sun spots—or even due to instrumental or optical defects'.—*Dictionary of Astronomy*, by Temy Maloney, Arco publ, London, 1964, p. 189.

৪ 'Each planet is revolving day after day, night after night, year after year, and performing its duty; and the sun is like the greatest magnet that is holding each of these planets within its power. And each of these planets again is a magnet itself. It is produced by the great magnet, and at the

'প্রতিটি গ্রহ দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ধ'রে ঘুরছে। এমনিভাবে কেটে যাচ্ছে বছর। এবং তারা তাদের কর্তব্য পালন ক'রে চলেছে। সূর্য একটি বৃহৎ চুম্বকের মতো যার ফলে সে প্রতিটি গ্রহকে ধ'রে রাখতে চাইছে। অবিশ্যি নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী। এবং এই প্রতিটি গ্রহ আবার একটি একটি চুম্বক। এরা বিশাল চুম্বকের সৃষ্টি এবং একই সঙ্গে নিজেরাও স্বয়ং সম্পূর্ণ চুম্বক। ঠিক যেমন আমরা একখণ্ড ধাতু, লোহা বা ইস্পাত যা-ই হোক না কেন, চুম্বকের সামনে ধরলে কিছুক্ষণ বাদে সেটিও চৌম্বকাবস্থা প্রাপ্ত হবে এবং অচিরেই চুম্বক হয়ে যায়। নীহারিকা তত্ত্ব থেকে জানতে পারি এই গ্রহসমূহ এক সাধারণ কেন্দ্র থেকে নীহারিকার অংশরূপেই বিচ্যুত হয়েছিল। অথবা আমরা বলতে পারি এই সমগ্র সৌরজগৎ তার সমস্ত পরিসর সমেত নীহারিকার অংশবিশেষ ছিল। পরে সেখান থেকে এক কেন্দ্রবস্তুকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তার পরে আর একটিকে। পরে আরও একটি। এমনিভাবে এই সব গ্রহের সৃষ্টি। ক্রমবিবর্তনের ফলে বর্তমানের পর্যায়ে আসতে এদের নিশ্চয় কোটি কোটি বছর লেগেছিল। এখন যদি আমরা জ্যোতির্বিদ্যা পড়ি, তাহলে আমাদের যে প্রাচীন কুসংস্কার আছে সমগ্র বিশ্ব মাত্র ছ'দিনে সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত হবে'।

ঐ বক্তৃতাতেই অভেদানন্দ বলেন, প্রতিটি গ্রহ একটি চুম্বক। তাদের অঙ্গ থেকে তড়িৎ-চৌম্বকীয় প্রবাহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক যেমনি সূর্য তার

same time it has become a magnet. Just as, when we hold a piece of metal, iron or steel, close to the magnet for some time it will be magnetised, and it will become a magnet. So according to our nebular hypothesis, these planets were thrown off as portions of the nebulous matter from the common center; or we may say that this whole solar system with this distance was a mass of nebulons matter and then it threw off a nucleus there, then another nucleus; while it was gyrating. Another was thrown of, and in this way these planets were formed. In the process of evolution it must have taken millions and millions of years. Now if we study astronomy your old superstition that the whole world was created, in six days will disappear'.—Vide *A Study of Heliocentnc Science.*

দহ থেকে চারদিকে কিরণ ছড়িয়ে দেয় এবং সূর্য থেকে তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ রপাশে অগ্রসর হতে থাকে। কাজেই প্রতিটি গ্রহের আছে গতিবেগ এবং র্যের চারদিকে আবর্তিত হবার সময় তারা দেশের (space) অভ্যন্তরে ইথার-মুদ্রকে আন্দোলিত করে। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ শূন্য বলতে কিছু নেই। ন্যস্থান যাকে বলি তা ইথারে পরিপূর্ণ। তাহলে এই ইথার কি? এর উত্তরে বামী অভেদানন্দ বলেন।[৫]

'যাকে আমরা শূন্যস্থান বলি তা চটচটে অবিভাজ্য এবং ইস্পাতের থেকেও ক্ত এক পদার্থ দিয়ে ভর্তি—তা হ'লো 'ইথার'। এ ছাড়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তি াজ করতে পারে না'।

'যখন এই গ্রহসমূহ ইথারের মধ্য দিয়ে যায় তখন তারা ইথারের সমুদ্রকে থিত ক'রে তোলে এবং সমুদ্রে তরঙ্গ তোলে, ছোট ছোট ঢেউ উঠে। সেগুলি র্বত্র ধাক্কা দেয়। কাজেই যখন বুধ গ্রহ দ্রুত বেগে চলতে থাকে, স্বভাবতঃই থার সমুদ্রে তরঙ্গ উঠবে এবং তা সূর্যের গায়ে গিয়ে ধাক্কা দেবে। সূর্যের হের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তারা আবার প্রতিফলিত হয়ে নিজ নিজ গ্রহে ফিরে াসে। এই ধারা চলতে থাকে। এই সব কেন্দ্র থেকে আগত চৌম্বক তরঙ্গ র্যকেও প্রভাবিত করে এবং একই সঙ্গে সূর্যও এই সব কেন্দ্রগুলিকে প্রভাবিত করছে তাদেরকে আকর্ষণী ক্ষমতার সাহায্যে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঁধে রেখে। নিউটন বলেন, প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে এই আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান। নিউটনের 'আকর্ষণের সূত্র' থেকে জানতে পারি যে বিশ্বের প্রতিটি ণা প্রতি কণাকে আকর্ষণ করছে। এবং এই বল ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সামানু-পাতিক এবং দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতিক। অতএব, যদি বস্তুর প্রতিটি কণা অপর কণাকে আকর্ষণ করে, তাহলে প্রতিটি পরমাণুর আকর্ষণও বিকর্ষণ শক্তি আছে—একদিকে আকর্ষণী ক্ষমতা, অপরদিকে বিকর্ষণী শক্তি। ই দিক দিয়ে এটি চুম্বকের মতো।[৬]

---

৫ 'The so called empty space is filled with a gelatenous indivisible ubstance, more solid than steel, which is called ether without which the orce of gravity could not work'. Vide *A Study of Heliocentric Science.*

'And when these planets are going through this ether, they are hurning this ocean of ether and producing vibrations in that ocean, and

অভেদানন্দ একের পর বৈজ্ঞানিক যুক্তি দাঁড় করাতে লাগলেন সেই বক্তৃতায়। তিনি বলছেন: 'প্রতিটি পরমাণু একটি চুম্বক। তাহলে যদি প্রতিটি পরমাণু চুম্বকের মতো হয় তবে এই সব পরমাণুর সমবায়ে অবশ্যই একটি বৃহদাকারের চুম্বকের সৃষ্টি হবে। এই পৃথিবী এক বিশাল চুম্বক। তাহলে এই পৃথিবীর উপরে যাবতীয় বস্তু চুম্বক বিশেষ। মানবদেহ একটি চুম্বক, যেহেতু তা গঠিত হয়েছে অণু-পরমাণু-র সাহায্যে এবং প্রতিটি পরমাণু বা অণু একটি চুম্বক। অতএব বিজ্ঞান আমাদের বলে যে সৌরমণ্ডলের প্রত্যেক বস্তু একটি চুম্বক এবং তার আকর্ষণী শক্তি আছে। তার আকর্ষণ আছে, বিকর্ষণ আছে। এইটে হচ্ছে কার্য এবং প্রক্রিয়া। এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। প্রত্যেকেই অপরকে আকর্ষণ করছে। যেমনিভাবে অন্য সব বস্তু চৌম্বকশক্তি লাভ করে, ঠিক তেমনি ভাবে আমরাও চৌম্বকিত হই'। একটি উদাহরণের সাহায্য নিয়ে অভেদানন্দ তাঁর বক্তব্যকে প্রাঞ্জল ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

'মনে করা যাক এই ইথার সমুদ্রে একটি পরমাণু এক বিশেষ গতিবেগে কাঁপছে। তাহলে ইথারের মধ্যেকার বস্তুর অন্যান্য কণিকাগুলিও আন্দোলিত হবে এবং এই কম্পনশীল তরঙ্গ সৌরজগতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বাধাহীনভাবে চলবে এবং এই তরঙ্গ প্রবাহের মধ্যে যা কিছু উপস্থিত হবে সকলেই ঐ তরঙ্গের আঘাত পাবে। যেমন, সমুদ্রের মধ্যে একখণ্ড পাথর ছুঁড়লে

generating waves and ripples that are striking every where. So when Mercury is revoling......it is churning that ocean of ether and those vibrations are striking the sun, and from the sun they are reflected back again to all these planets. And this process is going on. The sun is influenced by the magnetic currents coming from these centers, and at the same time the sun is influencing these centers, holding them together by the power of attraction. Now the power of attraction, according to Newtons law, is in every atom Newtons law of attraction tells us that every particle of matter in the universe attracts every other particle, directly as the mass and inversely according to the square of its distance. So if each particle of matter attracts other particle, and each atom has both attraction and repulsion, attraction at one end and repulsion at the other end. It is like a magnet in that respect.'—Vide *A Study of Heliocentric Science.*

সেখানে বৃত্ত তৈরী হবে, ছোট ছোট ঢেউ উঠবে এবং তরঙ্গ ক্রমে স্ফীত ও স্ফীততর হতে থাকবে। কোন বাধা না পেলে এই ঊর্মিমালা অনন্তকাল ধরে স্ফীত হতে থাকবে। কেবলমাত্র বাধা সৃষ্টির জন্যেই এর গতিবেগ রুদ্ধ হয়, ফলে তাপ উদ্ভূত হয় এবং অন্যান্য বাহ্য-ব্যাপার-সংক্রান্ত পরিবর্তন দেখা যায়।

যদি সব গ্রহগুলি চুম্বক হয় এবং সমস্ত মানবদেহও চুম্বক হয় তাহলে তারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করবে। ইথার হ'লো এই আকর্ষণী বল চলাচলের মাধ্যম। ইথার হ'লো তারের মতো যার ভিতর দিয়ে এই চৌম্বক তরঙ্গ পরিক্রমা করে সূর্য থেকে নেপচুন, ইউরেনাসে, শনিতে এবং সকলকে তাদের নিজস্ব স্থানে ধ'রে রেখে সূর্যের চারপাশে আবর্তিত হ'তে বাধ্য করছে।

'প্রতিটি গ্রহের আর একটি বল আছে, তা হলো বিকর্ষণের। এর জন্যে গ্রহ এক সরলরেখায় বহু দূরে স'রে চলে গেছে। সূর্য নিজের দিকে গ্রহকে আকর্ষণ করছে আর গ্রহ দূরে সরে যেতে চাইছে। এরই ফলশ্রুতিতে সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহের আবর্তন ক্রিয়া সম্ভবপর হয়। এখানে স্বামী অভেদানন্দের মূল বক্তব্য তুলে ধরছি।[৭]

পৃথিবীর উপরে অন্যান্য গ্রহের প্রভাব পড়ে যেহেতু সেই সব গ্রহগুলির কম্পনরাশি অবশ্যই সূর্যে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসবে। এ' কারণেই

---

৭ ......Suppose in this ocean of ether one atom is vibrating at a certain rate, there would be the displacement......of other particles of matter in the ether, and that would become what is called vibration ; and this wave vibration will travel from one end of the solar system to the other without interruption and whatever will be in between will receive that current. Just as you throw a stone in the ocean, it will produce circles, ripples, and the waves will increase and increase and increase, and if there be no resistance, these ripples will go on increasing throughout eternity. Only on account of resistance its motion is obstructed, and it produces heat and other phenomenal changes.

'If all planets are magnets, all human beings are also magnets. They attract each other, as they are aggregates of atoms and moleules. Ether is the medium through which these forces travel. Ether is the wire through which this current travels, from the sun to Neptune to uranus, to saturn, and holding them in their places and making them revolve around the sun.

স্বামী অভেদানন্দ বলেন যে-সৌর, চৌম্বক-বিজ্ঞান আমাদের বলে যে চৌম্বক তরঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা গ্রহের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করবো। প্রতিটি গ্রহ অপর গ্রহকে প্রভাবিত করছে। প্রত্যেক গ্রহ সূর্যের উপরে তার প্রভাব বিস্তার করে এবং সূর্য আবার সেই প্রভাব অপরাপর গ্রহে ও সর্বদিকে ছড়িয়ে দেয়। এই প্রভাব গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যায়, কোন কিছুতেই তাকে রোধ করা যায় না। বিভিন্ন গ্রহ থেকে উৎসারিত চৌম্বকীয় প্রভাব আমাদের সাহায্য করে আবহাওয়ার পরিবর্তন, আমাদের মানসিক ও ভৌতিক অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে। শক্তির তরঙ্গসমূহ বল, সঞ্জীবনী শক্তি সৃষ্টিকারক এবং তা পৃথিবীতে প্রতিফলিত হয়। মনে করি নেপচুন সূর্য থেকে ২,৮০০,০০০,০০০ মাইল দূর থেকে তরঙ্গ পাঠাচ্ছে। যদি তা একবার ইথার সমুদ্রের মধ্যে চলা সুরু করে তাহলে তার গতিবেগ আর থামবে না, একেবারে সূর্যের গায়ে ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত। তারপরে তা ফিরে যাবে এবং গ্রহদের ধাক্কা দেবে। এইভাবে সব রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। তাপ এবং আলোক সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে প্রাণ অথবা প্রাণের সত্তা। স্বামী অভেদানন্দ বলেন, এই সব গ্রহ থেকে আগত চৌম্বক তরঙ্গ পৃথিবীকে প্রভাবিত করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে মানুষদেরও। এই বক্তৃতাতে তিনি মানবদেহের উপর গ্রহের প্রভাব সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

'The Sun and Solar Forces' বক্তৃতায় স্বামী অভেদানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ চর্চার ইতিবৃত্ত শোনান। এখানে তিনি বলেছেন৮ : 'সৌর চৌম্বকীয় বিদ্যা অন্যতম বিস্ময়কর বিজ্ঞান। এইটি

Each planet has another force, a repllant force, which makes it go off in a straight lime. The sun is pulling towards it and the planet is trying to get off, and the resultant is the planets' revolution around the sun'. Vide *A Study of Heliocentric Science.*

৮ '......Solar magnetic science is the most wonderful science. It is the future science. It takes in all planets and stars and constellations, everything that we see over our head and everything that exists in the universe. It is the most important science, and its origin has not been traced exactly, because it has been in the minds of all these great teachers of ancient times who understood the process of evolution and who realised that from one

'লো ভবিষ্যতের বিজ্ঞান। সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র এবং রাশিচক্র যা আমরা আমাদের াথার উপরে আকাশের চাঁদোয়ায় দেখতে পাচ্ছি সবই এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত :বে। তিনি সজোরে এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন এই বিজ্ঞান যাবতীয় জড় ৱজ্ঞানের জগতের এক বিপ্লব সূচনা করবে। তিনি বলেছেন গ্রহবিজ্ঞান ানুষের ভাগ্যগণনার বিজ্ঞান নয়, এটি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান, বরং বলা যেতে ারে ফলিত জ্যোতির্বিদ্যা'।

জ্যোতির্বিদ্যার নানা গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করেছেন স্বামী অভেদানন্দ। Ihe Earth and Its Relation to the Sun' শীর্ষক বক্তৃতায় সূর্য এবং াৃথিবীর সম্পর্ক বুঝিয়ে বলেছেন বিজ্ঞানীর মতো। তাঁর মতে কেপলারের ক্তব্য জোরালো এবং গ্রহণযোগ্য। 'নীহারিকা তত্ত্বে আমরা জানতে পারি যে াামাদের এই সৌরমণ্ডল আদিতে ছিল ঘূর্ণায়মান বস্তু পিণ্ড মাত্র। বলাবাহুল্য াটি ছিল গ্যাসে ভর্তি। এই ঘূর্ণায়মান "গ্যাসীয় বস্তু পিণ্ড" থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে গ্রহমণ্ডলীর। এই অবস্থায় আসতে লেগেছে াক্ষ কোটি বছর। এই ক্রমবিকাশের গতি একদিন রুদ্ধ হবে, তখন সূর্য তার াব তেজ হারিয়ে ফেলবে, সে মরে যাবে, সেই সঙ্গে সমাধি হবে গ্রহ মণ্ডলীর। পৃথিবী অচেতন পদার্থে পরিণত হবে। তা থেকে আবার সুরু হবে ভাঙন।

:ommon source everything has come, And after external phenomena, there hey discovered the law, and that law was explained again and again, but t has been forgotten for a long time. Now it has been revived again, but it ıas not been revived entirely. It is just the beginning. And this science will 'evolutionise all the materialistic sciences. I am giving you some idea of the scientific side of it. When you realise that these magnetic forces are influencing the plants, the vegetable and animal kingdom, and your whole life depends upon it, how important it is. It is not a science for fortune telling, but it is a science. You can study it just as you would study astronomy. It is nothing but applied astronomy on a scientific basis and this includes not only all the demonstrable truths that are to be found in astrology, but it also includes truths of phrenology, of physiognomy of eharacter reading ; all the occult and hidden forces that exists in nature are to be included in this science.'— Vide *A Study of Heliocentric Science.*

আবার সেই ঘননিবদ্ধ বস্তু পিণ্ড এবং এই অবস্থায় থাকবে লক্ষ লক্ষ বছর আবার সুরু হবে নতুন চক্রপথ। ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে সৃষ্টি হবে নতুন গ্রহের মালা। কাজেই আমরা লক্ষ্য করছি ঘননিবদ্ধ বস্তু পিণ্ডের মধ্যেই সব শক্তি লুকোন আছে। আজ পৃথিবী যে তড়িৎ-চৌম্বকীয় শক্তির খেলা দেখাচ্ছে তা সুপ্ত আছে ওখানেই। একদিকে উদ্বর্তন আবার অন্যদিকে অনুবর্তন। এমনি ভাবে চলছে ব্রহ্মাণ্ডের লীলা খেলা। এইটেই হলো প্রকৃতির চিরন্তন রীতি। অভেদানন্দ বলেন এর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই যদি তিনি প্রকৃতির বাইরেকার কেউ হন, যদি তাঁর দেহ প্রকৃতি নয়, তাহলে তিনি অবশ্যই শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না।'[৯] অতএব সৃষ্টিকর্তার অবস্থিতি নিঃসন্দেহে অসম্ভব ঘটনা।

আশ্চর্য হ'তে হয়, আজ থেকে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে এক হিন্দু সন্ন্যাসী এমনি ভাবে কুসংস্কার বিমুক্ত হয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। শুধু অর্দ্ধ শতাব্দী বলি কেন তারও অনেক আগে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের মতোই ছিলেন নিভীক, ছিলেন বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করবার সুকঠোর দায়িত্বে ব্রতী। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা মানুষকে সংস্কার বিমুক্ত করতে পারে না, তার জন্যে প্রয়োজন ঐ বিদ্যা বিশেষতঃ বিজ্ঞানকে নিজের দেহের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া, নিজের অনুভূতির জারকে বিজ্ঞানের 'সত্যপ্রীতির' এবং 'সত্য অনুসন্ধানের' প্রবৃত্তিকে জারিত ক'রে তাকে আত্মসাৎ করা, নিজের অঙ্গীভূত ক'রে ফেলা। স্বামী অভেদানন্দ এই দুরূহ কর্মে এক সিদ্ধ সাধক।

ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন-সম্পর্কে আলোচনা ক'রে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, যাঁদের বৈজ্ঞানিক মন তাঁরা উদ্বর্তন ও অনুবর্তন তত্ত্ব বিশ্বাস করবেন। অতএব আমরা যখন নীহারিকা তত্ত্বে এই গ্রহ, তথা সৌরমণ্ডলের সৃষ্টির কথা জানতে পারি, তখন আমরা উদ্বর্তন-অনুবর্তন তত্ত্বটিও বুঝতে পারি।

এক সময়ে এমন অবস্থা হবে যে পুঞ্জীভূত গ্যাসীয় বস্তু পিণ্ডে প্রচণ্ড উত্তাপ

৯ 'There is no need of a creator who dwells outside of nature and outside of the universe. He has nothing to do, because if he is not in nature, if nature is not His body, then He can not create anything out of nothing. It would be an impossibility...'.—Vide *A Study of Heliocentric Science.*

ক্ষত হবে, ফলে সমগ্র বস্তু পিণ্ডটিই হয়ে উঠবে প্রোজ্জ্বল (incandes cent)। রপরে তাপ ছড়িয়ে পড়বে 'দেশের' (space) মধ্যে এবং যে বস্তু পিণ্ড মাগত ঘুরছিল, বিকিরণের ফলে তা একসময় শীতল হবে। এমনি ভাবে তাব্দীর পর শতাব্দী থাকবার পর স্বয়ং আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে ঐ বস্তু পিণ্ডে ষ্টি হবে বিভিন্ন কেন্দ্রক। তাহলেও তার থাকবে এক মূল কেন্দ্র যা অন্য সব ন্দ্রগুলিকে আকর্ষণ ক'রে রাখতে পারবে। এমনিভাবে বর্ণনার পর বর্ণনা য়ে এগিয়ে চলেছেন বিজ্ঞান-দৃষ্টির অধিকারী স্বামী অভেদানন্দ। বক্তৃতার াষে তিনি বৈজ্ঞানিক পন্থায় বন্দনা করেছেন সূর্যের। এখানে তা তুলে রছি[১০]।

'সূর্যের আলো থেকে নানা জিনিসের সৃষ্টি হচ্ছে। এই আলোক তরঙ্গের ধ্যে রয়েছে চৌম্বক শক্তি। এই চৌম্বক শক্তি পৃথিবীকে দিচ্ছে আলো

১০ '.....It is tremendously hot when the sun shines ; extremely cold when (moon) is away from the sun. It has no atmosphere to retain the heat. here being no atmosphere, the diffusion of light is not possible in the moon. there were no diffusion of light, what would have happened on this earth there were no atmosphere ? In the daylight, when the sun is not shining ou would have to carry a lantern from one room to the other ; only you uld see where the sun is shining brightly ; everything else would be dark. nd this diffusion of light in the daytime in the rooms, this is caused by the mosphere which envelops the earth.

'Various other things are caused by the light currents that are coming onsantly from the sun. And these light waves contain magnetic powers, and iese magnetic powers are developing light and activity on earth, and for at reason we must always consider that the sun is the source of light and e, not only of this earth, but of all other planets, so as the earth is bowing wn to the sun, so the other planets are making the same salutation, and must try to see the spirit of the sun that is behind the disk, which is the mnipotent, omniseint lord of the universe, the soul of the solar system, and he starter of the evolution, the creator ; and He is our heavenly father. To im belongs all the glory and all the praise of each one of us'. Vide *A Study Heliocentric Science.*

এবং কর্মশক্তি। এ কারণেই আমাদের মেনে নিতে হবে আলোক এবং জীবনের উৎস হ'লো সূর্য। কেবলমাত্র আমাদের এই পৃথিবী গ্রহতেই নয়, তার প্রভাব অন্যান্য গ্রহেও একইভাবে। যেমনি পৃথিবী সূর্যের কাছে নতজানু হ'য়ে রয়েছে, তেমনি অপর সকলেও। তারা সবাই সূর্যকে অভিবাদন জানিয়ে চলেছে এবং আমরা অবশ্যই সচেষ্ট হবো সূর্যের দেহটার পেছনে তার আত্মাকে খুঁজতে, যাকে বলা যেতে পারে 'spirit of the sun'। তা হলো সর্বশক্তিমান। স্বামী অভেদানন্দ তাকে বলেছেন সর্বজ্ঞ বা ঈশ্বর। এই 'সর্বশক্তিমান' হচ্ছেন বিবর্তন ক্রিয়া চালু করবার মালিক। তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আমাদের জনক। আমরা জীবনে যে যশ ও প্রশংসা লাভ ক'রে থাকি, তার প্রকৃত প্রাপক তিনিই'।

একদিকে যেমন বিজ্ঞানে বিশ্বাস, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞানের পরিদৃশ্যমান জগতের ঊর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় জগতে এক সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ পরম সত্তার অস্তিত্বে দৃঢ় আস্থা। স্বামী অভেদানন্দ এই দুই অনুভূতিকে নিজের হৃদয়ে আপন ক'রে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক সুদীর্ঘ পথরেখার, যার সুরুতে বিজ্ঞানের জয়রথ চলেছে এবং অন্তিমে রয়েছে বিশ্বসত্তার মৃদঙ্গধ্বনি। বিজ্ঞানের বিশ্বাসকে আলাদা ক'রে রাখেন নি, একই পথরেখার যেন অংশ মাত্র। পরমসত্তায় বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের সত্যকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন সমবিন্দুতে।

দুই : অধ্যাত্ম চিকিৎসা

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়েও স্বামী অভেদানন্দ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন Science of the Psychic Phenomena' গ্রন্থটিতে 'মন ও বিকাশ' 'প্রাণ নিরাময় শক্তি', 'আকর্ষ চিকিৎসা', 'মানসিক চিকিৎসা বিজ্ঞান', 'অধ্যাত্ম চিকিৎসা', 'পূর্ণস্বাস্থ্য বিজ্ঞান' ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর পর্যালোচনার ইতিবৃত্ত সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রাণ ও নিরাময় শক্তি প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, যে শক্তি দ্বারা কোন প্রাণী তার পরিবেশের সঙ্গে নিজের জীবনগতিকে মিলিয়ে নিতে পারে সে-শক্তি শুধুমাত্র রাসায়নিক সংযোগ বা যান্ত্রিক নয়, তাকে বলা যেতে পারে

সেখানেই দেখা যায় পরিবেশ বা পরিবেশ-নিয়ন্ত্রী নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার একটি সহজ স্বচ্ছন্দ আবেগ। তিনি বলেন জীবনী শক্তি যদি প্রচুর থাকে তাহলে আমাদের দেহের ভিতরকার যন্ত্রপাতিগুলি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্য, পানীয় ও চর্ম-রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে প্রবিষ্ট বীজাণুগুলিকে ধ্বংস ক'রে দেবে। এই সব রোগ-বীজাণুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে বা হটিয়ে দিতে জীবনী-শক্তি বা প্রাণোচ্ছ্বাস। যেখানেই ঘটেছে এই জীবনী শক্তির প্রকাশ গেলে চাই জীবনশক্তির প্রাচুর্য। তাহলেই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা বা স্বাস্থ্য ফিরে আসবে। দেহের জীবকোষগুলি যদি পারিপার্শ্বিক বিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয় তাহলে শরীরে কোন রকম রোগ হতে পারে না।

প্রাণশক্তিকে যদি উপযুক্ত অনুকূল অবস্থায় রাখা যায় তাহলে কোন রোগ হ'তে পারে না একথা বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ। আবার যদি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি ক'রে তার লীলাক্ষেত্রকে খণ্ডিত ও সংকীর্ণ ক'রে তোলা যায় তাহলেও এই প্রাণবীর্য সেই বাধা বিপত্তিকে সরিয়ে চলতে চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টার জন্য উদ্ভব হয় বেদনার, যন্ত্রণার। যদি শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করতে না পারে অথবা স্বাভাবিক কর্মশক্তি ফিরে না আসে তাহলে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় এবং শরীরের যন্ত্রগুলিকে বিকল ও অসাড় ক'রে তোলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতি আমাদের কিছু পরিমাণ নিরাময়কারী শক্তি দিয়েছে। এই শক্তি প্রতিটি জীবসত্তার মধ্যেই বর্তমান। এই শক্তি কারো বা অবাধ, আবার কারো বা সামান্য। স্বাস্থ্যবান শিশুর দেহে প্রচুর প্রাণ শক্তি আছে। তার যদি কোন অঙ্গ আহত হয় বা কোন হাড় ভেঙে যায় তাহলে যত শীঘ্র সারবে, একজন বয়স্ক লোকের তত তাড়াতাড়ি সারবে না, যেহেতু শেষোক্ত জনের জীবনীশক্তির অনেক অপচয় বা ক্ষয় ঘটেছে। যোগশাস্ত্রে প্রকৃতির এই নিরাময়কারী শক্তিকে 'প্রাণ' বলা হয়েছে।

স্বামী অভেদানন্দ বলেন, মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রগুলিই প্রাণ-শক্তির ভাণ্ডার। সেখানেই ঐ শক্তি উৎপন্ন ও সঞ্চিত হয়। এই প্রাণশক্তিকে যিনি যত বেশী সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারবেন, তিনিই তত বেশী শারীরিক ও মানসিক শক্তি লাভ করবেন। যাঁর মধ্যে প্রাণশক্তি বা প্রাণবায়ু প্রচুর আছে, তাঁর স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি এবং বলবীর্যও তেমনি। তিনি ইচ্ছে করলে তা অপর কাউকে

দিতে পারেন। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : 'একেই বলে আকর্ষণী চিকিৎসা বা 'ম্যাগনেটিক্ হিলিঙ্' এর সিদ্ধমন্ত্র'।

স্নায়ু ও স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়ে এই শক্তির প্রকাশ হ'য়ে থাকে। অতএব পরিমণ্ডল থেকে দেহের ভিতর ঐ প্রাণশক্তিকে আহরণ বা আকর্ষণ বা নিজস্ব ক'রে নেবার হদিস যদি আয়ত্ত করতে পারা যায় ও তাকে সঞ্চয় ক'রে রাখা যায় তাহলে প্রয়োজনের সময়মত তাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু আমাদের ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে বাতাস যাতায়াত করে তা-ই প্রাণশক্তিকে ধারণ ক'রে রেখেছে।

ন্যাস এবং প্রাণায়ামের সাহায্যে যে শক্তির বিকাশ হয় অল্প সময়ের মধ্যেই তার বিস্ময়কর ফল পাওয়া যায়। প্রাণ শক্তি সৃজন এবং সঞ্চয় করার প্রণালী যাঁরা জানেন তাঁরাই পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের অধিকারী।

'অধ্যাত্মচিকিৎসা' প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : 'প্রাণ ও শক্তির সান্নিধ্যে এলে ও মহাচৈতন্যের স্তরে প্রবেশ করলে জীবাত্মার মধ্যে আধ্যাত্মিক নিরাময় শক্তির বিকাশ হয়'। আত্মা তখন দেশ ও কালের সীমানা পেরিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত বিরাট ভূমার সঙ্গে নিজের ঐক্য অনুভব করে। তখন সর্বশক্তিমানের দিব্য শক্তি জীবাত্মার মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং 'ইন্দ্রিয়বোধের স্তরে বিস্ময়কর অনাসয়শক্তি প্রকাশ পেতে থাকে'।

মনে রাখতে হবে যে, যে এই আত্মা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মায়া, জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্ত। উপনিষদে আছে,

'তে আত্মা সর্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্কস্য সর্বান্তরো যোঽশনা বা পিপাসে শোকম্ মোহম্ জরাম্ মৃত্যুমত্যেতি। এতম্ বৈ তমাত্মানম্ বিদিত্বা'…।
(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৫।১)

আমিই তো তিনি, 'সোঽহম্'—একথা যিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর আবার অন্য ইচ্ছা করবার কিছু নেই। আর কেনই বা তিনি দেহের রোগকে নিজের মনে করবেন। পুনরায়—

'আত্মানম্ চেৎ বিজানীয়াৎ অয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ'। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১২)

এমনিভাবে নানা ধরণের অধ্যাত্ম চিকিৎসা আছে। তবে কথা হচ্ছে এই ধরণের চিকিৎসার মূলে হচ্ছে 'বিশ্বাস'। বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বাসেই সব কিছু মেলে।

হেনরি উড্ অধ্যাত্ম ও মানসিক চিকিৎসা বিধির পার্থক্য সম্বন্ধে বলেছেন[১],

'অধ্যাত্ম চিকিৎসা সাধারণবোধ ও অনুভূতির বাইরে। তর্ক-বিচারবুদ্ধির ঊর্ধ্বে এর স্থান, তাই সূক্ষ্ম কূটবিচার দিয়ে তাকে প্রমাণ করা যায় না। অন্তরতম ব্যক্তিত্ব তার বিষয়, আর শুধু অন্তসমীক্ষা, আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকে বুঝতে হয়।

পক্ষান্তরে, মানসিক চিকিৎসা হচ্ছে আগাগোড়া বিধিনিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ বিধি নিয়ম উচ্চ স্তরের হলেও সুব্যবস্থাও যথাযথ। যে প্রচলিত নিয়ম সংশোধনের উপরে ও পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাই হ'লো ঐ পদ্ধতির অনুশাসন'।

অভেদানন্দ বলেন, অধ্যাত্ম চিকিৎসা বলতে তাহলে কি বুঝবো। তাঁর ভাষায় বলি,

'আত্মার অফুরন্ত শক্তিভাণ্ডার থেকে উচ্চতর প্রাণস্পন্দন বিকীর্ণ হয়। অতি-চেতন লোকে প্রাণসত্তাকে তুলে আমাদের অবচেতন সত্তাকে সেই উচ্চতর প্রাণস্পন্দনে পূর্ণ ক'রে নিতে হয়; তারপর ঐ স্পন্দনগুলিকে স্থূলদেহের ব্যাধিগ্রস্ত অংশে পুঞ্জীভূত ক'রে প্রাণের অনাময়কারী শক্তি দেহস্থ জীবকোষ ও টিশুগুলিতে ভরে দিতে হবে। এই প্রাণ-স্পন্দনের দুর্বার প্লাবনে রোগের সব বীজাণু, দোষ ও মালিন্য কেটে গিয়ে পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে আসবে'।[২]

১ *Ideal Suggestion through Mental Photography*. p. 20.

২ We do not have to deny sickness or affirm wholeness or exercise faith, but we have to rise into the superconscious state and fill our whole subconscious being with higher vibrations of *prana* or life force, which emanate from the infinite stock of the Spirit or *Atman*. Then focus those vibrations to the centre of disorder in the physical body, and charge the cells and tissues of the organs with the healing power of *prana*. Thus strengthened by the illumined consciousness of the Spirit and charged by the normal vibrations of *prana*, the cells and tissues will throw off impurities, kill germs, microbes, and bacteria aud completely recover from then abnormal vibrations. The result will be a marvellous cure.'

—*Science of Psychic Phenomena* 2nd, Edn, p. 60.

অধ্যাত্ম চিকিৎসার সাহায্যে রোগ নিরাময় করতে হলে অতি সচেতন অবস্থায় পেঁছে অনন্ত আত্মশক্তির কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। প্রাণের সুস্থতাকারী শক্তির স্পন্দন জীবকোষ ও দেহের তন্তুগুলিতে পাঠানোর কৌশলটি যদি আয়ত্ব করা যায় তাহলে বলা যেতে পারে অধ্যাত্মচিকিৎসার রহস্যটুকু আয়ত্ব করা হয়েছে।

দশ

॥ ব্যবহারিক শিক্ষা প্রসঙ্গে অভেদানন্দ ॥

সন্ন্যাসী বৈদান্তিক স্বামী অভেদানন্দ কেবলমাত্র নিজেই জ্ঞান আহরণ ক'রে তৃপ্ত হতেন না, দেশের লোকের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হওয়া দরকার তার সম্বন্ধেও গভীর ভাবে চিন্তা ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন শুধু জ্ঞান আহরণ করলেই চলবে না, তার ব্যবহারিক দিকটিও জানতে হবে বিশদভাবে। ব্যবহারিক শিক্ষা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয় এ তত্ত্বটি তিনি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া যেখানে সাধুদের বৈশিষ্ট্য বললেই চলে, সেখানে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ জীবনের প্রতিটি অধ্যায়কে সুন্দর ক'রে তোলার কথা আমৃত্যু ব'লে গেছেন। এইটেই হচ্ছে বিজ্ঞানীর লক্ষণ। বাস্তবকে স্বীকার ক'রে তাকে মহত্তর, সুন্দরতর পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন সাধুরা।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর কুয়ালালামপুরে স্বামী অভেদানন্দ এক বক্তৃতায় নিজেই প্রশ্ন তোলেন, আপনারা জগতের স্রষ্টার সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে থাকেন। কিন্তু এই স্রষ্টা কোথায় থাকেন? তিনি একই সংগে আবার প্রশ্ন করেন: 'আপনাদের স্বর্গের কথাও বলা হয়। কিন্তু তা কোথায়? কোথায় এই স্বর্গ?' নিজেই উত্তর দিলেন বিজ্ঞানীর বিশ্লেষনী মন দিয়ে: প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ একটি মানসিক অবস্থামাত্র। আপনারা এই স্থূল জগতে বাস করছেন। আপনারা ঘুমন্ত অবস্থায় যেমন স্বপ্ন দেখেন, পৃথিবীর অন্তর্গত সমস্ত ব্যাপারও সেইরকম স্বপ্নের মতো।' বিশ্লেষণ ক'রে তিনি পুনরায় বলেন, স্বপ্নে অনেক কিছু দেখা যায়, কিন্তু ঐ স্বপ্নগুলি কোথায় দেখি তা তো জানি না। এই স্বপ্ন কি বাইরে কোন জায়গাতে ঘটে থাকে? তা-তো নয়। তার সৃষ্টি ও স্থিতি মনোজগতেই। এই সব সত্য তথ্যগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করতে এবং তাদের অনুভব করতে হবে, তবেই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাবে। সামান্য কেরানীর কাজ করা মানবজীবনের আদর্শ নয়। যদি স্বাবলম্বী হ'তে হয় এবং নিজের মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে ইচ্ছে ক'রে তবে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে। ঐ বক্তৃতাতেই তিনি বলেন,

'ইংলণ্ডবাসীদের মতো আপনারা নূতন কোন সত্যের আবিষ্কার করুন এবং শ্রমশিল্পের (industry) উন্নতির দ্বারা নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদন করুন। ইংলণ্ডের লোকেরা কেরানীর ন্যায় অধীন হয়ে থাকতে চায় না ; তারা চায় স্বাধীনতা। আমরা ভারতবাসীরা ঐ আত্মনির্ভরতার মনোভাব হারিয়ে ফেলেছি, বর্তমানে আমরা শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি। আমরা নিজেদের সংশোধন না করলে এবং নিজেদের সংস্কৃতির উন্নতি না করলে কেউ-ই আমাদের উন্নতিলাভে সাহায্য করতে পারবে না। নিজেরা নিজেদের সাহায্য না করলে ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য করতে পারেন না'।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ পুনরায় বলেছেন : বর্তমানে তাঁরা (কুয়ালালামপুর বাসীদের উদ্দেশ্যে) এমন এক দেশে বাস করছেন যেখানে বহির্জগতের বিরা পরিবর্তনগুলিকে তারা দেখতে পান না। প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে আমর উত্তরাধিকার সূত্রে শিক্ষার যে মূল নীতিগুলি পেয়েছি তাদের অবলম্বন কা জগতের নানা পরিবর্তন ঘটছে। তিনি বলেন দেহের প্রয়োজনগুলি কি বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষা যে কেবল স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানতে সাহায্য করবে তা নয়, ত আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকেও বুঝতে সহায়তা করবে। এমতাবস্থা বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি জানা অত্যাবশ্যক। এখানে তাঁর নিজের কথা বঙ্গানুবাদ তুলে ধরছি :

'গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুগুলির পরিবর্তন কী প্রকারে হচ্ছে তা আপনার জানেন না। সৌরজগতের সঙ্গে পৃথিবীর কী সম্বন্ধ তা আপনারা অবগত নন। গ্রহগুলির মধ্যে পরস্পরের কী সম্পর্ক তা জানা আপনাদের উচিত পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে। জ্যোতির্বিদ্যার এই প্রকা প্রাথমিক জ্ঞান ছেলেমেয়েদের দেওয়া উচিত। সূর্যের উদয় ও অস্ত সম্বন্ধী ঘটনাগুলি গল্পচ্ছলে তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। সূর্য এত দূরে আছে যে তা আমাদের কাছে একটা ছোট থালার মতো দেখায়। পৃথিবী থেকে সূর্য নয় কোটি উনত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে গিয়ে পৃথিবীতে সূর্যের আলোক আসতে প্রায় নয় মিনিট সময় লাগে। যে সব তারকা বহুদূরে আছে, তাদের দূরত্ব সম্বন্ধে ভাবুন। তাদের মধ্যে কোন কোনটি আমাদের সূর্যের চেয়ে

বড়। সেই সব নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে অনেক বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে হয়তো সেই গ্রহগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও তার আলো আমরা দেখতে পাই। যখন আপনারা একটি নক্ষত্র দেখেন, তখন আপনারা এমন একটি জিনিসকে দেখছেন যে অতীতে তার আকার ও গঠন সম্পূর্ণ আলাদা ছিল; তাকে এখন যেমন দেখছেন আগেকার সেইরূপ যে রয়েছে তা ভাববেন না। তার আকার ও অবস্থা ও সেইরূপই ছিল যখন আলোক নক্ষত্র থেকে বের হয়েছিল। মনে করা যাক তা পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু তা আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন? এর বর্তমান অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। একশত বছর বা এক হাজার বছর আগে যে অবস্থায় ছিল শুধু তা-ই আপনারা দেখছেন। এটি আপনাদের কাছে একটি বিস্ময়কর সত্যের প্রকাশ ব'লে মনে হতে পারে। তবুও এই সব বিষয় আপনাদের শিখতে হবে'।[১]

বহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: অধিকাংশ লাকেরাই শিক্ষার মূল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অনুভব করেন না। নজেদের অবস্থা সম্বন্ধে ও অচেতন। এমনকি কিভাবে খাওয়া উচিত বা রীরের উন্নতির জন্য কোন্ কোন্ খাদ্যের প্রয়োজন সেকথাও জানা নেই। কান্ খাদ্য চিন্তাশক্তিকে, মস্তিষ্ককে, মাংসপেশীগুলিকে, অস্থিকে এবং স্নায়ু-কেন্দ্রকে সুগঠিত ও পরিপুষ্ট করবে, সেকথাও জানা নেই, অথচ তা না জেনে নজের খেয়াল খুশিমত যে কোন খাদ্য খেয়ে পরিপাক শক্তিকে নষ্ট করে ফলেন। একারণে তিনি উপদেশ দিয়েছেন রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়নের। লেছেন, রসায়ন বিজ্ঞানকে প্রয়োগ পদ্ধতির সঙ্গে অবহিত হতে হবে। যেহেতু াতেই সব খাদ্যের মৌলিক উপাদানগুলি ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, দহের আয়তন বাড়ানোর জন্য কোন্ কোন্ রাসায়ণিক উপাদান প্রয়োজনীয়, বা াদ্যকে পরিপাক করবার জন্য পাকস্থলী কি পরিমাণ অম্লরস ক্ষরণ করে সেকথাও জানতে হবে। এমনিভাবে তিনি দেহের বাইরেকার এবং দেহের ভিতরকার বষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বক্তৃতার মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন এবং এসব য় সকলেরই জানা উচিত সে সম্বন্ধে সর্বদাই বলতেন।[২]

১ Vide *Science Psychic Phenomeue.*

২ *Ibid.*

এগার

॥ বিজ্ঞানী-সঙ্গমে স্বামী অভেদানন্দ ॥

বৈজ্ঞানিক মেজাজের অধিকারী স্বামী অভেদানন্দ কেবলমাত্র ধর্ম-দর্শন নিয়েই তৃপ্ত ছিলেন না, বিজ্ঞানের বিচিত্র রাজ্যে তিনি পর্যটন করেছেন তার সামান্য পরিচয় আগেকার অধ্যায়গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশে এবং স্বদেশে তিনি বহু বিজ্ঞানীর সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছেন। প্রথমেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডিসনের সংগে তাঁর পরিচয়ের কথা বলবো।

এডিসন :

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর স্মৃতি পর্যালোচনায় বলেছেন, '(১২ই অক্টোবর, ১৮৯৭) সকালে মিসেস হুইলার আমাকে ও শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দ) নিয়ে মিস্টার টমাস এডিসনের অ্যাম্পায়ার ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস্ দেখবার জন্যে নিয়ে গেলেন। টমাস এডিসন ইলেকট্রিক লাইট, ইলেকট্রিক হিটার, পাখা ও গ্রামোফোন প্রভৃতি আবিষ্কার ক'রে জগতে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। মনীষী এডিসনের সংগে দেখা ক'রে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন আবিষ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যই তিনি ঋষিতুল্য আপনভোলা লোক ছিলেন। খাওয়া, নাওয়া বা শোওয়ার চিন্তা তাঁর কখনো ছিল না। নিজের ডেস্কে বসেই কাটাতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ধ্যানমগ্ন যোগীর মতো ছিল তার অবস্থা। আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে দিবারাত্র সমাহিত চিত্তে ডুবে থাকতেন গবেষণার কাজে। তাঁর চাকর বা বাড়ীর কোন লোক খাবার নিয়ে গেলে বেশীর ভাগ দিনই তা ঠাণ্ডা হয়ে যেত, হুঁস থাকতো না সময় কোথা দিয়ে চ'লে যেতো। একেই বলে সাধনা। কুশাসনে বা বাঘছালে বসে চোখ বুজলেই কি কেবল সাধনা হয়? আত্মসমাহিত চিত্তে যে-কোন বিষয়ের গভীর অনুশীলনের নামই সাধনা। ঐকান্তিক ও কঠোর সাধনা ছিল ব'লেই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মনীষী এডিসন তাঁর মহিমময় জীবনে'!

এডিসনের সংগে তাঁর কথাবার্তা কেমন হয়েছে সে প্রসংগে তিনি বলেছেন, 'মিসেস হুইলার আমাদের দুজনকেই তাঁর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আদর-আপ্যায়ন ক'রে তিনি নিজের পাশের চেয়ারে আমাদের বসালেন।

কানে একটু কম শুনতেন বুঝলাম। তাঁর একান্ত অনুরোধে আমি বেদান্ত ফিলজফি সম্বন্ধে তাঁকে কিছু বল্লাম। তিনি সবটুকু শুনলেন বেশ মনোনিবেশ সহকারে। শেষে তাঁর অমূল্য সময় আর নষ্ট করা উচিত নয় ভেবে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম…'

শ্রদ্ধাপ্লুত এডিসন স্বামী অভেদানন্দকে তাঁর তৈরী একটি 'গ্রামোফোন' উপহার দেন। সেটি কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে রক্ষিত আছে।

অধ্যাপক শেলার :

অধ্যাপক শেলার ছিলেন আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী। স্বামী অভেদানন্দের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর সংগে সাক্ষাতকারের বিষয়-সম্বন্ধে অভেদানন্দ বলেছেন,

'(৩০শে মে ১৮৯৮) সকালে 'মট্ মেমোরিয়াল হল'-এ অধ্যাপক শেলারের Matter, Motion and Mind সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। ডাঃ জেন্স ও তাঁর স্ত্রীর সংগে আমি অধ্যাপক শেলারের বক্তৃতা শুনতে যাই। অধ্যাপক শেলার ছিলেন আমেরিকার একজন বড় বৈজ্ঞানিক। দুপুরের আহারাদি সেরে ডাঃ জেন্সকে সংগে নিয়ে অপরাহ্নে অধ্যাপক জেম্‌সের বাড়ীতে হাজির হলাম। দেখি অধ্যাপক জেম্‌স, অধ্যাপক শেলার, ল্যানম্যান ও রয়েসকেও নিমন্ত্রণ করেছেন। ভাবলাম না জানি আজ কি বড় রকম একটা তর্কযুদ্ধ না হবে। যাহোক শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ ক'রে বসা গেল lunch-এ। অধ্যাপক জেম্‌স. 'Unity in Variety' বহুত্বের মধ্যে একত্ব বিশ্বাস করতেন তা' আগেই বলেছি। কাজেই unity-র বিরুদ্ধে তিনি নানান রকম যুক্তি ও বিচারের অবতারণা করতে লাগলেন। আমি অদ্বৈত-বাদের পক্ষ অবলম্বন ক'রে তাঁর প্রায় সমস্ত যুক্তিই খণ্ডন করলাম। আমাদের আলোচনা চলেছিল প্রায় তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা ধ'রে অধ্যাপক জেম্‌স অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নানান যুক্তির অবতারণা ক'রে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর সবগুলিই আমি খণ্ডন ক'রে অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠা করতে থাকলাম। অধ্যাপক রয়েস, ল্যানম্যান, শেলার ও ডাঃ জেন্স সকলেই প্রতিবারে আমার পক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন।' স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সেই সময়ে যদি কোন স্টেনোগ্রাফার থাকত তবে তা একটি স্মরণীয় গ্রন্থ হত।

ডাঃ মায়ার্স :

ডাঃ মায়ার্সের পরলোকতত্ত্বের উপর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বৈজ্ঞানি ও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা থেকে তিনি প্রেততত্ত্বের উপর যথেষ্ট আলোকপা করেছিলেন। একবার 'হিপনোটিক হিলিঙ্' সম্বন্ধে তিনি লণ্ডনের সাইকিক্যা রিসার্চ সোসাইটিতে বক্তৃতা দেন। সেখানে মিঃ ষ্টার্ডিকে সঙ্গে নি অভেদানন্দ যান। সেখানেই মায়ার্সের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অভেদান স্মৃতিচারণে বলেছেন,

'বক্তৃতার পর ডাঃ মায়ার্সের সঙ্গে দেখা ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সত্যি হিপনোটিক হিলিঙের কোন scientific basis আছে কি না। তি আমার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হয়ে একদিন তাঁর practical demonstratio আমায় দেখিয়েছিলেন। একটি অসুস্থ য়ুরোপীয়ান মেয়েকে ঘুম পাড়ি suggestion দিয়ে তিনি তার অসুখ ভাল করেছিলেন। এ' আমার নিজে চোখে দেখা।'

ডাঃ এমার গেটস্ :

ডাঃ এলমার গেটস্ ওয়াশিংটন, ডি. সি-র বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্বি ছিলেন। তিনি জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে সচে ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে মিঃ লেগেটের (তিনি স্বাম বিবেকানন্দের পরমভক্ত ছিলেন) নিমন্ত্রণে অভেদানন্দ তাঁর বাড়ীতে যান সেখানে ডাঃ গেটস্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভেদানন্দের সঙ্গে আলা আলোচনাদি ক'রে অত্যন্ত প্রীত হন এবং রাজযোগের দার্শনিক তথ্য সম্ব নানাবিধ প্রশ্ন করেন। স্বামীজীর সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে মনে হয়। শ্রদ্ধাপ্লুত ডাঃ গেটস্ স্বাম অভেদানন্দকে তাঁর গবেষণাগারে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। প্রতিশ্রু অনুযায়ী অভেদানন্দ একদিন ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে চেভিচেজে ডাঃ গেটসে বাসভবনে উপস্থিত হলেন। এইভাবে তাঁকে পেয়ে ডাঃ গেটস্ অত্যন্ত আনন্দি হন।

মিঃ হুইল :

বিজ্ঞানী মিঃ হুইল মাটির নীচে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পা এমন এক নতুন ধরনের ট্রামগাড়ী আবিষ্কার করেছেন। মিঃ হুইল অভেদানন্দে

ाতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং একদিন তাঁকে তাঁর (হুইলের) গবেষণাগারে নয়ে গিয়ে তাঁর নবাবিষ্কৃত ট্রামগাড়ীর সমস্ত কলকব্জা, চালনা প্রণালী াভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখান।

ম্রাচার্য জগদীশচন্দ্র :

৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বা ঐ সময়ে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল নস্টিটিউটে আচার্য জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দেন। বোম্বাই-এর ভূতপূর্ব াভর্নর লর্ড রিয়ে তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। অভেদানন্দ সেখানে গয়েছিলেন বক্তৃতা শুনতে। এ প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ স্মৃতিচারণে লেছেন,

‘অনেক সুশিক্ষিত লোকের ভিড় হয়েছিল। বক্তৃতার পর ডাঃ বসুর (জগদীশচন্দ্র) সঙ্গে আমি দেখা করি। আমায় দেখে তিনি ভারী খুশী হয়েছিলেন। তাঁর নব আবিষ্কৃত ‘আর্টিফিসিয়াল আই’ (Artificial Eye) যন্ত্রটি তিনি আমায় দেখালেন। মিঃ ষ্টার্ডিও আমার সঙ্গে ছিলেন’।

৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে অভেদানন্দ দার্জিলিং যাবার পরে প্রায়ই তিনি বেড়াতে বড়াতে জগদীশচন্দ্রের ‘মায়াপুরী’তে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে গল্প ক’রে ফিরতেন। এমনিভাবে বিজ্ঞানী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছিল।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণার প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে অভেদানন্দ সচেতন ছিলেন। তাঁর গবেষণার একটি বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়ে অভেদানন্দ বলেন,

‘Now plants have souls, and they have feelings. They feel the change of the atmosphere and climate. When a cloud passes over a tree, the tree knows it and feels it. They are most sensitive than we are. In wireless telegraphy, when the current passes through the tree, the tree feels it. All this has been discovered by Sir J. C. Bose. His discovery has revolutionized the modern scientific world. He has invented an instrument, by which he can know how quickly

the trees are growing. It can measure 1/1000,000 of an inch, in every second. That can be measured and recorded. A tree can be chloroformed. Anaesthetics would be given, and change can be discovercd just in the some way as in a human being. These are all scientific facts to-day.'

বার

॥ বৈজ্ঞানিক উপমা-সংগ্রহে অভেদানন্দ ॥

বিজ্ঞানকে স্বামী অভেদানন্দ স্থান দিয়াছিলেন নিজের মনের মণিকোঠায় তাঁর অগ্রজতুল্য গুরুভ্রাতা ভুবনবিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের মতো। শুধু স্থান দেওয়া নয়, তাকে নিজের অনুভূতির জারকে সিক্ত ক'রে একান্ত আপনার ক'রে তুলেছিলেন। একারণেই দেখা যায় বিষয়বস্তুকে বোধগম্য করবার জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বিজ্ঞানের তত্ত্বের ও তথ্যের। আগ্রহভরে এবং সুনিপুণ-ভাবে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানকে পছন্দ করলেই এ কাজ হয় না, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু না থাকলে এ কাজ সম্ভব নয় হয়তো একথা সত্য বিদেশে যেখানে জড় বিজ্ঞানের জয়-জয়কার, সেখানে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা ক'রে সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তুলতে হবে। এ কাজ নিঃসন্দেহে কঠিন। স্বামী বিবেকানন্দ-ই সর্বপ্রথম বিশ্বে দেখিয়েছেন ধর্মকে বৈজ্ঞানিক সত্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এই মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। অভেদানন্দের ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক উপমাগুলি আমরা ক্রমে ক্রমে তুলে ধরবো।

'বর্ণ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অভেদানন্দ বিজ্ঞানের কথা দিয়ে তাকে প্রকাশ করেছেন। বর্ণ এবং জড় পদার্থ এক কি না তারও বিচার করেছেন বিজ্ঞানের আলোকে।

'বর্ণ' একটি গুণবিশেষ। কিন্তু উহা কোথায় থাকে? সাধারণ অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস যে, পুষ্পের যে বর্ণ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা পুষ্পের মধ্যেই নিহিত থাকে। শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ কিন্তু বলিবেন যে, আমরা যে বর্ণ পাই, তাহা পুষ্পে দেখা গেলেও পুষ্পে থাকে না। তাঁহাদের মতে উহা (বর্ণ) একটি অনুভূতিমাত্র। আমাদের চাক্ষুস স্নায়ুবাহী চৈতন্যের সঙ্গে কোন বিশেষ একপ্রকার পরিস্পন্দনের সংস্পর্শ ঘটিলেই ঐ প্রকার অনুভব বা সংবেদনার সঞ্চার হইয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সত্য। বর্ণানুভূতি একটি যৌগিক ক্রিয়ার ফল। ব্যোম-পদার্থে (ether) প্রথমে কম্পন হয়, পরে ঐ কম্পন চক্ষুর্দ্বার দিয়া মস্তিষ্কে

প্রবেশ করে এবং সেখানে যাইয়া ঐ স্থানে কোষসমূহের মধ্যে আর এক প্রকার কম্পনের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বর্ণ এই উভয় প্রকার কম্পনের ফল। মস্তিষ্ককোষের এই কম্পন চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হইলেই অনুভব বা সংবেদন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অতএব, জড় ও চৈতন্যের সংমিশ্রণের ফলই বর্ণ। ইহা বাহ্য (objective) ও আন্তর (subjective) উভয় জগতের প্রদত্ত বস্তুর সমাবেশের ফল। সুতরাং দেখা গেল যে, বর্ণ পুঞ্জে থাকে না: উহা অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বর্তী ঝিল্লী, চাক্ষুস স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-কোষের উপর নির্ভর করে; অতএব ঐ বর্ণ এবং জড় এক হইতে পারে না'।[১]

জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অভেদানন্দ বলেছিলেন জড় কারো দ্বারা সৃষ্ট হয় নি। তার সৃষ্টি কেউ কখনো দেখে নি। কিছুই ছিল না, হঠাৎ জড়ের সৃষ্টি হ'লো অথবা জড় ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তার কিছুই থাকবে না, এমন কল্পনা কেউ কখনো করতে পারে না।

বিষয়টিকে পরিষ্কার করবার জন্যে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিকে গ্রহণ ক'রে বলেছেন,[২]

'আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড়জগৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল নয়। ত কখনো সৃষ্ট হয় নি এবং কখনো তার ধ্বংস হবে না। জড়ের আরও নানা ধরনের সংজ্ঞা আছে। কোন কোন পদার্থবিদ্ বলেন—যারই কেন্দ্র অভি-মুখে প্রেরণ করবার শক্তি আছে তাকেই জড় বলা যায়। কিন্তু এতে আমরা জড়ের যথার্থ প্রকৃতি জানতে পারলাম না। এতে এটুকু মা বলা হ'লো যে, একটি পদার্থ আছে যা আকর্ষণে সাড়া দিয়ে থাকে।'

১ আত্মজ্ঞান, পৃ ৬-৭

২ 'According to modern science, matter in its true nature is a substan uncreatable and indestructible, that is. it was neither created out of nothi nor can it go back into nothing. There are various other definitions matter. Some physicists say that matter is 'whatever possesses the prope of gravitative attraction. But still this does not tell us its true nature, we c only say that there is some substance which responds to attractions'.—Spi And matter: *Self-Knowledge*, p g. 12

ই জগৎ শুধুমাত্র অচেতন পদার্থে গড়া নয় বা তা কেবলমাত্র পরমাণু সমষ্টি দয়ে গড়া নয়। তৎকালীন বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক মত ও বেদান্তের মতের মঞ্জস্য দেখিয়ে অভেদানন্দ বলেছেন,[৩]

'এ যাবৎ কাল পাশ্চাত্য দেশীয় পদার্থবিদ্, রাসায়নিক এবং অন্যান্য জড়-বাদীরা বিশ্বাস করতেন যে, পরমাণু অবিভাজ্য এবং তারা অসীম আকাশে ভাসছে। এরা পরস্পরের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির অধীন হয়ে ঘুরছে। তারা স্বতঃই যাবতীয় নৈসর্গিক বস্তু উৎপাদন করছে এবং তাদের দ্বারাই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সুবিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী জে, জে, টমসন্ বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রয়োগ পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, তথাকথিত অবিভাজ্য পরমাণুকেও সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্মতর অংশকেই 'ইলেকট্রন', প্রোটন বলে, যা প্রাচীন হিন্দু-বিজ্ঞানীদের তন্মাত্রা বা শক্তিকেন্দ্র ছাড়া অন্য কিছুই নয়। যদি পরমাণুগুলি ইলেকট্রনেরই (প্রোটনেরও) সমষ্টি হয় এবং এগুলিই তন্মাত্রা অথবা শক্তিকেন্দ্র হয় তবে তারা কোথায় থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে বেদান্ত বলে যে, তারা অনাদি ও সর্বশক্তি স্বরূপিনী অব্যক্ত প্রকৃতির আধার সেই ব্রহ্মস্বরূপ অনাদি অনন্ত কারণ সমুদ্রের মধ্যেই অবস্থিত'।

আত্মানুসন্ধান' (Search after the Self) প্রবন্ধে অভেদানন্দ আত্মার প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। নামরূপহীন আত্মা কেমন ক'রে আকার বিশিষ্ট দেহের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হ'তে পারে? বিষয়টি বোঝানোর জন্য তিনি বিজ্ঞানের উপমার আশ্রয় নিলেন।[৪]

৩ 'Until lately the western physicists and other materialists believed that hese atoms were indivisible units floating in the infinite space, attracting nd repelling one another, mechanically producing the elements of nature nd ousting the phenomenal world. But now, through the application of lectricity, J. J. Thompsm has proved.........the mother of all forces.'—*Self-Knowledge*, p. 12

৪ Wind has no form, steam has no particular form, eletricity is formless but still they appear through forms. When the wind blows, although it is ormless, it comes in direct contast with objects with form, and shows its

'আমরা জানি যে, বায়ুর কোনও রূপ বা আকার নেই, বাষ্পেরও কোন আকার নেই, তড়িৎশক্তিরও কোন আকার নেই, কিন্তু তারা অন্য কোন আকারের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয়। যদিও বায়ুর কোন আকার নেই তথাপি বাতাস যখন বইতে থাকে, তখন তা আকারবিশিষ্ট বস্তুগুলির সংস্পর্শে এসে তাদের সঞ্চালন করে এবং তার সাহায্যেই বায়ুর আকার ও ক্ষমতা প্রকাশিত হয়, এইরূপ বাষ্পও আকারশূন্য, কিন্তু বাষ্পীয় যানের সাহায্যে আমরা তার বিশাল শক্তির প্রকাশ দেখে থাকি। আমাদের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল তড়িৎ-শক্তিতে পরিপূর্ণ হলেও আমরা তা দেখতে পাই না, কিন্তু বিদ্যুতের দীপ্তি বা বজ্রপাত ইত্যাদিতে তার অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। আমরা বাস্তবিক এই বায়ুমণ্ডলস্থিত তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি না। মার্কনি নামে বিখ্যাত বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের জন্যই তড়িৎ-প্রবাহের উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করেছি বেতারবার্তাতেও এই ধরণের তড়িৎ-শক্তির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। বাস্তবিক কেউ কখনো কোন অরূপ শক্তিকে চোখ দিয়ে দেখে নি বা হাত দিয়ে স্পর্শ করে নি, তবে তাদের অস্তিত্ব কোনও আকারের (পদার্থের) উপর প্রকাশিত হলেই তা বুঝতে পারা যায়। যেমন অবস্থাবিশেষ সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অরূপ শক্তিসমূহকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারা যায়, সেই রকম এই আত্মা স্বভাবতঃ অতীন্দ্রিয় হ'লেও স্থূল দেহের ভিতর দিয়ে তার ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়'।

form, but think how it manifests its gigantic force through engines and locomotives. The atmosphere is filled with electricity, which is imperceptible to our eyes and senses, yet it takes various form, such as lightning and thunder. We do not feel the presence of atmospheric electricity ; it required a Marconi to make us realize the value and importance of this invisible current in the atmosphere. The forces of nature are always invisible and formless. No one has ever seen or touched a force per se. Its existence can only be inferred by seeing its manifestation through forms. As all the imperceptible forces can be perceived by the senses under certain conditions So the 'atman' or true self, although imperceptible by nature, manifests power and intelligence through the form of the physical body. — *Knowledge*, P. 72-73

কর্ম সামঞ্জস্যের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনাকালে তিনি বিজ্ঞানের উপমা সংগ্রহ করেছেন কুশলী বিজ্ঞানীর মতো।

'মনে করুন—দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে একটি জলীয় অণু গঠিত হয়। উক্ত সংযোগ হইতেছে কারণ অথবা হেতু এবং জল ইহার ফল। ইহাই আবার সংযোগ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া এবং ক্ষয়াত্মক অভাবের আপূরণ স্বরূপ। ইহাতে কোথাও কোন প্রকার উপচয় অথবা অপচয় ঘটে না। একটি জলীয় অণুতে দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু অক্সিজেন আছে, তাহার অপেক্ষা কোন কিছু অধিকও নাই এবং কিছু কমও নাই। এইরূপে উত্তাপ কেবল ইন্ধন-দহনের ফল এবং প্রতিক্রিয়াই নহে, পরন্তু উহা ইন্ধনক্ষয়ের আপূরণ-স্বরূপ। আবার যে শক্তি রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, বিদ্যুৎ তাহার ক্ষতিপূরণ করে। শক্তির বিনিময়ে শক্তির উদ্ভব, কোথাও উহার বৃদ্ধি কিম্বা ক্ষয় না ঘটিয়া বরং পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যই রক্ষিত হইয়া থাকে। জড় জগতে যেরূপ প্রত্যেক শক্তি সামঞ্জস্য রক্ষার সহায়তা করিতেছে—মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতেও সামঞ্জস্যকারী সেই একই নিয়ম কার্য করিয়া যাইতেছে। এই সামঞ্জস্যের নিয়ম একই প্রণালীতে চলিতেছে'।[৫]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে জানা যে জ্ঞান সেই জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানেরই নামান্তর। কর্মযোগ আমাদের অজ্ঞানতার এই অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে এবং পরমজ্ঞানের অবস্থায় তুলে ধরে। এরই ফলে আমরা মানুষের সঙ্গে বিশ্বজগতের যে প্রকৃত সম্বন্ধ তা জানতে পারি এবং পরিণামে চরম একত্বরূপ তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারি। এই প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ একটি বৈজ্ঞানিক উপমা দিয়ে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করেছেন।[৬]

'সাধারণ লোক দেহের উপরিভাগের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পনের পাউণ্ড ওজনের চাপ সম্বন্ধে যেমন অচেতন, বিশ্বের এই রকম ঐক্য সম্বন্ধেও তাহারা তেমনই অজ্ঞান। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন দেহের উপর মোট ওজনের চাপ কত। বাস্তবিক ইহা এত বেশী যে, বায়ুশূন্য স্থানেও যেখানে বায়ুর

৫ কর্মবিজ্ঞান, পৃ ১৪-১৫
৬ ঐ পৃ ৪৯-৫০

চাপ ক্রিয়া করিবে না সেখানে দেহ রাখিলে দেহ ফাটিয়া যাইবে, তবুও লোকে দিনের পর দিন না জানিয়া এই চাপ বহন করে যতদিন না তাহারা কোন খাড়া পাহাড়ে উঠিতে চেষ্টা করে। স্বরূপের জ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। এ বিষয়ে উপলব্ধি না থাকার জন্য তাহারা মনে করে যে, যেহেতু তাহারা দেহের যত্ন লইতে শিখিয়াছে সেই হেতু তাহারা সবই জানিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের এই আদিম ও বর্বর ধারণা দেখিয়া জ্ঞানীরা পরিহাসের হাসি হাসেন। প্রতিপদে আমরা এই যাহা সংকীর্ণ, স্বল্পপরিসর ও উচ্চ জ্ঞানের লেশশূন্য কোন বিশেষ সাধারণ জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই তাহার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এই অজ্ঞানই আমাদের সকল ভ্রান্তির মূল।'

কোন বিষয়ের sensation বা সংবেদন হয় কি ভাবে। একটা শব্দ শুনলাম আর শব্দের সংবেদন আমার হ'লো, কিন্তু কি ক'রে বা কি process-এর ভিতর দিয়ে সেই sensation এল তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। স্বামী অভেদানন্দ এই বিষয়টি বিজ্ঞানের তথ্য দিয়ে চমৎকারভাবে বুকিয়েছেন।[৭]

'শব্দ প্রথমে auditory nerve এর ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে একটা vibration সৃষ্টি করে, সেই vibration আবার brain-cell-এ গিয়ে আর একটা vibration সৃষ্টি করে, ঐ vibrationগুলো আবার চৈতন্য-দীপ্ত মনের কাছে পৌঁছলে মন যে রকম অনুভব করে আর তার নাম sensation। সকল perception (প্রত্যক্ষ) বা sensation-এর জন্য মনকে তাই medium হয়ে থাকতে হয়, আর ঐ মনের পিছনে যে চৈতন্য থাকে তাই হলো conscious entity (সচেতন বস্তু)। ঐ entity মনের সাহায্যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ বা অনুভব করে। Brain (মস্তিষ্ক) যেন একটা higher আফিস বা কোর্ট, সেখানে self-consciousness (আত্মা) একজন অফিসার বা বিচারক। মনের সাহায্যে সেই কনসাসনেস অফিস বা কোর্ট'কে control ও conduct করে। সাধারণতঃ মনকে আমরা সকল-কিছু কাজের কর্তা ব'লে মনে করি। কিন্তু মনও আসলে instrument, তার নিজের কোন চৈতন্য নেই। মনের পিছনে চৈতন্যরূপী আত্মা থাকে ব'লেই মনের কর্তৃত্ব। সুতরাং যেকোন একটা incident (ঘটনা) বাইরের জগতে ঘটলে ইন্দ্রিয়ের কাজ হলো তাকে তৎক্ষণাৎ brain-

৭ প্রজ্ঞানানন্দ : তীর্থরেণু, পৃ ৮৬-৮।

পাঠিয়ে দেওয়া। ইন্দ্রিয়েরা যে যার nerve-channel (স্নায়ুপথ) দিয়ে সেই incident message-এর আকারে higher কোর্টে পাঠিয়ে দেয়। কোর্ট বা brain তা receive ক'রে তৎক্ষণাৎ আবার মনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। মনও receive করেই বলে—হ্যাঁ, এটা এই জিনিস। মনের এই সম্মতির নাম sensation (সংবেদন) বা perception (প্রত্যক্ষ)'।

এমনি ধরণের অসংখ্য উদাহরণে অভেদানন্দের রচনা ও বাণী সমাকীর্ণ। তিনি প্রচার করেছেন ধর্মকে তথা বেদান্তকে, আর সঙ্গে নিয়েছেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের হাতিয়ার, একত্রে সৃষ্ট করেছেন বৈজ্ঞানিক ধর্ম—যা বিংশ শতকের পক্ষে একান্তভাবে গ্রহণযোগ্য।

তের

॥ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসী ॥

এক পরমসত্যের কথা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে স্বামী অভেদানন্দের কণ্ঠে। বিংশ শতকের ধর্ম হবে এমন যা বিজ্ঞানের সমস্ত সত্যের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে পারে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কারনীতির উপর যুগোপযোগী ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। অভেদানন্দ একথাই দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন বিংশ শতক যে ধর্মকে চায় তা যুক্তিবাদী মানুষমাত্রের বাক্য ও চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও সমর্থন করবে, যার সংগে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত সর্বাধুনিক সিদ্ধান্তগুলির সংগে নিজের ভাবের ঐক্য দেখাতে পারবে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আদর্শ স্বাধীনচিন্তার সমর্থক। কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে তা নির্বিচারে স্বীকার করে না, বা একেবারে অভ্রান্ত ব'লে মেনে নেয় না। একমাত্র সত্যকে আবিষ্কার ও শুধু সত্যের উপাসনা তার লক্ষ্য। যে ধর্মকে আমরা বর্তমান যুগের উপযুক্ত ব'লে মনে করি তা-ও সত্যের অভেদ্য ও অচল শৈলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অভেদানন্দ বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত ও সমর্থিত যে সত্য সেই সত্যই আধুনিক যুগের উপযোগী ধর্মের ভিত্তি হবে। অভেদানন্দ বলেন, এটিই হ'লো প্রকৃত ধর্ম, একারণেই তা সমস্ত সত্যান্বেষী মানুষের সংস্কারমুক্ত চিত্তের উপর নিজের সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। বিজ্ঞান সমর্থিত এই ধর্মে সাম্প্রদায়িক ধর্মের মতো মুক্তির কোনও বাঁধাধরা যুক্তিহীন পরিকল্পনা থাকতে পারবে না।

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে ঐক্যতত্ত্ব উপলব্ধি করবার দিন সমাগত। 'জগতের বিখ্যাত ধর্মমতগুলির মধ্যে কোনটি বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে উপলব্ধির উপর ভিত্তি ক'রে আছে, এবং এক অপরিণামী অনাদি অনন্ত সত্তাকে বিশ্বজগতের যুগপৎভাবে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব'লে স্বীকার করে—তাকে তন্ন তন্ন ক'রে সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিতে ও নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য'।

অভেদানন্দ বলেন, প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা নিজেদের স্বতন্ত্র ও

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধারণার সাহায্যে বিশ্বের মূলতত্ত্ব ও পেছনে এক অখণ্ড সত্তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। আবার আধুনিক বিজ্ঞানীরাও জড় পদার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই মূলসত্যকে নির্ণয়ের চেষ্টা করতে করতে সেই একই গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছেন একথা বলা হয়। তবে 'অখণ্ড সত্তা' সম্বন্ধে অবশ্যই দ্বিমত আছে। যেহেতু বিজ্ঞান বিনা প্রমাণে ঐ 'সত্তার' অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে না। তবে আধুনিক বিজ্ঞান কার্য-কারণবাদের মধ্যে নিহিত সত্যের উপযোগিতা সবেমাত্র উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। প্রতিটি পদার্থের মধ্যে তার কারণ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, যেহেতু কার্যই কারণের স্থূল অভিব্যক্ত রূপ। একারণেই বলা যেতে পারে কার্য ও কারণ এক পদার্থেরই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা।

আজ আমরা পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কক্ষপথে অবস্থান করছি। কিন্তু একথা স্বতঃই মনে জাগে বিজ্ঞান আমাদের জীবনে পূর্ণতা এনেছে কি-না! বিশেষ-ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে কতগুলি পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পরে এ প্রশ্ন সরব হয়ে উঠেছে। একথা অনস্বীকার্য আজও বহু অজ্ঞেয় রহস্য আছে যার সমাধান বিজ্ঞান করতে পারে নি।

বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ফলিত বিজ্ঞান আজ তার জয়রথ চালিয়েছে দুর্মদ গতিতে। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ সে এনে দিয়েছে একথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি তার ভয়ংকর রূপ। অবশ্য তার জন্যে অনেকে বিজ্ঞানকে দায়ী ক'রে বসেন। বাস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞানের নিজস্ব কোন কর্ম শক্তি নেই। মানুষের লোভ যখন হিংস্র হ'য়ে ওঠে তখন তা বিজ্ঞানকে বিপথে চালিত করে। তার ফলে পৃথিবীতে নামে ধ্বংসের অশুভ ছায়া। কিন্তু বিজ্ঞানের এই রূপটিকে যেমন সত্য বলে মনে হচ্ছে, তেমনি সত্য তার কল্যাণময়ী রূপ। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে স্বস্তি, দিয়েছে সুখ, দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ। কিন্তু মানুষ সুখী নয়। তার কারণ মানুষ নিজের চিত্তকে বশে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা বলেছেন,

'যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি'।

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২০)

প্রায় একশ বছর আগে দার্শনিক শোপেনহাউয়ার বলে গেছেন,[১]

'All men who are secure from want and carc, now that at last they have thrown off all other burdens, become a burden to themselves.'

একথা শুনলে অবশ্যই দুঃখ পেতে হয়, কিন্তু কথাটি রূঢ় বাস্তব। আজ মানুষ নিজেই নিজের কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান ক্রমাগত আবিষ্কার ক'রে চলেছে। বিজ্ঞানের আরো আবিষ্কার, প্রয়োগবিজ্ঞানের অধিকতর উন্নতি কি মানুষের সব সমস্যার সমাধান ক'রে দেবে? সমাজবিজ্ঞানীরা নানা কথা বলেছেন। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালে কোন যুদ্ধ, কোন বিপ্লব, অশান্তি ইত্যাদি থাকবে না। এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে বক্তব্য এই. একই মতে বিশ্বাসী বা একই সমাজ-ক্রমে আস্থাশীল রাষ্ট্রসমূহ কি প্রত্যেকে প্রত্যেকের মিত্র স্থানীয়? তার মীমাংসা হয় নি।

তবে প্রশ্ন উঠবে, শান্তি কোন্ পথে আসবে! এই নিয়ে বিশ্বের নানা পণ্ডিত বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো[২] স্বামী অভেদানন্দও বলেছেন, মানুষ যদি বেদান্ত অনুশীলনে আগ্রহী হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার আত্যন্তিক উন্নতির জন্যে মানুষের হাতে এসে গেছে প্রচণ্ড ক্ষমতা। আজ সেই ক্ষমতায় মদমত্ত হ'য়ে মানুষ তার সেই যুগযুগান্তের সভ্যতার ধারা বিলোপ করতে চাইছে। যে সভ্যতা মানুষ গড়েছিল, তাকে সে নিজের হাতেই ভেঙে ফেলতে চাইছে, এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হ'তে পারে। এমন কোন পথ কি নেই যাতে মানুষ তার অন্তরের চিৎ-সত্তাকে উপলব্ধি ক'রে এই সভ্যতাকে আরো সুন্দর ক'য়ে তুলতে পারে—এই প্রশ্ন এখন বহু চিন্তাবিদের মনে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন,[৩]

'We are in the middle of a race, between humam skill as to means and human folly as to ends...unless men increase in wisdom as much as in knowledge mcrcase khowbdge will be increase of sorrow.'

১ Schopenhaure : *The World As Will and Idea*, Vol I, p. 404.

২ দ্র' ডঃ অমিয় কুমার মজুমদার : বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা, রূপা, ১৩৭৪

৩ *The Impact of Science on Society*, p. 120-21.

অভেদানন্দ বলেন, বেদান্ত মানুষকে নতুন জীবনের রূপ দেখাতে পারে। তিনি বলেছেন ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি—তা হলো আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞান লাভ। ধর্ম হ'লো আত্মজ্ঞান লাভের উপায়। তিনি বলেছেন,[৪]

> 'By religion, I do not mean any particular doctrines dogmas beliefs or faiths, but I mean the realization in our daily life, in each cast of the worship of the supreme being, which is the ideal of our religion.'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ধর্ম মানে আত্মানুভূতি। তিনি বলেছেন, ব্রহ্মা থেকে সামান্য তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সমস্তই যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে। তাই আমাদের কর্তব্য সকলকে সেই পূর্ণতালাভের পথে সাহায্য করা। এই সাহায্য করার নাম ধর্ম, বাকী সব অধর্ম। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর Vedanta Philosophy (1959) গ্রন্থে ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য আরো পরিষ্কার ক'রে বলেছেন বর্তমানে আমাদের স্বরূপ কি, আগে আমাদের স্বরূপ কি ছিল এবং ভবিষ্যতেই বা কি হবে, এছাড়া বিশ্ব সংসার ও শাশ্বত ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের আসল সম্পর্ক কতটুকু সেই পরিচয় দেয় ধর্ম। ধর্মের মানে এই নয় যে আমরা মন্দিরে, গীর্জায় বা মসজিদে যাই কি না বা আচার বিচার ও ব্রতাদি উদ্‌যাপন করি কি না। এসব ধর্মের বহিরঙ্গ।

এই ধর্ম যাকে বলা যেতে পারে 'science of human possibilities' তাকে গ্রহণ করলে মানুষ শান্তি পাবে, পৃথিবী থেকে সভ্যতার অবলুপ্তির আতঙ্ক দূরীভূত হবে।

কার্ল মার্ক্স ধর্মকে বলেছেন, আফিমের আলেয়া বা আত্মসম্মোহনকারী অন্ধ আত্মপ্রচারক। তাঁর ভাষায় 'a pleasing self-hypnotism and an unconscions self-deception'। আমার মনে হয় মার্ক্স ভারতীয় দর্শন পড়েন নি, বিশেষতঃ বেদান্ত দর্শন একেবারেই জানতেন না। পাশ্চাত্য ধর্মমতের উপর ভিত্তি করেই মার্ক্স তাঁর মতবাদ তৈরী করেছিলেন। অভেদানন্দ 'ধর্ম' সম্বন্ধে চমৎকার কথা বলেছেন : 'The religion of religions is our knowledge and realization and love.'[৫]

৪ *Lectures in India*, p. 119.

৫ Vide *True Psychology*, p. 192.

ম্যাক এবং কার্ল পিয়ার্সন উনবিংশ শতকের পদার্থ বিজ্ঞানের অকপট রূঢ় বাস্তবতাকে (naive realism) সংবেদনশীল বা অনুভূতিগ্রাহ্য ক'রে তুলেছিলেন। আধুনিককালে রাসেল ও হোয়াইটহেডের গাণিতিক আধা-বাস্তবতা (mathematical semi-realism) অতীতের চিন্তাধারাকে আরো প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে।

আধুনিক কালে হিউম ও কাণ্টের দর্শন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। একথা বলা বাহুল্য বিজ্ঞানের সেই অংশটির উপরেই প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে যেখানে পদার্থ বিদ্যার তত্ত্ব গাণিতিক ফর্মুলাতে[৬] প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা পাঠ করেন বা তার ইতিহাস জ্ঞাত আছেন তাঁদের অনেকে বিশ্বাস করেন না যে দর্শন-ই সঠিক পথ।[৭]

বর্তমান কালে একটি মতবাদ দানা বেঁধে উঠছে পাশ্চাত্য জগতে—বিজ্ঞানের যে উন্নতি হচ্ছে তার মূলে রয়েছে এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। উচ্চতর পদার্থ-বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে এক নতুন ধরণের দার্শনিক বোধ, যার প্রভাব অনস্বীকার্য।

প্রাচীন পদার্থবিদ্যা আমাদের বলে আমরা যা দেখি তা বাস্তব ঘটনা। আবার আপেক্ষিকতাবাদ থেকে আমরা জানি যা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা সব কিছুই আপেক্ষিক। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুসারে হ'লো আমরা সম্ভাব্য জিনিসকেই দেখি, ভবিষ্য সম্ভাব্যতাকে আমরা জানতে পারি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হ'লো, বিজ্ঞান ভবিষ্যতের কোন বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, করলেও তাকে নির্ভর করতে হবে "আকস্মিকতার উপরে" যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'laws of chance।'

পি, ডব্লু, ব্রিজম্যান (P. W. Bridgeman) পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের উপর আপেক্ষিকতত্ত্ব এবং কোয়াণ্টার প্রভাব[৮] চমৎকারভাবে পর্যালোচনা করেছেন।

৬ Sir Arthur Eddington : *Philosophy, of Physical Science,* Cambridge, 1939.

৭ H. Miller, "*Philosophy of Science,*" Sis, Vol XXX, 1939, p. 52

৮ *The Logic of Modern Physics,* New York, 1928, *The Natme of Physica Theory Princeton,* 1936.

তুন নতুন পর্যবেক্ষণ নব নব সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করছে। ফলে সৃষ্টি চ্ছে নতুন ধারণার। নব নব সত্যের আবিষ্কার নির্ভর করে বিজ্ঞানীরা পর্যক্ষণের পদ্ধতির উপরে। অতএব এ সবই আপেক্ষিক। যদি এ কথাটি ভাল াবে উপলব্ধি করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে যে কোন বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্য াতঙ্কিত হবার কারণ নেই, যেহেতু আইনস্টাইন ও প্লাংকের গবেষণাও বর্তমান ালে পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তাধারার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। প্রকৃতির ম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যুক্তি-তর্ক, গণিত বা প্রাকৃতিক সূত্রাবলী- সব কিছুই আমাদের যা জানা আছে অর্থাৎ জ্ঞাত বস্তু সমূহকেই একত্রে ও বিধিবদ্ধভাবে প্রকাশ করবার পন্থা মাত্র। পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ এর সাহায্যে ম্ভব নয়।

আজ বিজ্ঞানের বিজয়বার্তার কথা সকলেরই জ্ঞাত। ইঞ্জিনীয়ারিং, শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতিতে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ আধুনিক মানুষের উপরে ক্রমান্বয়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করছে। এর অপপ্রয়োগে সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। আর একটি মহাযুদ্ধ সুরু হ'লে প্রকাশ পাবে মানুষের চরম মূর্খতা, যেহেতু দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ে গড়া এই সভ্যতা বিলীন হ'য়ে যাবে।

সাম্প্রতিক কালে পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা এক অদ্ভুত পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে। বলা যেতে পারে সপ্তদশ শতকের গবেষণা বা চিন্তাধারার সঙ্গে এর কোন মিল নেই, প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। তথাপি নিউটনের বলবিদ্যা এবং ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চৌম্বকীয় তত্ত্ব এখনও গুরুত্বপূর্ণ সমাধান এনে দিচ্ছে। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা অপসৃত, তার জায়গা জুড়ে বসেছে আপেক্ষিকতত্ত্ব ও কোয়ান্টামতত্ত্ব। এমনিভাবে বিজ্ঞানের রাজ্যে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। একথা সত্য একদা অ্যারিস্টট্ল এবং গ্যালিলিওর মনীষার কাছে হার মেনেছিল প্রাচীন ধারণা, ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল তৎকালীন চিন্তার জগতে। এমনি 'দীপ্ত প্রতিভা' যখন কোন যুগে আসে তখন প্রাচীন ধারণার ক্ষেত্রে আসে প্রচণ্ড আঘাত। গ্যালিলিওর পর থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জগতে বারেবারেই এসেছে রেনেসাঁ। বলবিদ্যা থেকে পদার্থবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা থেকে বায়োলজি, বায়োলজি থেকে মনোবিজ্ঞান—এমনি স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে প্রাচীনকালের বিজ্ঞান। এখন বিজ্ঞানের সামনে যে জগৎ তা

প্রায় অপরিচিত। এমনিভাবে গবেষণার ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হয়েছে, বিস্তৃততর হয়েছে অজানার গণ্ডী। পদার্থবিদেরা প্রকৃতির মূল বা উৎস সন্ধানে গিয়ে তাঁদের অজ্ঞানতার সীমা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। বায়োলজিস্টরা মনে করেছেন যখন কোন ঘটনাকে প্রাকৃতিক সংজ্ঞায় অভিহিত করা হ'লো—যেমন বস্তু, বল, শক্তি বা অন্য কিছু দিয়ে, তখন তার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। কিন্তু পদার্থবিদেরা জানেন তাঁরা সেখানে অক্ষম। তাই বিজ্ঞানের এলাকা বা সীমা সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা উঁকি দিয়েছে। বিজ্ঞানকে অবশ্যই ধর্মের বিজ্ঞানকে মেনে নিতে হবে।

দুর্বল মানুষ হয়তো কখনো ধর্মের বিশেষ কোন 'বাদ'কে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, নানা আচার-অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করে, পৌরাণিক কাহিনীতে আস্থাশীল হ'য়ে পড়ে। এগুলি সত্যি হতে পারে আবার না-ও হতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ মতবাদকে (doctrine) আশ্রয় ক'রে 'প্রকৃত ধর্ম' কখনও উঠতে চেষ্টা করে না বা তার পতনও ঘটে না। সত্য ধর্ম অনেক গভীরের বস্তু। তা প্রত্যক্ষ অনুভূতির দৃঢ় শিলাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকে বর্ণান্ধ হতে পারেন, কিন্তু অন্য সবাই অবশ্যই সূর্যোদয়ের বর্ণচ্ছটা লক্ষ্য করে থাকেন। কারো হয়তো আদৌ ধর্মবোধ নেই, আবার অনেকের জীবন ঈশ্বরের জ্যোতিঃপুঞ্জের আভায় উদ্ভাসিত।

একথা না মেনে উপায় নেই, ধর্ম জীবনে এক বিশেষ আদর্শ না থাকলে পথ চলা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে অধিকাংশ প্রচলিত ধর্মমত যুগে যুগে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের কাছে ঘা খেয়েছে। মনীষী হোয়াইটহেড বলেছেন[৯],

'Religion will not regain its old power until it can face change in the samc spirit as does science. Its principles may be eternal, but the expression of those principles requires continual development......Religions thought developes into an increasing accuracy of expression, disengaged from adventitions imagery, and the interaction between

৯ Prof. A. N. Whitehead : *Science and the Modern World*, Cambridge, 1927. pp. 234. 2'6.

religion and science is one great factor in promoting this development.'

তাঁর কথায় ধর্মকে যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। বিজ্ঞানের প্রভাবে পৃথিবীতে যে পরিবর্তন এসেছে, যে চিন্তাধারার জগতে বিপ্লব ঘটে গেছে সেই নব নব ভাবনার অস্তিত্বকে মেনে নিতে হবে, তা না হলে ধর্ম সর্বজনগ্রাহী হবে না। অভেদানন্দ তাঁর সমগ্র জীবনে এ কথাই প্রমাণসহ ব'লে গেছেন, বেদান্তের বাণী শাশ্বত, সনাতন। বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মিতালী আছে। বেদান্তের ভাবনা বিজ্ঞানকে উপেক্ষা ক'রে নয় এবং সেই চিন্তা কালের পরিবর্তনে পুরোনো, পরিত্যাজ্য হয় নি।

জড়বিজ্ঞান অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়েছে অতি মন্থর গতিতে, বরং দীর্ঘদিন ধরে জড়বিজ্ঞান দর্শনকে ঠেলে নিয়ে গেছে যান্ত্রিক গণনার পথে যাকে বলা হয় material determinism। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক অধ্যায়ে ধারণায়, ভাবনায় মানুষের উন্নতির কথা-ই প্রধান ছিল, ফলে সমগ্র বিশ্বে আশার ক্ষীণ স্রোত যেন প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু বিংশ শতকে ঠিক তার বিপরীত। শুধু নৈরাশ্যের অন্ধকার। লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, মানুষের উদ্ভব এমন সব কারণ থেকে যেগুলি নিজ নিজ পরিণতি সম্বন্ধে অন্ধ। তার জন্ম, বৃদ্ধি, আশা, আকাঙ্খা, বাসনা, ভয়, ভালবাসা, বিশ্বাস—এ সবই এসেছে আকস্মিক ভাবে, হঠাৎ সৃষ্ট পরমাণুর পুঞ্জ থেকে। কোন উদ্দীপনা, বীর্য, চিন্তা-ভাবনার প্রশস্ততা তাকে কবরের বাইরে টেনে নিতে পারে না। রাসেলের নিজের ভাষায়[১০]—

'That man is the product of causes which had no provision of the end they were achieving, that his origin. his growth, his hopes and fears, his loves and his beliefs, are but the outcome of accidental collocations of atoms, that no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve an individual life beyond the grave, that all labours of all the ages, all the devotion, all the inspiration, all the noon-day brightness of human genius are destined to extinction in the

১০ Bertrand Russel : *Mysticism and Logic*, p. 47,

vast death of the solar system, and that the whole temple man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in ruins all these things, if not quite beyond dispute, are yet so nearly certain that no philosophy which rejects them can hope to stand.'

অনেকে মনে করেন এই নৈরাশ্যবাদের মধ্যেই প্রয়োজন ধর্মের। এই অবস্থাতেই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বেশি। এ প্রসংগে অনেক ধর্মপ্রবক্তাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেহেতু আমাদের আলোচনার বস্তু বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে সেইহেতু দার্শনিক-গণিতজ্ঞ হোয়াইটহেডের বক্তব্য আবার তুলে ধরছি[১১]

'The fact of the religious vision, and its history of persistent expansion, is our one ground for optimism. Apart from it human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of pain and misery, a bagatelle of transient experience.

আবার কতিপয় দার্শনিক, যেমন এডিংটন প্রভৃতি মতে বলেন বিস্তৃত অনুভূতি এবং মৌল পদার্থবিদ্যার আধুনিক উন্নতির ফলে পূর্বে বিজ্ঞান দার্শনিক ডিটারমিনিজ্‌মকে যেভাবে সমর্থন জানাচ্ছিল তা যেন দুর্বল হয়ে গেছে।

যা-ই হোক না কেন, মানুষ ক্রমশঃ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারছে যে বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও সীমা কতটুকু। এডিংটনের আর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

'The symbolic nature of the entities of physics is generally recognized, and the scheme of physics is now formulated in such a way as to make it almost self evident that it is a partial aspect of something wider...The problem of scientific world is part of a broader problem—the problem of experience...we all know that there are regions of the human spirit—untrammelled by the world of physics. In the mystic sense of the creation around us, in the expression of art. i

১১ A. N. Whitehead : *Science and Modern World*, p. 238.

a yearning towards God, the soul grows upward and finds fulfilment of something implanted in its nature...whether in the intellectual pursuits of science or in the mystical pursuits of the spirit, the light beackons ahead and the purpose surging in our nature responds. Can we not leave it at that ? Is it really necessary to drag in the comfortable word 'reality' ?'

প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক মডেল এত সাফল্য এনে দিয়েছে যে আমরা ক্রমশ যেন একথাই বিশ্বাস করতে চলেছি বাস্তবতা বোধহয় এমনই কিছু। কিন্তু এটি মডেল ছাড়া আর কিছুই নয়। মডেলকে কেটে আমাদের খুশিমত ভাগ করে পরীক্ষা করা যায় একথা সত্য। মানুষকে যদি যান্ত্রিক ভাবা হয়, তাহলে সে যন্ত্র বিশেষ মাত্র, কিন্তু তাকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই মনে হবে তার মধ্যে রয়েছে এক র‍্যাশানাল সত্তা এবং সজীব আত্মা। বিজ্ঞানকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সে আত্মাকে নিয়ম বা সূত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারে না বরং কারো প্রাণ ,ঈশ্বরমুখী' হবার জন্যে যে পথ কামনা করে সেই পথেই তাকে যেতে দেয়।

মানবজীবনের যা কিছু কাজ তা চলে দুটি রাজ্য জুড়ে। একটি হলো বহির্জগৎ, আর একটি তার অন্তর্জগৎ। এই দুটির মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া চলেছে রাত্রিদিন। বলা বাহুল্য এই দুটি জগতের সত্তা দেহে এক হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। বাইরেকার যে জগৎ তার বাসিন্দা হচ্ছে জড় ও চেতন অবয়বী পদার্থ এবং তৎসংশ্লিষ্ট শক্তি, আর অন্তর্জগতের সত্তা হচ্ছে নিরবয়বী সুখ, দুঃখ, হিংসা, প্রেম, ক্রোধ এবং অক্রোধ। দুটি রাজ্য অসংলগ্ন নয়, একটিকে পরিত্যাগ ক'রে অপরটি বেঁচে থাকতে পারে না। তাহলে মানুষের খোলসটি থাকে না। বিজ্ঞানের সাধনা বহির্জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করবার সাধনা। সে আছে ঐ কাজে মগ্ন হয়ে। আর অধ্যাত্মবিদ্যার কাজ অন্তর্জগতের সন্ধান করা। অন্তস্থ 'আমি'র খোঁজ করা তার কাজ। বিজ্ঞান স্বীকার করে কুণ্ঠিত চিত্তে যে একটিকে দিয়ে দুটি রাজ্যের জরীপ করা সম্ভব নয়। একারণেই বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, পরামনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছে। এতদিন যে প্রথায় বিজ্ঞান কাজ করে এসেছে বর্তমান

ক্ষেত্রে সেই প্রথার পরিবর্তন হতে বাধ্য তথাপি একথা বিজ্ঞান স্বীকার করা না তার অতীতের পথ একেবারে অচল হব।

বিজ্ঞানাচার্য অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় এক চিঠিতে[১২] এ বিষয়ে চমৎকার ক বলেছেন,

'বিশ্বাসের বেলায় বলা যায়—বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সংশয়, এবং বিজ্ঞানে অসাধারণ ও বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে এ-সংশয় বা অবিশ্বাসে আশ্রয় ক'রে। বিজ্ঞান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয় যে বিজ্ঞানের সত্যগু হচ্ছে খুচরা সত্য; এবং বহু খুচরা সত্যকে জোড়া দিয়ে যে একটি পাইকা বা ব্যাপক সত্যের উৎপত্তি হয় বিজ্ঞানে,—তারও কোন স্থিরতা নাই,- কারণ, নূতন তথ্যের আবিষ্কারে তারও রূপ যেতে পারে বদলে, এমন ি তার সমূলে বিলোপ ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। তাই বিজ্ঞানের কোন সত চূড়ান্ত-চরম বা শাশ্বত নয়। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানকে অবিশ্বাসী ব চলে না। কেননা ধর্মের মত বিজ্ঞানের গোড়ায়ও একটা বড় রকমে বিশ্বাস আছে যার অভাব হলে বিজ্ঞান হবে অচল। সে বিশ্বাস হচে বিশ্বব্যাপী এক শাশ্বত সনাতন নিয়মে—যাতে সম্ভব হয়েছে বিশ্বের স্থি এবং গতি। এই সনাতন নিয়মের অন্তরালে ও এর আশ্রয়রূপে যে এ বিশ্বব্যাপী চেতনা শক্তি (বা যাকে বিশ্বাত্মা বলা যেতে পারে) এরূ কিছু রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান ইহা অস্বীকার করে না। একে ব্রহ্ম ভগবান বা ঈশ্বর যে কোন নামে উল্লেখ করা যায়। বেদান্তের অদ্বৈতবাদে সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের বিশেষ অমিল নেই বলা চলে। এ প্রথম ধারণা হচ্ছে অন্যের সিদ্ধান্ত—পরীক্ষা প্রমাণের বিচারফলে।'

যে মৌল ধারণার উপর বেদান্তের ভিত্তি তা কখনও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। যুগ যু ধরে মানুষ নিজের কল্পনা ও চিন্তাশক্তির সাহায্য নিয়ে বিশ্বাস করে এসে সত্যদ্রষ্টাদের অনুভূত এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে। তার অনুভূতির বলে তুলেছে দর্শন-চিন্তা। একে কেন্দ্রায়িত ক'রে সৃষ্টি হয়েছে দর্শনের, আস্তিক বোধের। এই দর্শন চিন্তা, উপনিষৎ,—একে কখনই অলীক বা কুসংস্কারাচ্ছ বলতে পারেন না চরম নাস্তিকেরাও। যেহেতু বেদান্তদর্শনের ভিত্তি কেবলমাত্র জ্ঞানাতীত লোকের বিবরণকালীন অনুভূতি নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি তার অন্যতম

১২ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৪

গ্রহণীয় বিষয়। এক সুচিন্তিত বিজ্ঞানবোধের উপর ইমারত তুলেছে বেদান্ত-দর্শন। তবে একথা সত্য অনেকে হয়ত সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। ভারতীয় ধর্ম-দর্শনে তাই পাশাপাশি সগুণ ও নিগুর্ণের অধিষ্ঠান। কিন্তু ধর্ম যখন আচারঅনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তখন গোঁড়ামির উদ্ভব হতে বাধ্য হয় এই 'ধর্মবুদ্ধি'-কে ধর্মবুদ্ধি বলা হয় না, তাকে বলা হয় পাপবুদ্ধি বা কূটবুদ্ধি। তাহলে ধর্মবুদ্ধি কাকে বলবো?

ইংরেজীতে যাকে reason বলা হয় তাকেই বলা হয় বিশুদ্ধ বুদ্ধি সাধারণ intellect কে বিশুদ্ধ বুদ্ধি বলা চলে না। পাটোয়ারি বুদ্ধি বা কূটবুদ্ধি কেও কখনো বিশুদ্ধ বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এই বিশুদ্ধ ভক্তি মানুষকে সংকীর্ণতা, গোঁড়ামির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে, মানুষকে অন্যায়ের সড়ক থেকে সরিয়ে মহত্তর পথে নিয়ে যায়। এই বুদ্ধিকেই অনেকে বলেন ধর্মবুদ্ধি। এহেন ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞানবুদ্ধির সাদৃশ্য বর্তমান। স্বামী অভেদানন্দের ধর্মবুদ্ধি এই 'reasoning'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তাঁর দৃষ্টি কুসংস্কারবিমুক্ত, সেইহেতু তা বৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞান ও ফলিত-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে এখন রুখে দেওয়া অসম্ভব। আর রুখতে গেলেও বিপদ। যেহেতু এতে ক'রে দীর্ঘদিন ধ'রে তিলে তিলে গড়ে ওঠা সভ্যতার অবসান হবে। আমরা নিশ্চয়ই চাইবো না, বহুদিন আগেকার দিনে, বর্তমান সভ্যতার শৈশবের দিনে ফিরে যেতে। অথচ মানুষ বিজ্ঞানের কাছ থেকে চাবিকাঠিটি 'হাতড়ে' নিয়ে মারণ-যজ্ঞের কাজে তার ব্যবহার করছে। এর জন্যে প্রয়োজন সাম্যের। ভারসাম্যের। প্রয়োজন মানসিক বৃত্তি-প্রবৃত্তি মনের, যাতে তা অপ-প্রবৃত্তিতে পরিণত না হতে পারে। যাতে দ্বিতীয়বার হিরোসিমা-নাগাসাকির সৃষ্টি হ'য়ে পৃথিবীর আরও কোন দেশের আগত-অনাগত নাগরিকের জীবন শতাব্দী ধ'রে বিপর্যস্ত না করতে পারে। শুনেছি জাপানের 'পরে পারমাণবিক বোমা ফেলার সময় যে সব বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকে আতঙ্কে, বিস্ময়ে, বেদনায় শিশুর মতো কেঁদে উঠেছিলেন। আইনস্টাইন নাকি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'ওরা ঠকিয়েছে আমাকে। আমি-ই ওদের এই অনন্ত শক্তির উৎস খুঁজে দিয়েছি।' বিশ্বের তাবৎ কল্যাণকামী বিজ্ঞানী তাই গড়ে তুলেছিলেন পারমাণবিক শক্তিকে প্রাণ হরণের কাজে প্রয়োগের বিরুদ্ধে এক সক্রিয় আন্দোলন। চেয়েছেন অশুভ-

বুদ্ধির উপরে শুভবুদ্ধির বিজয় নিশান ওড়াতে। কিন্তু পারেন নি। কেন পারেন নি সে এক বিরাট প্রশ্ন। তবে একথা সত্যি, আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক অস্ত্রের যে মহড়া চলছে তার মূলে যেমনি রয়েছে ক্ষমতার প্রতি সর্বগ্রাসী লোভ, তেমনি আছে ধর্মবোধের, কল্যাণবুদ্ধির একান্ত অভাব অথচ তার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন 'ধর্ম-চেতনা ছাড়া বিজ্ঞান যেমন পঙ্গু, বিজ্ঞান-চেতনা ছাড়া ধর্ম তেমনি অন্ধ' ধর্ম-চেতনা যতদিন না রাষ্ট্রকর্ণধারদের মনকে প্রভাবিত করতে পারবে ততদিন তাঁরা এই পৈশাচিক লোভের কবলমুক্ত হতে পারবেন না। আজকের দিনে কোন্ ধর্ম মানুষকে শুভবুদ্ধি দেবে অথচ অবৈজ্ঞানিক তৈরী করবে না? একমাত্র বেদান্ত এই উভয় গুণের অধিকারী। স্বামী বিবেকানন্দের মতো তাঁর অন্তরঙ্গপার্ষদ, সহচর মহাসাংক স্বামী অভেদানন্দ তাই বেদান্তের বাণী পাশ্চাত্তে প্রচার করেছেন।

বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোক-কণা যেমন দূর করে অজ্ঞানতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার, ঠিক তেমনি ধর্মচেতনার আলোকতরঙ্গ স্পর্শে অপসারিত হয় অজ্ঞানতার কুজ্ঝটি। বিজ্ঞানের বাস্তব সন্ধান এবং ধর্মের অলৌকিক ইঙ্গিত যে পরস্পর বিরোধী নয়, একটি সত্য ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্র দিয়ে তারা গ্রথিত এই পরমবোধ স্বামী অভেদানন্দ তাঁর সংস্কারমুক্ত চিত্তে অনুভব করেছিলেন ধর্ম এবং বিজ্ঞান যে এক নয় একথা তিনি বলেছেন, কিন্তু তিনি এই মহাসত্যকে প্রচার করেছেন, অনুভব করেছেন যে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত নয়, বরং রমণীয়। জড়বিজ্ঞান চিন্তাজগতের যে প্রান্তে পেঁছে খেই হারিয়ে ফেলছে দর্শন বা ধর্ম বিজ্ঞানের অনুভূতি উপলব্ধি সেই অসমাপ্ত পথ রেখাকে নিয়ে গেছে সুদূরে, মিলিত করছে জ্ঞানের এক পরম জ্যোতির্লোকে। শেষেরা প্রথমের পরিপূরক, পরিপন্থী নয়। এই জ্যোতির্ময়ী চেতনার রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ।

যে প্রশ্ন জোরালো হ'য়ে উঠছে—কেমন ক'রে মানুষের সমাজে এই সাম্য মৈত্রী, ঐক্য এবং অহিংসার প্রতিষ্ঠা সম্ভব যাতে সমগ্র বিশ্বে শান্তি থাকে অব্যাহত ভাবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে উপনিষদে। প্রাচীন ভারতে বেদপন্থী সমাজে মানবজীবনের প্রধান কর্তব্য ও মুক্তি লাভের উপায় ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞের উদ্দেশ্য সুমহান। দেবতার উদ্দেশে প্রিয় দ্রব্যদান

ত্যাগ। প্রথা ছিল যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন ক'রে যাজ্ঞিক লাভ করতেন ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমা মুক্তি। ত্যাগ ক'রে লাভ করতেন ব্রহ্মলাভের পরম শান্তি। তাই ত্যাগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে সেবার সম্পর্ক। সমাজে শান্তি, সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন বেদান্তের আদর্শ অনুসরণ। বিজ্ঞানের প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে বেদান্তের অনুশাসনে। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে অধ্যাত্মবিদ্যার উপলব্ধিকে।

ধর্মবিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট পথে চললে শক্তি আসে, আসে বিবেক, সমবেদনা, মানবতা, জীবে প্রেম প্রভৃতি মানবিক সদ্-গুণ। এগুলি মানুষের মনে স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধে। অন্যায় থেকে বিরত হবার প্রেরণা, লোভ দমন করবার প্রবৃত্তি মানুষকে মহত্তর লোকে নিয়ে যায়।

একথা আগে বলা হয়েছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ থাকা উচিত নয়। ধর্ম এবং বিজ্ঞান উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে অসম্পূর্ণ। প্রাচীন সভ্যতা ধর্মানুশাসনে রচিত। তার ফলে ব্যবস্থার ফলাফল আংশিক এবং সীমাবদ্ধ। বর্তমান সভ্যতা ঠিক তেমনি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এর ফলও আংশিক ও সীমিত। অতএব প্রয়োজন উভয়ের সার্থক মিলন। ধর্ম ও বিজ্ঞান-এর মাঝখানে যদি আধ্যাত্মিক শক্তির সেতু থাকে তাহলে যে মানুষ সৃষ্টি হবে তা আদর্শ পুরুষ; তাঁরই নির্দেশে গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। তারই জন্য পৃথিবী অপেক্ষমান।

একারণেই স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, বিংশ শতকে এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন যা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সকল সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে। তিনি বলেছেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার নীতির উপর যুগোপযোগী ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিক বিজ্ঞান যেমন পূর্বপ্রচলিত বিশ্বাস বা জনশ্রুতির প্রতি অন্ধ-বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে শুধু একমাত্র সত্যকেই সমর্থন করে, বর্তমান শতাব্দীর উপযোগী ধর্মেরও ঠিক একই রকম লক্ষ্য, আদর্শ এবং উদ্দেশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এই পরমবোধ তাঁর বিশ্বাসের পর্যায়ে মাত্র ছিল না, তা তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছিল। তারই ফলে তিনি বলতে পেরেছেন কুণ্ঠাহীনভাবে,[১৩]

'True religion and science are always in perfect harmony.

১৩ *Religion of the Twentieth Century*, p. 25.

There never has been any quarrel or fight between true religion and science both of which are universal in their scope and are one in their ideal.'

প্রকৃত ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কদাপি বিরোধ বাধে নি, যেহেতু আদর্শের দিক থেকে উভয়েরই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। তিনি অনুভব করেছেন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে ঐক্যতত্ত্ব উপলব্ধি করবার দিন এসেছে। জগতের বিখ্যাত ধর্মমতগুলির মধ্যে কোন্‌টি বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে উপলব্ধি ক'রে অনন্ত-সত্তাকে পেতে সচেষ্ট হচ্ছেন তা জানবার বিষয়।

অভেদানন্দ বলেছেন বিশ্বজগতের ভিত্তিস্বরূপ অবিনাশী সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্যে বিজ্ঞান অবিশ্রান্ত চেষ্টা করছে। আর এই বিশ্বজনীন শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করা ধর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? তার উত্তর স্বামী অভেদানন্দ নিজেই দিয়েছেন[১৩]—

'We must put everything aside which is not in harmony with the highest conclusions of modern science, so religion which is such a universal religion,......is the one which embraces all the religions of the world.'

আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে যার মিল নেই তাকে বর্জন করতে হবে এহেন উক্তি যে সন্ন্যাসী স্পর্ধার সঙ্গে করতে পারেন তিনি কলেজে বিজ্ঞান না প'ড়েও অবশ্যই সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মেজাজের মানুষ। এই দুর্লভ গুণ যে সন্ন্যাসীতে বর্তমান তিনিই পথপ্রদর্শক হবার উপযুক্ত। এবং বলা বাহুল্য এই গুণ অনেক বিজ্ঞানীরও নেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে বাস ক'রেও যখন কোন কোন বিজ্ঞানীকে অন্ধ কুসংস্কারের দাসত্ব করতে দেখা যায় তখনই সংশয় জাগে তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানী কি না। স্বামী অভেদানন্দ প্রথাগতভাবে বিজ্ঞানী নন অথচ খাঁটি বিজ্ঞানীর গুণাবলী তাঁর মধ্যে সার্থক ভাবে বিরাজিত।

স্বামী অভেদানন্দ ধর্মকে বিজ্ঞানভিত্তিক ক'রে মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন। প্রাচীনকালে ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা যা বলে গেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন একথা তিনি শুধু বলেই ক্ষান্ত হন নি, প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে গেছেন। ক্রমবিবর্তনবাদ, তৎসহ বিজ্ঞানের

১৩ *Ibid*, p 30.

অপরাপর শাখার নানা ত্রুটি তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানীর নিষ্ঠা নিয়ে। পুনর্জন্ম-তত্ত্ব যে বৈজ্ঞানিক একথা তিনিই বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেছেন। টেলিপ্যাথি, ট্রান্সমাইগ্রেসন ইত্যাদি নানা বিষয়কে তিনি বিজ্ঞানের আঙিনায় তুলে দিয়েছেন। মৃত-ব্যক্তির "আত্মা" যে দেহ ধারণ করতে পারে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব ঘটনাকে তিনি বিজ্ঞানীর নিষ্ঠা নিয়ে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'মনোবিজ্ঞানকে' (সেকালে সাইকলজিকে বিজ্ঞান বলা হ'তো না) 'বিজ্ঞান' বলে অভিহিত ক'রে মনের শক্তি সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন। 'বিবেকানন্দের বিজ্ঞান-চেতনা' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। স্বামী অভেদানন্দ মনোবিজ্ঞানকে 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান' আখ্যা দিয়ে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীদের বক্তব্যের পাশে নিজের তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন নিপুণ শিল্পীর মতো।

কেবলমাত্র তত্ত্ব নিয়ে মেতে থাকলে হবে না, তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োজন তার সফল ও সার্থক প্রয়োগের। এই প্রয়োগ যেন মানুষের দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হয়, সুশৃঙ্খল প্রয়োগ যেন মানুষকে অনাহার, অর্দ্ধাহার ও দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি দেয়, এই মহৎ আকাঙ্ক্ষাকে লালন করে এসেছেন স্বামী অভেদানন্দ। তাঁর রচনা, চিঠিপত্র, বক্তৃতাবলীর মধ্যে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। তাঁর উদ্দীপক বক্তৃতার কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করছি। তিনি এক বক্তৃতায় বলেছিলেন,

> 'ইংলণ্ডবাসীদের মতো আপনারা নূতন কোন সত্যের আবিষ্কার করুন এবং শ্রমশিল্পের উন্নতির সাহায্যে নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদন করুন। ইংলণ্ডের লোকেরা কেরানীর মতো অধীন হয়ে থাকতে চায় না, তারা চায় স্বাধীনতা। আমরা ভারতবাসীরা ঐ আত্মনির্ভরতার মনোভাব হারিয়ে ফেলেছি। বর্তমানে আমরা শোচনীয় অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছি। আমরা নিজেদের সংশোধন না করলে এবং নিজেদের সংস্কৃতির উন্নতি না করলে কেউ-ই আমাদের উন্নতিলাভে সাহায্য করতে পারে না'।

আজ ভারত স্বাধীন। শ্রমশিল্পের উন্নতি ঘটেছে একথা সত্যি। তথাপি অভেদানন্দের ঐ ধিক্কার বাণী এখনও সত্য। আমরা আত্মনির্ভরতার মনোভাব হারিয়ে ফেলেছি।

সন্ন্যাসী অভেদানন্দের আরও একটি বক্তৃতার অংশ পুনরুদ্ধৃত করছি। তার মধ্যে তাঁর বাস্তব বুদ্ধি চমৎকার ফুটে উঠেছে।

> 'শুধু বাক্যের আড়ম্বরে স্বদেশী আন্দোলনকে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। আমাদের দেশীয় শ্রমশিল্পের উন্নতি করতে হবে। বহুশতাব্দী ধ'রে এই সব জাতীয় শিল্প উপেক্ষিত হ'য়ে প'ড়ে আছে। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে শ্রমশিল্পের অবাধ উন্নতি না হলে আমাদের জাতি সর্বোতভাবে ধ্বংস হবে'।

কৃষি-বাণিজ্য, শ্রমশিল্প (industry) প্রভৃতি নানা বিভাগে নিযুক্ত থেকে স্বদেশের আর্থিক সম্পদ বাড়িয়ে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জাতিতে পরিণত হওয়া ছিল স্বামী অভেদানন্দের অন্তরঙ্গ বাসনা। তবে শুধু ফলিত বিজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে থাকলেই সিদ্ধি আসবে না, তার সঙ্গে প্রয়োজন ধর্মনীতিকে অবলম্বন করা। অভেদানন্দ বলেছেন, 'রাষ্ট্রনৈতিক ও শ্রমশিল্পের উন্নতি সাধনে সাফল্য লাভে অভিলাষী হতে হ'লে উচিত ধর্মনীতিকে অবলম্বন করা। যেহেতু ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবন, ধর্মেই আমাদের প্রাণশক্তি নিহিত'।

এক সময়ে 'ধর্ম' বিজ্ঞানের স্থান অধিকার ক'রে জগতের যাবতীয় ব্যাপার ও তাদের কারণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করতো। অভেদানন্দ বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের গোঁড়া প্রচারকেরা ও আচার্যেরা এতদিন যে সব ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞান তার নিত্য নূতন আবিষ্কারের সাহাযে সেই ভুলগুলি দেখিয়ে দিয়েছে। তার ফলে আধুনিক বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা ও অগ্রগতির অনেক পিছনে প'ড়ে আছে ধর্মযাজক ও প্রচারকেরা। তারই ফলে সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ও বিজ্ঞানের বিরোধ বিগত শতক থেকে চরমে উঠেছে কিন্তু বিজ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তি টলে নি, বরং সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির মতবাদের ভিত্তি নড়ে উঠেছে অনিবার্যভাবেই। অনেক সময় এই সব ধর্মমত ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু কোন প্রচেষ্টা সফল হয় নি স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, ধর্মমত থেকে আগাছা তুলে ফেলতে হবে যেহেতু

> 'Now science has become stronger in power than the existing religions, sectarian religions are struggling hard to keep up with the progress of science and are obliged to reject those

theories and beliefs which were based upon tradition and not upon scientific truths.'[১৪]

বর্তমান যুগ নির্বিচারে মেনে নেবার যুগ নয়। যুক্তি, তর্ক, সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রভৃতির সোপান অতিক্রম ক'রে যেতে হয় সিদ্ধির দিকে। অভেদানন্দ নিজেই তা উপলব্ধি ক'রে বলেছেন, 'The eyes of the masses are now opened to scientific truths and the world now demands absolute harmony between religion and science'.

এই বিশেষ গুণ অর্থাৎ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মিলনসাধন মাত্র একটি ধর্মমতের মধ্যেই বর্তমান। তা হলো বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম।

অভেদানন্দ বলেন, বেদান্তের বাণী-ই আগামী দিনের বাণী। যেহেতু বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম কোনও বিশেষ নামে বা আকারে আবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের রীতি প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান। বিশ্বজগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ মূলতঃ এক অবিনাশী নির্বিশেষে অনাদি ও অনন্ত সত্তা আর বেদান্ত একথাই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন বেদান্তই একমাত্র ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করতে পারে এবং তার বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে, যেহেতু বিজ্ঞানের সত্যনির্ণয়ের সমস্ত পদ্ধতিকেই অবলম্বন ক'রে এবং বিজ্ঞানের আলোকেই বেদান্ত নিজের ধর্মমত ব্যাখ্যা করে।

বেদান্ত বলে, 'তত্ত্বমসি'—অর্থাৎ তুমি সেই সর্বব্যাপী শাশ্বত অব্যয় আত্মা। 'তুমিই ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত হচ্ছ'। বেদান্ত সমগ্র বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা অনুভব করতে সাহায্য করে। সমগ্র মানবজাতিকে যাবতীয় জীবের সঙ্গে একাত্মা ব'লে উপলব্ধি করা-ই নীতিবাদের ভিত্তি হওয়া উচিত। তাহলে আমরা আর কারো প'রে হিংসা করবো না, কাউকে বঞ্চিত ক'রে নিজের উন্নতিসাধনের দুষ্প্রবৃত্তি জাগবে না।

স্বামী অভেদানন্দের জীবনের পরিসর স্বল্প ছিল না, বরং জীবন তার দীর্ঘ ছায়া রচনা করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালে তিনি জেনেছেন অনেক, উপলব্ধি করেছেন আরো অনেক। রচনা করেছেন নিজের অবগাহনের সরোবর। জ্ঞানের মহার্ণব ও বিজ্ঞানের সপ্ত সমুদ্র থেকে আনীত পুণ্য সলিল দিয়ে রচিত তাঁর মানস সরোবর। সেখানে অবগাহন স্নানে আপ্লুত অভেদানন্দ নিরাসক্ত

১৪ *Religion of the Twentieth Century*, p 14,

বিজ্ঞানীর মন ও দৃষ্টি নিয়ে বিচার করেছেন আন্তর পৃথিবীকে ও বহির্বিশ্বকে। আর হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে ভক্তির ফল্গু-প্রবাহ। নিঃশব্দচারিণী। জড়বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র তাই নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে কুসংস্কার বিমুক্ত বৈজ্ঞানিক মন, ভক্তি, ও বিচিত্র কর্মধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম স্বামী অভেদানন্দকে।

নামসূচী

(১)